মৃগয়া

তৃতীয় খণ্ড

মৃগয়া

তৃতীয় খণ্ড

ভগীরথ মিশ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

মুদ্রক :

লীলা ঘোষ

তাপসী প্রিণ্টার্স

৬ শিবু বিশ্বাস লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :

সুধীর মৈত্র

লুণ্ঠন পর্ব

১. দ্বারকেশ্বরের দ

দ। সম্ভবত পুরো শব্দটা দহ।

শব্দ নয়, সত্যি সত্যি দহ। দ্বারকেশ্বরের দহ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। জীবন্ত। তার কিনার ঘেঁসে পড়ন্ত বিকেলে নির্নিমেষ কনকপ্রভা। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে শরীরের ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক। ঘরে ফিরছে পাখিরা। দিনের শেষে ঘরে ফেরার টান। সেই টান ওদের ডানায়। দ'এর ওপারে দ্বারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ বালুচর। পড়ন্ত বিকেলের লালচে রোদ্দুর মেখে বালির রঙ লালচে বাদামি। দ্বারকেশ্বরের জল ছুঁয়ে দীর্ঘ চরখানা দু'দিকে বহুদূর অবধি বিস্তৃত। যেন একখানা গরদ-রঙের বালুচরী শাড়ি। শাড়ির জমিতে অজস্র কারুকার্য। চিত্রপট। শালিখ, চড়াই, যাদের বাড়ি ফেরার অতখানি তাড়া নেই, তারা তখনও নৃত্যশীল। খুঁটে নিচ্ছে দিনের শেষ দানাগুলি। বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে আকন্দের ঝোপ। বেনা ঘাস। লিউলি গাছ লতিয়ে গিয়েছে বালির ওপর। গাঢ় বেগুনি ফুলে ভরে গিয়েছে ওদের শরীর। আর, ঐ বিস্তীর্ণ শাড়ির জমিতে আঁকা রয়েছে আশপাশের গাঁয়ের বউ-ঝিদের ছবি। বালির মধ্যে 'উনুই' খুঁড়ে, এই মধ্য ফাল্গুণে, পানীয় জল সংগ্রহ করছে ওরা। চরের পুরু বালি দু'হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বানিয়ে ফেলেছে এক একটি একহাত দ'হাত গভীর কূপ। কূপের তলায় জল জমেছে। থিতোচ্ছে। মাটির মালসা দিয়ে সেই জল তুলে তুলে কলসিতে ভরছে ওরা। কলসির মুখে গামছা পেতে ছাঁকনি।

সবই, সবকিছুই, ছবি বলে মনে হয় অদ্দুর থেকে। দীর্ঘ বালুচরী শাড়ির গায়ে আঁকা ছবি সব। ছবি, ছবি।

একখানা বালুচরী শেষ হলে পর ক্ষীণস্রোতা দ্বারকেশ্বর। অপর পাড়ে আরও একখানা বালুচরী। ঐ শাড়ির ওপারে উঁচু বাঁধ। মানুষ বাঁধে নি। প্রকৃতির হাতে গড়া বাঁধ। নদীগর্ভের শেষ সীমানায় অনিবার্য উঁচু জমিটাকেই নদীর এদিক থেকে বাঁধের মতো লাগে। ঐ বাঁধের কিনার বরাবর ভূতভৈরবের ঝোড়। সারবন্দী। থোকা থোকা ফুলে ভর্তি। বিচিত্র তাদের রঙ। গাঢ় কমলাটাই বেশি। আর, ঐ সারবন্দী ভূতভৈরবের ঝোড় কুঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা ছন্নছাড়া খেজুর গাছ। হাড় জিরজিরে আকার-অবয়ব তার, বড়ই কর্কশ শরীর। বড়ই বেয়াড়া আর অবাধ্য তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি। ঐ খেজুরের তলায় পাগল শিকারি সন্ধে পহরে এক অদ্ভুতদর্শন জানোয়ার দেখেছিল বলে দাবি করে। সে জন্তুর নাকি নিম্নাঙ্গ মানুষের। ঊর্ধ্বাঙ্গ জানোয়ার। 'কোন জানোয়ার' এর জবাবে কখনো বলে সিংহ, কখনও বা ভালুক। গত ক'বছরে এলাকার বহু মানুষকে জনে জনে শুনিয়েছে সেই বৃত্তান্ত। কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ হেসেছে। পাগল শিকারি কনকপ্রভার চোখে চোখ রেখে খুব বিস্ফারিত ভঙ্গিতে বলেছিল, মা মনসার কিরা, মা জননী, মিছা কই তো জিভ খইসে যাব্যেক।

দ্বারকেশ্বরের অনেক দ। প্রত্যেকটি দ'য়ের একটি ইতিবৃত্ত ও জীবনবৃত্ত রয়েছে। সেই ইতিবৃত্তে রয়েছে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। জীবনবৃত্তে রয়েছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। প্রত্যেকটি দ'য়ের সঙ্গে, ঠিক মনুষ্য-জীবনের মতো, জড়িয়ে রয়েছে কিছু গাথা, কিংবদন্তি, প্রবাদ.....কিছু কলঙ্ক, রটনা। ঠিক একজন মানুষের জীবনকে যা-যা জড়িয়ে

থাকে যেমনটি। যেমন জড়িয়ে রয়েছে কনকপ্রভার শরীরে, কুন্তীর শরীরে। নদীতে দ' তৈরির কৃৎকৌশল কনকপ্রভা জানেন না। তিনি তো এই রাঢ়ভূমির মানুষ নন। এখানে তিনি জন্মান নি, বড় হন নি। রাঢ়ভূমি তার সব রহস্য ওঁর কাছে তাই এখনো অবধি খোলে না। সে জানতেন প্রিয়ব্রত। রাঢ়ভূমির সন্তান তিনি। এই তল্লাটেই কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন.....। দ্বারকেশ্বরকে তিনি হাতের তালুর মতো চিনতেন। তিনি জানতেন দ্বারকেশ্বরের বুকে দ' তৈরির যাবতীয় প্রক্রিয়া ও অনুষঙ্গগুলি।

পড়ন্ত বেলায় সম্ভবত এ দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের, প্রাণীর, গাছগাছালের, ডাঙা-ডিহির মনই বিষণ্ণতায় ভরে যায়। সূর্যের শরীরের রঙও ম্লান হয়ে আসে। চারপাশের সব কিছুতেই ক্লান্ত অবসন্ন লাগে। এমন মুহূর্তে দ্বারকেশ্বরের দু'একটি দ'য়ের কিনারে যাওয়া নাকি বিপজ্জনক। ওখানে গেলে নাকি আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে মানুষের।

কনকপ্রভা তেমনই এক দ'য়ের কিনারে, পড়ন্ত বেলায়, নির্নিমেষ।

দু'ধারের বিস্তীর্ণ বালুচরের মধ্যিখানে নদীটা শরীর এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। অবসন্ন লাগে ওকেও। এমন অবসন্ন শরীরের আঁকেবাঁকে দ' হতে পারে কিনা, ঘূর্ণি জাগতে পারে কিনা, প্রিয়ব্রতই ভাল বলতে পারতেন সেটা। কারণ, ঘূর্ণি থেকেস যে কালক্রমে দ'য়ের উৎপত্তি, এমন কথা প্রিয়ব্রতর চেয়ে বেশি বুঝত কে! প্রিয়ব্রতই তো তাঁর সারাটা জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন সেটা। প্রবল ঘূর্ণি, আর তা থেকেই কালক্রমে সৃষ্টি হয় নদীর অথবা জীবনের যা কিছু ইতিবৃত্ত, জীবনবৃত্ত। এবং সেই বৃত্তের খাঁজেভাঁজে যাবতীয় গল্পগাথা, কিংবদন্তি, কলঙ্ক, রটনা। যেমন, দই থেকে ঘোল বানাবার কালে, মুঠনির প্রবল ঘূর্ণনে হাঁড়ির দস তোলপাড়। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু মুঠনির শরীরে পলিমাটির মতো পরতে পরতে জমতে লেগেছে মাখন জাতীয় স্নেহপদার্থ। জমতে জমতে পুরু হচ্ছে সে পলি। ঐ একই ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দ'য়ের জীবনবৃত্তে জমতে থাকে নিজস্ব গল্পগাথা, কিংবদন্তি, কলঙ্ক, রটনা.....পলির মতো। আসলে, দ' সৃষ্টি নদীর যৌবন কালের ঘটনা। যৌবনেই জীবনের যাবতীয় হটকারিতা, দুঃসাহস, যাবতীয় ঘূর্ণি। রোখ বেশি সেই ঘূর্ণনে, তাই জেদও বেশি। ঐ জেদী হটকারিতার পেছনে হয়ত বা, কারও কারও ক্ষেত্রে, একটা আদর্শও থাকে। সেটাই বুঝি মুঠনির কাজ করে। সেটাই চার পাশের সবাইকে, সবকিছুকে তোলপাড় করে দিতে সাহায্য করে। বাধ্য করে। প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে, ক্লান্ত, অবসন্ন এলায়িত শরীরে না থাকে কোনও ঘূর্ণি, না কোনও গল্পগাথা, কিংবদন্তি, কলঙ্ক, রটনা.....। তবুও ঐ সময়ে যদি ঘূর্ণি জাতীয় কিছু দেখা যায়, বোঝা যায়, তো বুঝতে হবে, ওগুলো সবই কৈশোর-যৌবনের রোমন্থন বৈ কিছুই নয়। যে রোমন্থন বৃষ-গাভীতেও করে অপরাহ্ন বেলায়। ফলে, তেমন পর্যায়ে নদী কিংবা মানুষের জীবনবৃত্তে কোনও দ'সৃষ্টি সম্ভবই নয়। আসলে, বাঁকের মুখেই তো ঘূর্ণনগুলি সৃষ্টি হয়। আর, যৌবনই তো ঘনঘন বাঁক নেবার প্রকৃষ্ট সময়। আর, আচমকা ঘনঘন বাঁক নিলেই তো জলে-মাটিতে স্রোতে-প্রতিস্রোতে যতকিছু তোলপাড়, মাথা ঠোকাঠুকি। আর, অল্প বয়েসের ধর্মই তো এই, রাগ পুষে রাখে না। ফলে, 'তুয়ার সাথ খেলব নাই' বলে আড়ি করতে যতক্ষণ, 'আয় রে আমার প্রাণের সখা' বলে গলা জড়িয়ে

ধবতেও ততক্ষণ। অতএব, সামান্য ক'দিন বাদে আচমকাই পুরোনো গতিপথে ফিরে আসা। নদীর তখন কী এত বাড়তি হ্যাপা! চালু গতিপথ দিয়ে যেতে যেতে ধাঁ করে বাঁকের মধ্যে একটু পাক খেয়ে ফিরে আসা। যেন এপাড়া ওপাড়া বিয়ে হয়েছে মেয়ের, সোজাপথে স্বামীর ঘরে যেতে যেতে আচমকা গলিপথে ঢুকে এক লহমায় বাপের ভিটেটি ছুঁয়ে আসে। বাপের বাড়ির টান, একেবারে নাড়ির গভীরে অনুভব করা যায় সে টান। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগলেও তখন আর চারা নেই। যতই তাড়া থাক, নদীকে তার বাঁকের মধ্যে একপাখ ঘুরে আসতেই হবে। ঐ একপাক ঘুরতে গিয়েই সেখানে তৈরি হবে সহস্র পাক, ঘুর-ঘূর্ণি। জল সজোরে পাক খাবে সেখানে। তোলপাড় ঘূর্ণি তুলবে। সেই ঘূর্ণির কেন্দ্রে যা কিছু পড়বে, সব ভেঙেচুরে পোঁতা হয়ে যাবে বালির তলায়। ফের ভেসে উঠবে ওপর-জলে। এইভাবে কিছু কাল চলবে ঐ নিরন্তর ভাঙচুর আর ডোবানো ভাসানোর খেলা। এক সময় সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত গতিপথটি প্রশস্ত হবে, পাকদণ্ডী ঘুরপথটিকে অপ্রাসঙ্কিক মনে হবে। তখন নদী চিনে ফেলেছে তার সোজা পথটিকে। এক সময় সেই পথটিকে অবলম্বন করেই বইতে থাকবে সে। পাকদণ্ডীটিকে তখন বহুপত্নীসম্পন্ন মানুষের নতুন বিবাহের পর, পুরোনো বউয়ের মতোই বাহুল্য, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যজ্য মনে হবে। আব, তখন তার শরীরের খাঁজে-ভাঁজে জমে গিয়েছে কতই না গল্পগাথা, উপকথা.....। নদী বয়ে যাবে স্মৃতিহীন। পাশটিতে নিঃসঙ্গ পড়ে থাকবে ঘোড়ার নালের মতো নদীর একটি টুকরো। তারপর, ঐ একটুকরো নদী, দিনের পর দিন, বুকে স্থির জল নিয়ে শুয়ে থাকবে ছুঁড়ে দেওয়া বিড়ি কিম্বা চুটির শেষ অংশের মতো অবজ্ঞাত, তার স্থির নিস্তরঙ্গ বুকে দোলা লাগবে কেব উৎসবে, পার্বনে, বর্ষায়-প্লাবনে.....। কেবল তখনই একপ্রস্থ নতুন জল পাবে সে, বালি পাবে, পলিপাবে....., সারা বছর স্মৃতির অতীত হয়ে পরবাসে থাকা সতীনের মেয়েটির পুজো উপলক্ষ্যে একপ্রস্থ শাড়ি পাওয়ার মতো, একটু একটু করে ভরতে থাকবে তার বুক। একটু একটু করে নদীর থেকে বিচ্ছেদ ঘটবে তার। তখন সে পুরোপুরি দ'।

কনকপ্রভা দ'য়ের কিনারে ঠিক যে জায়গাতে বসে রয়েছেন তার সামান্য পূর্বে কানা নদী। জনশ্রুতি, এটাই দ্বারকেশ্বরের পুরোনো, প্রাচীন খাত। দ্বারকেশ্বর দিক বদলাল, নতুন খাতে বইল, পুরোনো খাতখানি একটু একটু করে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। এখন তা এক মজাখাত। কানা নদী। চক্ষু হারিয়ে কানা। আর, চক্ষু হারালেই তো সামনের দিকে যাবতীয় গুতি স্তব্ধ হয়ে যায় সকলেরই। মুছে যায় পেছনের দিকের যাবতীয় স্মৃতিও। তবে, মানুষ তো আর নদীর মতো স্মৃতিহীন হতে পারে না। তাই, কানা নদীর সামান্য তফাতে দ্বারকেশ্বরের যে জটিল দ', তার কিনারে বসে বসে কনকপ্রভার স্মৃতির রাজ্যে নিরঙ্কুশ মন্থন চলতেই থাকে। তিনি বসে রয়েছেন, সামনের নদীর দিকে অপলক, বসে বসে গাঁয়ের বউ-ঝিদের উনুই খোঁড়া দেখছেন নিবিষ্ট মনে, অথবা তাঁর মন নেস উনুইতে, নেই দহে, বালুচরে, স্রোতে, কাশবনে, শরবনে, কোথাও নেই। মনখানি তাঁর চারপাশের নিসর্গ-নিরপেক্ষ হয়ে কেবল হাওয়ায় ভাসছে। ভাসছে, ভাসছে।

এখানে দ্বারকেশ্বরের দ'টি বাস্তবিকই জটিল। এককালে সামান্য গভীর ছিল। জল জমত।

ক্রমাগত বালিপলি জমতে জমতে কালক্রমে মজে এল তার বুক। চারপাশের বালুচরের সঙ্গে সে তখন বরাবর। একদিন দূরবর্তী কোনও প্রবীন মানুষ মাথায় এনামেলের হাঁড়িভর্তি গুড় নিয়ে ওন্দা থেকে যাচ্ছিল তার মেয়ের বাড়ি, কাঁকিলায়। হয়ত বা পথকে সংক্ষিপ্ত করবার বাসনায় কিংবা অপর কোনও রহস্যময় কারণে দ্বারকেশ্বরের বালুচর ধরে হাঁটছিল সে। তখন, সে সব দিনে, চারপাশের একান্ত মানুষজনও ভুলে যায়, মাঝে মাঝে, বালির মুখোশ পরা সেই দ'য়ের অস্তিত্বের কথা। আর, ওন্দাবাসী সেই প্রৌঢ় তো নেহাতই আগন্তুক, কী করেই বা জানবে, ঐ মসৃণ বালুচরে কোথায় কোন্ মরণফাঁদ ওৎ পেতে শুয়ে রয়েছে, রোদ্দুর পোহাতে থাকা আপাত-নিরীহ কুমীরের মতো। দ'য়ের একেবারে কেন্দ্রে পা পড়ামাত্তর বেমালুম নেমে যায় বালির গহ্বরে-থকথকে নরম পাঁকের মধ্যে যেমন মসৃণভাবে সেঁধিয়ে যায় খুঁটি। তখন দ্বারকেশ্বরের বালুচরে কেবলমাত্র একটি এনামেলের হাঁড়ি। দেখলে সহসা মনে হয়, কেউ বুঝি হাঁড়িখানা বসিয়ে রেখে কাছাকাছি ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাহ্যি বসতে গিয়েছে। আর, কালো শিকারির ব্যাটা মেথর শিকারি, সিঁদেল চোর হিসেবে যার এলাকা জুড়ে নামডাক, এমন জনমানবহীন বালুচরে একটি চকচকে, ঝলমলে এনামেলের হাঁড়ি দেখে লোভ সামলাতে না পেরে পা টিপেটিপে হাঁড়ির থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ায়। চোরদের সহজাত সতর্কতা থেকে সে বুঝে নেয় দ'য়ের কেন্দ্রবিন্দুতেই হাঁড়িটা রয়েছে। আশা-আশঙ্কায় দুলতে দুলতে সে পাড়ায় ফিরে গিয়ে খবরটা দেয়। অনেক বেলায় শিকারি পাড়ার মানুষজন দূর থেকে রশি ছুঁড়ে ছুঁড়ে অনেক কসরত করে যখন হাঁড়ির গলায় পরাতে পারল ফাঁস, যখন রশির টানে হাঁড়ি হল স্থানচ্যুত, সবাই বিস্ময়ে, আতঙ্কে প্রত্যক্ষ করল, হাঁড়ির তলায় শনের মতো সাদা চুলওয়ালা একখানি মুণ্ডুর ঊর্ধ্বভাগ।

দ্বারকেশ্বরের দ', কবে, কতকাল আগে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে গিলে ফেলেছিল, নাকি নেহাতই রটনা সেটা, আজও সেই দ'য়ের শরীরে লেগে রয়েছে আঁশটে গন্ধ। মানুষ খুন করবার কলঙ্কের ছাপ। বসে থাকতে থাকতে, নিসর্গ-নিরপেক্ষ কনকপ্রভার চোখদুটি মাঝে মধ্যে এলোমেলো খুঁজে বেড়ায় দ'য়ের কেন্দ্রস্থল, যেখানে এককালে ঘূর্ণি খেতে খেতে দ্বারকেশ্বরের জল সৃষ্টি করেছে, একটি অদৃশ্য মরণকুয়া, যার উপরিভাগ মোটা দানার বালিতে ভরে গিয়েছে, কেবল অন্যমনস্ক, হটকারী মানুষ ছাড়া কারও কাছে সে তার মুখগহ্বরখানিকে অনাবৃত করে না।

দ' আসলে স্রোতবান নদীরই একদা-অংশ। এককালে স্রোতব্যবস্থার অংশীদার ছিল, ক্রমশ মূলস্রোতের থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হতে থাকে সে। বহমানতা ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় চরিত্রসমূহ তার শরীর থেকে একটু একটু করে খসে পড়তে থাকে শুকনো বাকলের মতো। শরীরের জীবন্ত কোষগুলি, রক্তচলাচল ব্যবস্থা, স্রোতস্বিনীর ঐ অংশে একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে আসে। নদীর ঐ অংশটি একটু একটু করে মরে যেতে থাকে। সজীব গাছের শুকনো ডালের মতো। জীবশরীরে শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থানের মামড়ির মতো।

একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে সুদর্শন সিংহবাবুর ধারাটি। সিংহবাবু-বংশের মূল ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দ'য়ের রূপ নিচ্ছে ক্রমশ।

কনকপ্রভা নিজের মধ্যে সহসা একটি দ'য়ের আকৃতি আবিষ্কার করে বসেন। যেন, দ'যের এক প্রান্ত তিনি স্বয়ং, অন্যপ্রান্ত তাঁর একমাত্র কন্যা কুন্তী, যে এই মুহূর্তে খানিক তফাতে বটের ছায়ায় থেমে থাকা গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে শরীর লুকিয়ে অবসন্ন শুয়ে রয়েছে।

২. প্রতাপলালের দিনকাল

প্রতাপলাল সিংহবাবু আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন। শরীরের যাবতীয় পেশীকে শিথিল করে শুয়েছিলেন। চোখ দুটো বোঁজা। ঠিক বোঁজা নয়, খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পাতাজোড়া পুরোপুরি লেপটে নেই। নিদ্রা-জাগরণের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করছিলেন প্রতাপলাল। পায়ের তলায় বসে পা'দুখানি জানু অবধি ডলে দিচ্ছিল মাকুন্দ শিকারি।

বেলা আন্দাজ ন'টা। বহুদিন বাদে পাতলা মেঘ জমেছিল আকাশে। আপ ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছিল থেকে থেকে। ছিঁচকাদুনি বৃষ্টি, কোনও কাজে জমে জমেছিল আকাশে। যা হচ্ছিল, তাও এখন থেমে গেছে। তার বদলে চড়া রোদ্দুর উঠেছে আকাশে। বাতাস একটু একটু করে গরম হচ্ছে। মাটিতে যেটুকু ভেজাভাব ছিল, উবে যাচ্ছে দ্রুত। অথচ, এখন কয়েক পশলা বৃষ্টির জন্য চাতক পাখিব মতো আকাশের পানে তাকিয়ে রয়েছে রাঢ়ের মানুষ। কবে আকাশে মেঘ জমবে, বৃষ্টি ঝরবে, রাঢ়ের টাঁড় মাটি ভিজবে, কালচে মাকড়া পাথরের বুক ঠাণ্ডা হবে, এই ভাবনায় সবাই ব্যাকুল।

ইদানীং ঘুম বড় একটা আসে না। দিনেও না, রাতেও না। আবার চোখ খুলে জেগে থাকতেও কষ্ট হয়। আর, চোখ মুদলেই মগজ জুড়ে রাজ্যের ভাবনা প্রথম সন্ধ্যার মশাদের মতো পিন পিন আওয়াজ তুলে উড়ে বেড়ায় অবিরাম। নতুন জলে জাত হওয়া চারাপোনার মতো কাতারে কাতারে চাক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির দল, ঝাঁকে ঝাঁকে। কতযুগ আগের অজীর্ণ, অদাহ্য স্মৃতি সব। কিন্তু না, অতীত নয়, এই মুহূর্তে প্রতাপলাল শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন অন্য কথা। বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা। ভাবছিলেন, তাঁর এই বিশাল তালুক, জমিন-জিরেত, খাল-জোড়-জঙ্গল, হাজার হাজার বিঘে স্থাবর সম্পত্তি, রাতারাতি হাতছাড়া হয়ে যাবে! ল্যাংটা ছোটলোকের দল সে সব ভোগ-দখল করতে থাকবে তাঁরই চোখের সুমুখে। জীবনের শেষ বেলায় পৌঁছে এও কি তবে দেখে যেতে হবে তাঁকে! ভাবতে ভাবতে চোখ-মুখ জ্বলতে থাকে প্রতাপলালের, আগামী দিনের একটা ভাঙাচোরা অসম্পূর্ণ ছবি চোখের সুমুখে প্রেতাত্মার মতো নাচতে থাকে। প্রতাপলালের মতো মানুষেরা জানেন, গ্রামাঞ্চলে ভূমিই হল মানুষের দাঁড়িয়ে থাকবার জায়গা। এই ভূমি যত শক্তপোক্ত, যত বিস্তীর্ণ হবে, ততই ঘাড় সিধে করে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে। এই ভূমি নিয়ে হাজার খেলা এতদিন খেলে এসেছেন দ্বারিকাপ্রসাদ, সুদর্শন সিংহবাবুরা, খেলে এসেছেন প্রতাপলাল সিংহবাবু, খেলছেন হরবল্লভ। এই প্রক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘদিন রাখতে পেরেছেন পায়ের তলায়। কাউকে ডুবিয়েছেন আকণ্ঠ সখ-সাধ, ভোগলালসা, এই ভূমি থেকেই হাজার হাজার মণ ফসল মজুত করেছেন গোলায়। গ্রামাঞ্চলে শস্যের একটা আলাদা উত্তাপ রয়েছে। এলাকার তাবত মানুষ সম্বৎসর আকুল নয়নে তাকিয়ে থাকে সিংহবাবুদের গোলার দিকে, দু'চার মুঠো শস্যের প্রত্যাশায়। বিশেষ করে প্রচণ্ড অনটনের দিনে, কাকপ্রার্থী

ভূখা মানুষগুলো যখন সদর-দেউড়িতে এসে ভিড় জমায়, তখন ওদের দিকে ওই শস্যের দু'চার দানা ছুঁড়ে মারতে কী যে মজা! তখন ওই ধান-কলাই নিয়ে প্রতাপলালদের দিন-রাত্তির কতই না মজার খেলা! সবার ওপরে রইল অহং-এর সাধ-আহ্লাদ মেটানো। আমার বাঁধ, আমার জোড়, আমার জঙ্গল, আমার ডাঙা-ডিহি, গোচর-ভূচর, চরাচর, আকাশ, বাতাস, এই পুরা দুনিয়াটাই বটে আমার! যদ্দুর চোখ যায়, সব কিছুই আমার। সব। আমার বাঁধে কুন শালা মাছ ধরে রে! শালাকে বাঁধের জলে চুবাতে থাক তো আচ্ছাটি করে। মোর বাঁশঝাড়ের ধারেকে জলঘাট বস্যেছে রে? আমি আইজ্ঞা। শালা, আমার বাঁশঝাড়টা তুয়ার বাহ্যি-পিসাবের জায়গা? শালা, মুখ দিয়ে সাফ কর্ বাহ্যি। উদোম মানুষগুলো ভেবে পায় না, তারা যাবে কোথায়? বাহ্যি-পিসাব তো করতেই হবে। মাঝ রাস্তায় পয়সা ছড়িয়ে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। যে কুড়োবে তার শেষদিন, কারণ রাস্তাটাও রাজার। আমার জঙ্গলে গাছ কেটেছে কে রে? আয়, তুয়ার উপর বন্দুকের টিপটা পরখ করি। সেসব সুখের দিন বোধ করি যেতে বসেছে। হায়, সে সব সুখের দিন। এখন, প্রতাপলাল সিংহবাবুর মতো আকাশপ্রমাণ মানুষ, তাঁর কিনা চাষেব জন্য থাকবে সাকুল্যে পঁচিশ একর। কোলকাতায় বসে এসব নাকি আইন করেছেন প্রতাপলালের স্বগোত্রীয়রা। তাঁরা কি জানেন না, সিংহবাবুদের এস্টেটে পঁচিশ একর জমিনে বাদশা-ভোগ ধানেরই চাষ করা হয়, শুধু পায়েস খাওয়ার জন্য! তাঁরা কি জানেন না, সিংহবাবুদের গোয়ালঘর, খামার আর ধানের গোলা রয়েছে যে জমিতে, তার পরিমাণও পঁচিশ একরের কম নয়? এসব কি জানেন না ঐ আইন-প্রণেতার দল? প্রতাপলাল তো কোন্ চামচিকা, তাঁর তো সাকুল্যে ছ'সাত হাজার একরের তালুক। এ দেশে এমন অনেকেই রয়েছে, যাদের তালুক চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার একরের কম নয়। ঐ আইন-প্রণেতাদেরও কেউ কেউ তো সেই রাঘববোয়ালদের দলে! তবে? নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে কি সুখ পাচ্ছে ঐ মুখের দল। ভাবতে ভাবতে একটা সম্ভাবনার কথা অবছা ভেসে বেড়ায় মগজে। তবে কি সত্যিই কোনও রহস্য আছে? কোনও গভীর চাল? কোনও পাকা-মাথার খেলা চলছে কি সংগোপনে? তবে কি অন্নদা চক্রবর্তীর কথাই ঠিক? কেমন যেন বিশ্বেস হয় ওর কথাগুলো। নইলে রাতারাতি পঁচিশ এক মাত্র জমি রেখে বাকি হাজার হাজার একর জমি ছেড়ে দেবে সবাই সুবোধ বালকের মতো? কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে সেটা। যদি সত্যিই তাই ঘটে, তবে গাঁয়ে-গঞ্জে শয়ে শয়ে জমিদার-জোতদার কেন পাতালের দিকে শিকড় চারিয়ে বসে রয়েছে গাছেদের মতো স্থির স্থানু নিষ্কম্প হয়ে? আইন-প্রণেতাদের প্রতি তাদের তো দেখি অন্ধ আনুগত্য। দেশের সবগুলি কেল্লা, গড়, যেন দলের শাখা-অফিস। জমিজমা চলে গেলেও কি এই শাখাঅফিসগুলো অটুট থাকবে? কাজেস একটা সুচতুর রহস্য রয়েছে কোথাও। দেশ জুড়ে এমন নিরাপদ কেল্লাগুলোকে নিজেরাই কি আর সমূলে ভেঙে ফেলতে চাইবেন আইন-প্রণেতার দল। ওঁরা কি অতই বোকা। এই কথাগুলোই তখন বোঝাচ্ছিলেন অন্নদা চক্রবর্তী। ব্যাপারটাব মধ্যে নির্ঘাৎ কোনও বড়সড় চাতুরি রয়েছে নচেৎ এতদিনে ক্ষুদে থেকে দুঁদে জমিদার-জোতদারদের চিৎকারে গাঁ-গঞ্জের আকাশ-বাতাস ফেটে যেত। খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন

প্রতাপলাল, চারপাশের জমিদাররা কোন পথ ধরেছেন তার সুলুক-সন্ধান নিচ্ছিলেন নির্ভরযোগ্য লোক মারফত। এর মধ্যেস একদিন কুচিয়াকোল রাজবাড়িতে পাঠিয়েছিলেন হরবল্লভকে। রতিকান্তকে অযোধ্যার এস্টেটে। মনে মনে কিছু উপায়ও ঠাউরে রেখেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন অন্যেরা কি করে। দেখেশুনে এগোনোই ভাল।

চোখে মুখে বিষাদরেখা ফুটিয়ে তুলে এক একে হাজির হয়েছিলেন এলাকার ছোটখাটো জোতদারেরা প্রায় সবাই। চুয়ামসিনাব প্রমথ গাঙ্গুলি, হীরালাল গাঙ্গুলি, সর্বেশ্বর দে, বৈদ্যার ঈশ্বর ধল্ল, অর্জুনপুরেব পরশুরাম দে, দাপানজুড়ির চৈতন্য দত্ত, কামদেব দত্ত, জয়রামপুরের পুরুষোত্তম ঘোষ...। জমিদার নয় কেউই, দু'তিনশো একর জমির জোতদার। মাঝে মাঝেই আসেন ওঁরা, সিংহগড়ের বুড়ো-কর্তাকে দর্শন করতে। ওঁরই আশ্রয়ে বংশানুক্রমিক বসবাস ওঁদের, অথর্ব শয্যাশায়ী হয়ে গেলেও এখনও অবধি ওদের আদেশ-নির্দেশ দাতা, আশা-ভরসার আশ্রয়। মরা হাতীও লাখ টাকা। সুদর্শন সিংহবাবু মারা যাওয়ার পর আর এই একজনই তো রয়েছেন এই তল্লাটে, যাঁর ছায়ায় বসে দু'দণ্ড নিরাপদ ভাবা চলে নিজেকে, যাঁর রোষদৃষ্টিতে এখনও কালো আঙরা হয়ে যায় অপরাধী মানুষ। আসেন ওঁরা, আজন্ম ছায়া-আশ্রয়দানকারী বৃদ্ধবটটিকে দেখতে আসেন, দুদণ্ড এখনও তাঁর ছায়ায় বসে সুখের, দু'একটি ঢেঁকুর তুলতে আসেন। ইদানিং একটু ঘনঘন আসছেন। জমিদারী-উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে জল কোন দিকে কতখানি বইল, তার হাল-হদিশ নিতেই এমন ঘনঘন দর্শন করতে আসা।

ভক্তিভরে দণ্ডবত সেবে সামান্য তফাতে নীচু আসনে বসেন সবাই।

প্রতাপলাল নীল আকাশের গায়ে চোখের ঘোলাটে মণি দুটো অলস ভঙ্গিতে ঘসছিলেন। এতগুলি বশংবদ মানুষের পায়ের শব্দে হুঁশে ফেরেন। দৃষ্টিখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে আনেন। চোখ রাখেন অনুগতদের ওপর।

'কি হে, খবর-টবর কি তুমাদের?'

গলার স্বর অনেক নেমে গেছে বুড়ো কর্তার। আরও ভেঙে গেছে শরীর। শুধোলেন বটে, কিন্তু আগন্তুকরা জানেন, ওদের এক-এক করে চিনতে পারেননি প্রতাপলাল। পুরু কাচের গোল চাকতি-চশমার আড়ালে একজোড়া ধূসর চোখ প্রায় অকেজো বলা চলে। একে একে নিজেদের নাম বলেন ওঁরা।

প্রতাপলাল তাও তাকিয়ে থাকেন অনুগতদের দিকে। ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নেন মুখ। দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম অপ্রসন্নতা।

'খবর ফের কী আইজ্ঞা।' ঈশ্বর ধল্ল ভারি বিষণ্ন গলায় বলেন, 'দুশ্চিন্তায় আছি সব। কবে ভিটা-মাটি থিক্যেও উচ্ছেদ কইর‍্যে দেয় সরকার। এই এক আগুনেই ত দগ্ধাচ্ছি সকলে।'

সে কথার কোনও জবাব দেন না প্রতাপলাল, মুখখানাও ঘোরান না ওঁদের দিকে। মুখের অপ্রসন্ন ভাবখানাও কমে না একতিল।

'আমরা ত' আপনার উপরই ভরসা কর‍্যে রয়্যেছি আইজ্ঞা।' ঈশ্বর ধল্ল খুবই বশংবদ গলায় উচ্চারণ করেন কথাগুলি।

'বটে, বটে!' যেন আচমকা ভারি মজা পেলেন প্রতাপলাল। গলায় ঝরে পড়ে শ্লেষ্মার মতো গাঢ় শ্লেষ, 'বিপদকালে তো মাইন্‌ষে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখে। ঈশ্বর কি আর ভরসা রাখে মাইন্‌ষের উপর? নাম কি? না, ঈশ্বর ধল্ল!'

বুড়ো-কর্তার এমন শ্লেষ মাখানো কথাগুলো হজম করতে ভারি কষ্ট হয় এঁদের। বিশেষ করে এই নিদারুণ সঙ্কটকালে। তাও বোকা বোকা হাসেন ওরা, ফ্যাকাসে নীরক্ত হাসি। সহসা বুঝি বেজায় ক্ষেপে যান প্রতাপলাল। আরাম-চেয়ারে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করেন। খর গলায় বলেন, 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, করে চিল্লিয়ে গলা ত বেশ ফাটিয়েছিলে তখন। লাও, ইবার স্বাধীনতা ধুইয়্যে জল খাও দিনে তিনবার। ডাক, তুমাদ্যার অনাথ রায়কে। সে ত স্বাধীনতার তরে জেল-টেল খেইট্যে আইল্যাক। উয়াকে শুধাও, কি হবেক এবে। আমার উপর ভরসা কর্যে কিচ্ছোটি নাই হবেক।' বলতে বলতে প্রতাপলাল শ্লেষ্মা মেশানো থুথু ছুঁড়ে দেন উঠোনের দিকে। এই সামান্য কথা ক'টি বলতে গিয়েও বেজায় হাঁফিয়ে গিয়েছেন তিনি।

গুম মেরে বসে থাকেন সবাই। রাগটা থিতোতে সময় দেন। এ সময়ে কথার জবাব দেওয়া কিংবা পাল্টা কোনও কথা বলা ঘোর রীতিবিরোধী কাজ।

খানিকবাদে ধাতস্থ হন প্রতাপলাল। উদ্‌গত রোষের পারদখানি নেমে যায় ধীরে ধীরে। ইদানিং কোনও বিষয়েই নিজেকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন না। শরীরেও বয় না, ইচ্ছেও করে না। এখন ছেড়ে দেবার বয়স, নতুন করে ধরবার নয়। না সাংসারিক বিষয়ে, না সামাজিক, রাজনৈতিক। সবকিছুই হরবল্লভের হাতে সঁপে দিয়ে, যে ক'টা দিন বাঁচেন, শান্ত নিরুদ্‌বিগ্ন জীবন। তবুও মাঝে মধ্যে, দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, মনের মধ্যে যেটুকু রোষ-বাষ্প জমে, এমনিধারা কোনও এক উপলক্ষ্যে উগরে দিয়ে ঠাণ্ডা মেরে যান।

খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর ধল্লদের দিকে তাকান প্রতাপলাল। মুখের মধ্যে খেলা করে বৈঠকি আমেজ।

বেশ তরল গলায় বলেন, 'সেই যে, বুড়ির মুরগি-পুষার গল্পটা।' খুব দুর্বল গলায় গল্পখানা বলে চলেন।

এক বুড়ির দু'মেয়ে। ভাচাতি ভেনে দিন চালায় বুড়ি। শেষ রাতে মুরগী ডাকলেই মেয়েদের ঘুম থেকে তুলে দেয়। ঝিঁঝকা প্রহর থেকে ঢেঁকিতে ওঠে মেয়েরা। ওরা 'পাহার দেয়, বুড়ি 'সেঁকায়'। 'পাহার' দিতে দিতে একেবারে বেদম হয়ে যায় মেয়েদুটো, তবুও যেন সকাল হয় না। ঘুমে জড়িয়ে আসে ওদের চোখ। মুরগীটার ওপর রাগ হয় বেজায়। ওর ডাকেই তো রোজ শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায় বুড়ির। একদিন দু'বোন মুরগীটাকে পেয়ে গেল আড়ালে। ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলল ওটাকে। যাগগে, আর শেষ রাতে ডাকবে না মুরগীটা, বেশ বেলা অবধি ঘুমোন যাবে। কিন্তু ফলটি হল উল্টো। প্রথম রাতে মুরগী ডাকল না। দু'বোন অনেক বেলা অবধি মজা করে ঘুমোল। বুড়ি মুরগিটাকে অনেক খুঁজল, অনেক কাঁদল। পরের রাত থেকে সতর্ক হয়ে গেল বুড়ি। মাঝরতেই ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে। বুঝি বা ভোর হয়ে এল। ডেকে দেয় মেয়েদের। লাগিয়ে দেয় ধান ভানবার কাজে। দু'বোন সেই

মাঝ রাত থেকে ঢেঁকিতে 'পাহার' দিতে শুরু করে। ঢেঁকি চালাতে চালাতে তাদের হাঁটু খুলে যাবার জোগাড় হয়, কিন্তু ভোরের আলো আর ফোটে না। দু'বোন আড়ালে শুধু চোখের জল মোছে। হায়রে, মুরগীটা যদ্দিন ছিল, শুধু শেষ রাত থেকেই খাটালি শুরু হত, এখন রাতভর চলে ঢেঁকি। ভাবে, হায়রে, বেশি সুখের লালসায় মারল্যম কুঁক্ড়াটাকে, ইখন আমাদ্যার দুখে তরুলতাও কাঁদে।

প্রতাপলাল আড়চোখে তাকান ঈশ্বর ধল্লদের দিকে। বলেন, 'বেশি সুখের লোভে কুঁক্ড়াটাকে মারলে, এখন কাঁদ দিনভর। আমার কি কইর্‌বার আছে? আমার আর ক'দিন!'

ঈশ্বর ধল্লরা সাড়া দেন না প্রতাপলালের কথায়। নিঃশব্দে হজম করেন সমস্ত দোষারোপ। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে চাপা অপরাধ। কে যেন খুব মৃদু গলায় কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেন, 'আমাদ্যার কি দোষ আইজ্ঞা? সক্কলে লাচলেক। আমরা আর কতটুকু বুঝি!'

সে কথার জবাব দেন না প্রতাপলাল। একমনে পা টিপছিল পাগল শিকারী, নিঃশব্দে উপভোগ করতে থাকেন আরামটুকু।

'তা বাদে, আপনি যা বইলেছিলেন, সিট্যাই বটে ঠিক।' ফের কথা তোলেন অর্জুনপুরের পরশুরাম দে, 'সুকুমার আচার্য উঠে পড়ে লেইগেছে। লোক ক্ষাপাচ্ছে দম্মে। পাড়ায় পাড়ায় মিটিন্ করছে।'

'কি বলছে উ ছগরা?'

'বলছে উই এক কথা। জমিদারী উচ্ছেদ হয়্যেঁছে। ইবার খাস জমিন বিলি হবেক। তার জন্য লড়াই কইর্‌তে হবেক সক্কলকে।'

সে কথার জবাব দেন না প্রতাপলাল। তিনি ফের দৃষ্টি বিঁধিয়ে দেন দিগন্তের গায়ে।

বসে বসে উসখুস করতে থাকেন আগন্তুক মানুষগুলি। মটমটিয়ে গাঁট ফোটান সময় কাটাবার অছিলায়। প্রতাপলাল ফিরেও তাকান না ওঁদের দিকে। বেলা বেড়ে যায়। রোদ্দুরে ঝাঁঝ বাড়ে। আকাশের অনেক উঁচুতে একদল চিল উড়ে বেড়াচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে, কালো বিন্দুর মতো লাগছে ওদের। মানুষগুলি পলকহীন চোখে দেখতে থাকেন চিলেদের খেলা।

'শালা, কেমন টিপু রে?' সহসা পাগল শিকারিকে পা'দিয়ে ঠোক্কর মারেন প্রতাপলাল, 'গায়ে জোর নাই? খাউ নি তুই?'

মানুষগুলি বুঝতে পারেন, আজ আর প্রসঙ্গের মধ্যে ঢুকবেন না প্রতাপলাল। একে একে উঠে দাঁড়ান ওঁরা। একে একে দণ্ডবত সেরে পা বাড়ান যে-যার বাড়ির দিকে।

সেই জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পরের ঘটনা এসব। সেই বিহ্বল, হতচকিত দিনগুলি। ধীরে ধীরে যথাসম্ভব সামাল দিয়েছে সবাই। যারা পারেনি, একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রতাপলাল পেরেছিলেন। পিঠের মধ্যেকার পুরটিকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ঝটিতি। কিন্তু সেই ঝড়-ঝাপটা, দোলাচলের দিনগুলি আজও স্মৃতিতে ঘাই মারে। এখন অবশ্য স্মৃতিশক্তি তত প্রখর নয়। কানে কম শোনেন, চোখে কম দেখেন। শরীরের খাঁজে খাঁজে বার্ধক্য। এখন আর পাগল শিকারি নয়, তার ছেলে মাকুন্দই তাঁর পরিচর্যায় রত থাকে অষ্টপ্রহর।

৩. টেকনোলজির কাছে হেরে যায় অবোধ চোর

সিং-দরজা পেরিয়ে সদর উঠোনে ঢোকে অধর ঝারমুনিয়া। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোলকুঁজো গোছের মুদ্রা বানিয়ে ফেলে উর্ধ্বাঙ্গে। বিনয়ে গদগদ। পিছে পিছে পচু। পচুর হাতে একখানা চকচকে সাইকেল। সাইকেলখানা গড়াতে গড়াতে বাপের পিছু পিছু এসে দাঁড়ায় সিংহগড়ের বৈঠকখানার সামনের উঁচু বারান্দার কিনার ঘেঁসে, উঠোনে।

আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়েছিলেন প্রতাপলাল। মাকুন্দ শিকারি তাঁর পা'দুটো আস্তে আস্তে ডলে দিচ্ছিল। কফ জমেছে বুকে। খকর খকর কাশছিলেন। ঘড়র ঘড়র আওয়াজ উঠছিল নিঃশ্বাসে। মাকুন্দর পাশে মেঝের ওপর নামানো ছিল কাঁসার পিকদান। এক পশলা কাশির পর গেঁয়োরটুকু ফেলবার মুদ্রা করলেই মাকুন্দ শিকারি পিকদানখানা দু'হাতে তুলে ধরছিল ওঁর মুখের সামনে। কফটুকু ফেলে দিয়েই ফের চোখ মুদে চলে যাচ্ছিলেন ভাবনার রাজ্যে, স্মৃতির রাজ্যে। অধর ঝারমুনিয়া যখন এসে পৌঁছোয় কর্তাবাবুর কাছাকাছি, ততক্ষণে এক প্রস্থ কফ ফেলে চোখ মুদেছেন প্রতাপলাল। শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছেন। অধর দু'হাত জোড় করে শরীরখানিকে ধনুকের মতো অনেকখানি বাঁকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম সারে। দেখাদেখি পচুও। তারপর পরবর্তী কাশির দমকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অধর, পচু, তাদের প্রণাম-পর্ব, কিছুই দেখলেন না প্রতাপলাল, তিনি তখন এক পশলা কাশির পর ফের চক্ষু মুদে তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না অধরদের। প্রণাম সর্বদা নির্ভুল নিশানায় পৌঁছে যায় যথাস্থানে, প্রভুপক্ষ সে প্রণাম দেখলেন কি দেখলেন না সে প্রশ্ন অবান্তর। তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী পশলার জন্য। কখন ফের কফ ফেলতে চোখ খুলবেন কর্তাবাবু, অধর সেই মুহূর্তটাকেই ব্যবহার করতে চায় তার আর্জিখানি পেশ করবার জন্য।

বেলা চড়ছে। রোদ্দুরের তেজ বাড়ছে। ভেজা মাটি থেকে যাবতীয় রস দ্রুত চুষে নিচ্ছে হাওয়া। চড়া রোদ্দুরের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে অধর আর পচু। কিন্তু প্রতাপলাল চোখ আর খোলেন না কিছুতেই। আর, অধরের অতখানি সাহস নেই যে সিংহগড়ের কর্তাবাবুর তন্দ্রা ভাঙিয়ে আর্জি পেশ করে। সে ভারি আশা করছিল, পরের পশলা কাশির দমকে যে কফটুকু বেরোবে, সেটা ফেলবার মুহূর্তে সামান্য ক্ষণের জন্য অবশ্যই চোখ খুলবেন কর্তাবাবু। আর তখনই.. ..। কিন্তু সে পশলাখানি কখন আসবে, তার তো কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এ'তো বাবুদের বাড়ির দেয়ালে টাঙানো ঘড়ি নয়, যে ঠিক একঘণ্টা পর পর বেজে উঠবে। পুরীর সমুদ্রের ঢেউও নয় যে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সারবন্দী ঢেউ আছড়ে পড়বে তীরে। কিংবা সোনামুখি—বিষ্টুপুর পয়লা বাস 'রাধাবল্লভ', রাধানগরে এল সকাল সাতটায়, আবার আসবে দ্বিতীয় বাস, 'মদনমোহন' সাড়ে দশটায়, ফের তৃতীয় বাস 'দামোদর' একটায়, 'পথের সাথী' চারটেয়। ওদের সময় একেবারে ঘড়ি ধরে বাঁধা। কাশির ক্ষেত্রে তো তেমনটা আশা করা চলে না। যদিও ইদানীং খুব কাশছেন কর্তাবাবু, বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় করছে সর্বদা, কিন্তু একপশলা কাশির পর নিশ্চয়ই করে তো বলা যায় না পরের পশলাটি কখন ঝরবে। যেমন ভর-দুপুরে কাঁকিলার আমবাগানের ছাতি ফুঁড়ে

হাঁটছে অধর, সহসা আমগাছের কোন মগডাল থেকে ঘুঘুর ডাক। ভর দুপুরে সেই গম্ভীর ডাক অধরের বুকের মধ্যে একধরনের মোচড় সৃষ্টি করে। অধর ভাবে, আবার শুনি। ভাবে আর হাঁটে। হয়ত এমন হল, পর পর তিনবার শোনা গেল সে ডাক, আবার হয়ত একবার ডেকেই অনাদি অন্তকালের জন্য চুপ। কিংবা ধরা যাক, ছিপ এড়েছে অধর, ঠাকুরপুকুরে। মাছ জমেছে চারে। খাচ্ছে। কিন্তু ফাতনা ওঠা-নামার ব্যাপারটা তো নিতান্তই অনিশ্চিত। এমন হল, খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ফাতনা তিন-চার বার ডুবু-ডুবু, আবার যুগ যুগান্ত কেটে যায় ফাতনা স্থির, অকম্প। কাজেই অধরকে অপেক্ষা করতে হয়, ভর রোদ্দুরে। করতেই হয়।

পচু ঝারমুনিয়ার কষ্ট হচ্ছিল। নিজের জন্য নয়। সাইকেলটার জন্য। রোদ্দুর লাগছে সাইকেলটাতে। তাতছে ওটা। সেটাই সহ্য করা কঠিন। পচু রোদ্দুর আড়াল করে দাঁড়ায়। এমনভাবে ছায়া ফেলে শরীরের, সাইকেলখানাকে এমন অবস্থানে রাখে, যাতে ওর নিজের এবং বাবার ছায়া মিলে সাইকেলের শরীরের অনেকখানি ঢেকে যায়।

কিন্তু পরের পশলাটি ঘনিয়ে আসার আগেই অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসেন হরবল্লভ। পেছন পেছন রতিকান্ত। অধর এবং পচু ভক্তিভরে প্রণাম সারে তাঁকেও।

—কি ব্যাপার, অধর যে? শীত শেষের বুঝো মুলো, কিনবে না, তবুও পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে যেমন কিনা দাম শুধিয়ে বসে খদ্দের, হরবল্লভ তেমনই আলগোছে শুধোন, পাশে ওটি কে?

—আইজ্ঞা, পঞ্চানন।

—ও, পচা? হরবল্লভ শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে আলস্যের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে চেয়ারখানাতে বসেন।

ততক্ষণে কাশি ছাড়াই হরবল্লভের গলার আওয়াজে চোখ খুলেছেন প্রতাপলাল। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দেখতে থাকেন অধরদের। অধর ও পচু ঘাড় নুইয়ে প্রণাম করে।

—এই নৈতন সাইকেল কার রে? হরবল্লভ শুধোন।

সে কথায় অধর ঝারমুনিয়া লজ্জায়, সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হয়ে যায়। কেমন করে বিষয়টি উত্থাপন করবে ভেবে ভেবে সারা হয় সে। একসময় রতিকান্তই বাঁচিয়ে দেয় ওকে। বলে, জানেন নাই? অধর যে বিয়া দিল্যাক ব্যাটার। শ্বশুর-ঘর থিকে সাইকেল যৌতুক পেইয়েছে যে।

—বটে, বটে! হরবল্লভের দু'চোখ কপালে উঠে যায়, এটা লয়, উটা লয়, একেবারে সাইকেল। বি-এ, এম-এ পাশও যা পায় না—।

অধর ঝারমুনিয়া বুঝি লজ্জায় মরে যায়। মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে তার। এমন চোরের মতো তাকায়, যেন ছেলের বিয়েতে সাইকেল যৌতুক নিয়ে কী এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে। মিনমিনে গলায় বলে, সবই আপনাদ্যার আশীর্বাদ হুজুর।

—বুঝল্যাম্। হরবল্লভ সহসা গম্ভীর হয়ে যান। মনে পড়ে, মাসটাক আগে অধর ঝারমুনিয়া সিংহগড়ে এসেছিল তার ব্যাটার বিয়ে উপলক্ষ্যে হরবল্লভকে নেমন্তন্ন করতে।

খুব গদগদ হয়ে বলেছিল, গড়ের সব্বাইকে গরীবের ঘরে পায়ের ধূলা দিতে হব্যেক হুজুর। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন হরবল্লভ। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি। অধর ঝারমুনিয়া ছেলের বিয়েতে সিংহগড়কে নেমন্তন্ন করতে এসেছে! নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সেটা অধরও বিলক্ষণ জানে। কিন্তু তবুও এসেছিল তো। সে দুঃসাহসও তো তার হয়েছে। আগের দিনকাল হলে ঐ স্তরের প্রজারা কি জমিদারকে নেমন্তন্ন করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত! আনন্দ-উৎসবে কাদের নেমন্তন্ন করে মানুষ? আত্মীয়-কুটুম্ব, সখা-স্বজন, সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের। অধর ঝারমুনিয়া তবে সিংহগড়ের মানুষজনদের সমগোত্রীয় ইয়ার-দোস্ত গোছের ভেবে নিয়েছে। রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করবার পাশাপাশি বুকখানা পুড়ে যাচ্ছিল লজ্জায়। এ কী যুগ এল, যখন পায়ের তলার কুকুরও মাথায় চড়তে চায়, একাসনে বসতে চায়, একপাতে খেতে চায়! আগের দিনকাল হলে বেঁধে চাবকে মগজের দাউদাউ আগুনখানা নেভানো যেত। কিন্তু যুগটাই বদলে গিয়েছে যে। এখন অধর ঝারমুনিয়াদের কথায় কথায় চাবকানো তো দূরের কথা, চটানোও চলে না। এদের ইদানীং অনেক কাজে দরকার হয়। সামনে নির্বাচন। হরবল্লভ দলের হয়ে ভোট ভিক্ষায় বেরোবেন। তখন এরাই তো সহায়। ভেতরের হাড়-জ্বলে যাওয়া ক্রোধটাকে কোনগতিকে সংবরণ করে হরবল্লভ বলেছিলেন, যেইত্যে কি পারব? দেখি। যাননি বটে, তবে সাত-পাঁচ ভেবে রতিকান্তকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ই সিংহগড়ের হয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করে এসেছে। রতিকান্তই ফিরে এসে জানায়, অধর নাকি সারাক্ষণ জনেজনে বলে বেড়িয়েছে, সিংহগড়ের কর্তাবাবুর আইবার কথা ছিল, অন্য কাজে বেস্তো থাকায়.....। দপ করে জ্বলে উঠেছিল হরবল্লভের মাথার আগুন। ঠাণ্ডা হতে সময় নিয়েছিল।

অধরের দিকে তাকান হরবল্লভ। নতুন সাইকেলটার দিকেও একঝলক দৃষ্টি ফেলেন। ইদানীং বিয়ে-সাদিতে খুব সাইকেল দেবার চল হয়েছে। রামা-ভীমারাও দুমাদ্দুম সাইকেল চেয়ে বসছে, হবু শ্বশুরের কাছে। অথচ একটা সময় ছিল, যখন পুরো লায়েকবাঁধ ইউনিয়নে সাইকেল বলতে ছিল গুটি তিনেক। দু'সিংহগড়ে দু'টি, আর একটা ছিল গাঙ্গুলিদের বাখুলে। এখন তো শুধু চুয়ামসিনা গাঁয়েই আট দশখানা সাইকেল। আগে সাইকেল বলতে ছিল হাম্বার, হারকুলিশ। বিলাতি সাইকেল। মজবুত বডি। ওজন কি তার। হাওয়ায় ছুটত। এখন অনেক দেশি কোম্পানি গজিয়েছে। পলকা পলকা সাইকেল বানাচ্ছে। দু'দিনেই ফ্রেম বেঁকে যায়। মাডগার্ড তুবড়ে যায়। শুধু সাইকেল কেন? বন্দুক, রেডিও...। বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র বছর বিশেক আগেও সিংহগড়ের দু'মহলে দুটো মাস্তর বন্দুক ছিল। ব্যস। রডা কোম্পানির বন্দুক। মেড ইন লন্ডন। সে বন্দুকে ফায়ার করলে দু'ক্রোশ দূর থেকে মানুষ বুঝতে পারত, এ হল রডা কোম্পানির বন্দুকের আওয়াজ। আর এখন? দেশি কোম্পানিগুলো বন্দুক বানাচ্ছে, যেমনই পলকা, তেমনি কমা। চার-ছ'টা ফায়ার না করতেই বডি গরম হয়ে, তেতে পুড়ে, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বন্দুকও তো এখন গাঁয়ে-গঞ্জে কম নয়। যে পারছে, একটা করে বন্দুক কিনে লিচ্ছে। লচেৎ, ঝাড়েশ্বর নায়ক, সেও একখানা বন্দুক কেনে! আর, সরকারও তেমনি। দেখা নেই, বোঝা নেই, রামা-ভীমা যে চাইছে, তাকেই দিয়ে দিচ্ছে লাইসেন্স।

আশ্চর্য। আর রেডিওর কথা তো বলে কাজ নেই। বিশ-পঁচিশ বিঘা জমিন যার, তার ঘরেও একখান রেডিও। আসল রেডিও তো নয়। এগুলোকে বলে, টানজিস্টার রেডিও। তার লাগে না, এরিয়াল লাগে না, পলকা গড়ন, প্লাস্‌টিক বডি। কত রকম ক্যাঁচ-কোঁচ, ঝন্‌ঝান, ছ্যাঁকফোড়ন আওয়াজ বেরোয় তার থেকে। ব্যাটা ছেলের গলার আওয়াজ মেয়ামাইন্‌ষের মতো শোনায়। আগের দিনের সে সব রেডিও কুথা? ফিলিপ্‌স্ কোম্পানির রেডিও। তার সাইজ কী! ওজন কী! কী গম্ভীর আওয়াজ! দু'দিকে দুটো বাঁশ তুলে দিয়ে ঘরের চাল সমান উঁচুতে তার টাঙিয়ে দিতে হত। পথ চলতি মানুষ দূর থেকে দেখেই বুঝত, রেডিও রয়েছে বাবুর বাখুলে। এক জোড়া মাত্তর রেডিও ছিল পুরো তল্লাটে। সিংহগড়েই ছিল। দু'মহলে দুটো। চারপাশের মানুষজন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত, রেডিও নয়, ঐ বাঁশে টাঙানো তারগাছার দিকে। সম্ভ্রমে মাথা নোয়াত। বাপ্‌রে, যে সে মহল লয় ইট্যা, সিংহগড়। তৃতীয় রেডিওটি কিনল প্রমথ গাঙ্গুলি, সেটাও তার খাঁচানো রেডিও। চতুর্থটি লোখেশোলের মহাদেব কয়াল। ওটিই প্রথম এ তল্লাটে তার-ছাড়া রেডিও, যাকে বলে ট্যানজিস্টার। রেডিওর ভেতরেই ব্যাটারি পুরে দেওয়া যেত। দু'সারিতে চারটে। একদিন চুবি হল মহাদেব কয়ালের বাড়িতে। সব কিছুর সঙ্গে চোর রেডিওটি নিয়ে গেল। আর তাতেই ধরা পড়ে গেল শালার চোর, কালো শিকারির ব্যাটা মেথর শিকারি।

ওটা যে রেডিও, বুঝতে পারেনি মেথর শিকারি। ঘরে গিয়ে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে চৌকো বাক্সমতো চিজটাকে দেখে কিঞ্চিৎ বেশি মাত্রায় কৌতূহল পয়দা হল তার মনে। খুটখাট নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় গাঁক গাঁক করে উঠল রেডিওর পো। ব্যাটারি ছিল একেবারে নতুন। নিঝ্‌ঝুম রাতে কালো শিকারির ঝুপড়িতে গাঁক-গাঁক আওয়াজ তুলেছে চৌকো বাক্স। গান গাইছে, কথা বলছে, বাজনা বাজছে। মেথর শিকারির প্রাণ তখন উড়ে গিয়েছে ভয়ে। চট-জলটি বাক্সখানাকে বগলে জেঁকে নিয়ে কুলিপথ ধরে দৌড়তে থাকে সে। মেথর যত দৌড়োয় বগলের বাক্স ততই গাঁকগাঁক করে বাজতে থাকে। ভয়ে-তাড়াসে মাঝপথেই ঝোপের মধ্যে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে আসে। তখন সে ঘেমে নেয়ে একসা।

সকাল বেলায় পথ-চলতি মানুষজন ঝোপের মধ্যে গুনগুনানি কথা শুনে থমকে দাঁড়ায়। ঝোপের মধ্যে কথা কয় কে? কে রে? জবাব দেয় না কেউ। গুনগুন করে কী সব হাবিজাবি বকে যায়। ভয়ে-তাড়াসে দৌড় লাগায় মানুষ। 'ভূত-ভূত' বলে চেঁচিয়ে পুরো শিকারিপাড়া মাথায় তোলে। পিলপিল করে বেরিয়ে আসে মানুষজন। দিনের বেলায় ভূত কুথারে? হপন দেখছু নাকি তুয়ারা? ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে তাদেরও বুক হিম হয়ে আসে। ঝোপের মধ্যে খুব ক্ষীণ গলায় কথা বলছে কেউ। সে কথার মর্ম বোঝা দায়। খবর চলে যায় চতুর্দিকে। বাবু-ভায়ারা দৌড়ে আসেন। ঝোপের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় রেডিও। রাতভর বেজে বেজে ব্যাটারির শেষ অবস্থা।

মহাদেব কয়াল সনাক্ত করেন রেডিও। বিচার বসে সিংহগড়ে। শিকারিপাড়ার সব্বাইকে তলব করা হয়। প্রতাপলাল সিংহবাবু চেয়ার চেপে বসেন। পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসেন

বাবুভায়ার দল। শিকারিপাড়ার লোকজন উঠোনের জমিনে থাবড়ে বসে থাকে। ভয়ে সবার মুখ আমসি। প্রতাপলাল বলেন, মহাদেবের রেডিও শিকারিপাড়ায় গেল্যাক কী কইর‍্যে? উয়ার ঠ্যাং ছিল? অতি লেহ্য কথা। শিকারিপাড়ার মুরুব্বিদের মনে মনে স্বীকার করতেই হয় কথাটা। হেনকালে, নেহাতই প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে, মেথর শিকারির আশেপাশের পড়শিরা দু'একজন ফাঁস করে দেয় কথাটা। নিশুত রাতে মেথরের ঝুপড়ি থেকে গাঁকগাঁক আওয়াজ শুনেছে ওরা। গান, বাজনা, কথা.....।

মেথর শিকারি তখন ফাঁসে পড়া মুষাটি। দু'ঘা পিঠে পড়তেই ওলাউঠার ভেদবমির মতো সবকিছু হড়হড়িয়ে কবুল করে সে। মালপত্তর সবই ফেরৎ পাওয়া যায়।

মহাদের কয়াল পরে সারা মুখে বিজ্ঞজনোচিত মুদ্রা বানিয়ে একান্তদের কাছে বলেছিলেন, ধরা পড়ত নাই। স্রেফ টেক্‌নোলজির কাছে হেইরে গেল্যাক মানুষটা।

অথচ আজ, ট্রানজিস্টার রেডিও তো গাঁয়েঘরে জল-ভাত তুল্য। দুনিয়ার সবকিছু বিলাসের সামগ্রী বড়ই সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। বারভোগ্য হয়ে যাচ্ছে একান্ত ভোগের বস্তুগুলি। হেঁজিপেঁজিরাও কিনতে লেগেছে। কিনছে অবশ্য সব দেশি, পলকা, দো-আঁশলা চিজ। দুধের বদলে পিটালিগোলা জল। কিন্তু কিনছে তো। কথায় কথায় শোনাচ্ছে ত সবাইকে। কুথা যাচ্ছু? না, বন্দুকের লাইসেঁস রিনু করতে। কুথা যাচ্ছু? না, রেডিওর বেটারি কিনতে। ভাবতে ভাবতে ক্রমশ তেতো হয়ে আসছিল হরবল্লভের মন। প্রসঙ্গটাকে ভুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই অধর ঝারমুনিয়ার ওপর দৃষ্টি ফেলেন পুনরায়, বল অধর, কী জন্যে আসা?

অদর ঝারমুনিয়া এতক্ষণ আকুলিবিকুলি করছিল বুঝি। একেবারে হামলে পড়ে সে, খোকা বইল্‌ল্যাক, সারকেলটা ত পেল্যম, কিন্তু হুজুরেরা টুকচান পায়ের ছোঁয়া না দিলে, চড়ি ক্যামনে? ত, বলল্যম, বটে ত, লেহ্য কথা। উয়াঁরা আমাদ্যার মালিক। চুদ্দোপুরুষের অন্নদাতা। ত, হুজুর...।

হরবল্লভ একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন। এক সময় উঠে দাঁড়ান। ততক্ষণে প্রতাপলাল পুনরায় ডুব মেরেছেন তাঁর নিজস্ব তন্দ্রার রাজ্যে।

পায়ে পায়ে প্রতাপলালের পাশটিতে এসে দাঁড়ান হরবল্লভ। একটুখানি ঝুঁকে পড়ে বেশ জোরগলায় ডাকেন, বাবা, অ বাবা.....।

হরবল্লভের ডাকে তন্দ্রা ভেঙে যায় প্রতাপলালের। ভাবলেশহীন চোখে তাকান ছেলের দিকে। তাকিয়েই থাকেন। হরবল্লভ গলাখানি আরও চড়ান, অধর আইছে। কাঁকিলার অধর ঝারমুনিয়া। শুনতে পাচ্ছেন?

—ক্যা? প্রতাপলাল নির্বিষ চোখে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে।

হরবল্লভ অধরের দিকে তর্জনী তাক করে পুনরায় চেঁচাতে থাকেন, অধর আইছে, আপনার পাশ.....।

প্রতাপলাল তাকানো মাত্রই অধর ও পচু পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম করে মাথা নুইয়ে।

—অধর? প্রতাপলাল পিটপিট করে দেখতে থাকেন অধর, পচু এবং নতুন সাইকেলটিকে।

—ক্যানে? অধর, ক্যানে?

—উয়ার ব্যাটা বিয়াঘরে সাইকেল পেইয়েছে। আপনার পা ছুঁয়াতে আইছে সাইকেল।

বার দুদিন চিৎকার করে বলবার পর কথাটা বোধগম্য হয় প্রতাপলালের। অথবা হয় না। নিতান্ত সংস্কার বশে, মাকুন্দ শিকারি যে পা'খানি টিপছিল না, আস্তে আস্তে সামনের দিকে তুলে ধরেন সেটি। পচু দ্রুতগতিতে সাইকেলটিকে উঁচু দাওয়ার কিনারে নিয়ে গিয়ে ছুঁইয়ে দেয় প্রতাপলালের পায়ে। তারপর দু'জনেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম সারে ভক্তিভরে।

সিং-দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছিল রতিকান্ত। ন্যাড়া বেলগাছটার সরুপানা ডালে একটা কাক তাবস্বরে চেঁচাচ্ছিল। অধররা বেরিয়ে আসতেই রতিকান্ত তাকায়। চিরিক করে খানিকটা তেতো রস মাটিতে ফেলে দিয়ে চতুর হাসি হাসে। বলে, দিনকালের কী হাল হইল্যাক হে, অধর?

—আইজ্ঞা? অধর ঝারমুনিয়া থমকে দাঁড়ায়। বোকাবোকা চোখে তাকায়।

—বইল্ছিল্যম্, আগে, পর্জারা বিয়া কইর্লে, নৈতন বউকে কম পক্ষে তিনরাত ভোগ কইর্ত জমিদার। উনি পেসাদ কইরে দিলে তবেই তা ভোগ কইর্তে পাইর্থ পর্জা। আর, আইজ? বউ রইল্যাক ঘরে, পর্জা আইছে সাইকেল দেখাতে।

৪. সাপটা ফণা তুলেই রয়েছে

যেমন বালতিতে সদ্য দোয়া দুধ। দুধ যত ফেনা তত, কুন্তীকে নিয়ে বুদ্ধদেবের মনের মধ্যে সেই ফেনাটুকু থিতোতে সময় নিয়েছিল অনেকখানি। তারপর তো কুন্তী একদিন সবার অলক্ষ্যে চুয়ামসিনা ছাড়ল।

বুদ্ধদেব অনেকদিন যায় নি কনকপ্রভার মহলে। নিজেকে একটু একটু করে ওদের সংশ্রব থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল সে। লোকমুখে শুনেছিল, কুন্তী নাকি গুরুতর অসুস্থ। খড়গপুরে মামার বাড়িতে রেখে দীর্ঘ চিকিৎসা চলছে তার। কুন্তীর শরীরের ব্যাধিটি ঠিক কি, এ নিয়ে এলাকায় নানান খবর চালু রয়েছে। কেউ বলে, তার শরীরের রক্ত নাকি জল হয়ে যাচ্ছে। কেউ বলে, তার পেটে নাকি টিউমার হয়েছে। কেউবা শুধু মুখ টিপে মুচকি হাসে। বলে, এ হইল্যাক বড়লোকদের ঘোড়ারোগ। আপনি বুঝবেন নাই। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল, একদিন গিয়ে কুন্তীকে দেখে আসে। কিন্তু অনেক কিসিমের বাধা এসে তার পথ আটকেছে অনেকভাবে। তারপর, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে চুয়ামসিনায় ফিরে এল কুন্তী। সে খবরও পেয়েছিল বুদ্ধদেব। কিন্তু সেই থেকেই কুন্তী লোকচক্ষুর সুমুখে বের হয়নি একদিনের তরেও। মহলের দোতলায় চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি বন্দী করে ফেলেছে সে। এমন কি ইদানীং তিনতলার ছাদে নীলপদ্ম কিংবা গোলাপী পদ্ম হয়েও আর ফুটে থাকতে দেখা যায় না ওকে। বুদ্ধদেব কনকপ্রভার মহলে যায়নি বটে, তবে মাঝে একদিন দীপমালা এসেছিলেন। অনেক বুঝিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধদেব রাজি হয় নি। এই প্রথম দীপমালার অনুরোধকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছে সে। তারপর তো তার নিজের জীবনেই নেমে এল প্রলয় ঝঞ্ঝা। এক আচমকা কালবোশেখী ঝড়।

চাষীদের জমিতে রাতের অন্ধকারে ইউরিয়া আর হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়ায় যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তেমন কোনও আশা ছিল না বুদ্ধদেবের। পদত্যাগপত্রখানি লিখে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষমুহূর্তে

পিছিয়ে এসেছিল সে। এমনিভাবে পরাজয় স্বীকার করতে শেষ অবধি সায় দেয়নি মন। হরবল্লভের দল ওকে নিয়ে যখন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখনই হরিণমুড়ির পাড়ে মরণগাছের তলা থেকে ওকে খুঁজে বের করেছিলেন এস-ডি-ও, বিডিও এবং থানার বড়বাবু। ততক্ষণে ঘটনার চাকাখানি সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে। এমন করে শাপে বর হবে, বুদ্ধদেব স্বপ্নেও ভাবেনি। ফলে, বিডিও সাহেব যখন কথাটা তুললেন, বুদ্ধদেব নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেনি।

সেদিন, হরিণমুড়ির পাড়ে মরণ-গাছের তলায় বসে নিজের পদত্যাগপত্রটিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সন্ধ্যার আঁধারে গা লুকিয়ে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসতে চেয়েছিল বুদ্ধদেব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাগল শিকারি ওকে খুঁজে পায়। এবং তারই সূত্র ধরে এস-ডি-ও সাহেবরা ওকে পাকড়াও করেন। সে রাতে এস-ডিও সাহেবের অনুমতি নিয়ে মল্লিকার বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিল বুদ্ধদেব। দু'জনে অনেক রাত অবধি বসে ছিল বাড়ির ছাদে। আকাশে মেঘ ছিল। কালবোস মাছের মতো কালো কুচকুচে এক আকাশ মেঘ যেন দু'জনকেই গিলে ফেলতে চাইছিল। সে রাতে আর ঘুম আসেনি বুদ্ধদেবের।

পরের দিন ব্লক অফিসে যেতেই বিডিও সাহেবের চেম্বারে ডাক পড়েছিল বুদ্ধদেবের।

বিডিও সাহেবের কণ্ঠে উথলে উঠেছিল স্নেহ, কই গেসলা? খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রাণ। সবাইরে চিন্তায় ফ্যালাইয়া দিস তুমি। বিডিও সাহেবের সারা মুখে নরম হাসি ছড়িয়ে ছিল। বলেন, যাও, ডি-এম তোমাকে ডাকসেন।

ডি-এম! বুদ্ধদেব চমকে ওঠে। বিডিও সাহেবের মুখখানি চকিতে জরিপ করে নেয়। লোকটার মুখ দেখে মনের কথা বোঝবার উপায় থাকে না কোনও দিনও। অনেক সময় ছুরি দিয়ে মাখন কাটার ভঙ্গিতে কারোর গলাখানি থেকে নামিয়ে আলাদা করে দিতে পারেন মুণ্ডু। বুদ্ধদেব অতীতেও এমনটা দেখেছে। চকিতে মনে পড়ে যায় সেই একদিনের কথা। সুকুমাররা দল বেঁধে ব্লক অফিসে গিয়েছিল কাজের দাবিতে। মিষ্টি কথায় ওদের ভুলিয়ে রেখে ওদের সামনেই এস-ডি-ও-কে ফোন করে পুলিশ আমিয়েছিলেন। লাঠিপেটা করিয়েছিলেন সব ক'টাকে। বিডিও সাহেব সেটা পারেন। মিছরির ছুরিখানি চালিয়ে হাসতে হাসতে তুলে নিতে পারেন কলিজা। বুদ্ধদেবের কেন জানি ভয় করে। ডি-এম-সাহেব তাকে ডাকতে যাবেন কেন? তিনি কি বুদ্ধদেবকে চেনেন? বুদ্ধদেবের মনখানা অজান্তে কু-গাইতে শুরু করেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, আরও কোনও সর্বনাশা খবর নিজের মুখে শোনানোর জন্যই হয়ত বা ডি-এম'এর হাতে তুলে দিয়েছেন বিডিও এবং এস-ডি-ও সাহেব। খুব অনিশ্চিত চোখে বিডিও সাহেবের দিকে তাকায় বুদ্ধদেব।

বিডিও সাহেব বলেন, তুমি অহন একটুখানি রেস্ট নাও। অনেক ধকল গ্যাসে গা তোমার উপর দিয়া। খানিক বাদে আমি তোমায় লইয়া যামু কালেক্টরেটে।

অপরিসীম দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বুদ্ধদেব দেখতে পায়, বারান্দায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে মল্লিকা। বুদ্ধদেবকে ইঙ্গিতে ডাকে। দু'জনে পায়ে পায়ে চলে যায় দুঃখহরণের বটতলায়। চায়ের দোকান থেকে খানিক তফাতে বসে মল্লিকা। সব কিছু খোলসা করে বলে। শুনতে শুনতে বিস্ময়ে থ'হয়ে যায় বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব যখন দিনভর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ততক্ষণে ডি-এম'এর কানে পুরো ব্যাপারটা পৌঁছে গিয়েছে।

—খবরটা কারা দিয়েছে জান? মল্লিকা উজ্জ্বল চোখে শুধোয়।

বুদ্ধদেব অনিশ্চিত মাথা নাড়ে।

—সংগঠনের জেলাস্তরের নেতারা এবং অনাথদা। শুনে ডি. এম তৎক্ষণাৎ ফোন করেন এস-ডি-ওকে। শুনতে পাচ্ছি, ফোনেই নাকি এস-ডি-ওকে যৎপরোনাস্তি ধমক দিয়েছেন ডি-এম। সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে যে কিনা বোনডাস্ট এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার চালু করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে কারা? তাদের এখনও এ্যারেস্ট করেননি কেন? ছেলেটাকে প্রোটেকশন দেননি কেন? কি করছে আপনার পুলিশ? আপনার এলাকার নেতাদের জানিয়ে দিন, এই নিয়ে সামান্য গোলমাল করলে, ছেলেটার গায়ে কুটোর আঁচড় লাগলে, কাউকেই রেহাই দেব না আমি। আর, ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। শুনেই এস-ডি-ও সাহেব তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন থানার ও-সি, এস-ডি-পি-ও, স্থানীয় নেতা রামকমল চক্রবর্তী আর এম-এল-এ সিদ্ধেশ্বর হাজরাকে। ডি-এম'এর নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলেন ওদের কানে। বলেছিলেন, লোকটার সম্পর্কে সবকিছু শুনেছেন বোধ হয়। কাঁথিতে এস-ডি-ও থাকাকালীন কী করেছিলেন মনে নেই? গোঁয়ার্তুমি করতে মানা করুন হরবল্লভবাবুকে। আপনারা গিয়ে এলাকায় একটি মিটিং করুন। রাসায়নিক সারের গুণগান করে আসুন। খবরদার, উল্টোপাল্টা কিছু বলবেন না। আমার যা বলবার, বললাম। শোনেন তো ভালই, নইলে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে তখন আমাকে দোষ দেবেন না যেন। লোকটাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। ওর কামড় হল কচ্ছপের কামড়। মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

এস-ডি-ও সাহেবের এমন সরস উপমায় এতক্ষণে মুখ খোলেন রামকমল চক্রবর্তী। বলেন, মেঘ যাতে ডাকে সেই ব্যবস্থাই তাহলে করতে হয়।

—সেটা বোধ করি পেরে উঠবেন না। ভারি কাচের আড়াল থেকে এস-ডি-ও সাহেবের চোখদুটি কৌতুকে ঝিলিক তোলে, মেঘও বোধ করি তাঁর হাতের মুঠোয়। শুনেছি, ওপর মহলে বিরাট প্রভাব।

এস-ডি-ও'র নির্দেশে সেই বিকেলেই ও-সি এবং এস-ডি-পি'ও দৌড়েছিলেন চুয়ামসিনার উদ্দেশে। হরবল্লভকে বুঝিয়েছিলেন পরিস্থিতির গুরুত্ব। এস-ডি-পি-ও স্পষ্ট হুমকি দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা যদি আর এক ইঞ্চিও গড়ায় তাহলে আজ রাতেই হয়ত বা তুলে নিতে হবে আপনাকে। এ বড় কঠিন ঠাঁই মশায়। হরবল্লভ বিষম ক্রোধে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু সন্ধে নাগাদ যখন সিদ্ধেশ্বর হাজরার চিঠি বয়ে নিয়ে পল্টু এসে হাজির হল, চিঠিখানা পড়ামাত্রই একরাশ মেঘ ঘনিয়ে এল হরবল্লভের মুখে।

সেইদিন বিকেলে ডি-এম সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিল বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব স্বয়ং

জীপে চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডি-এম’এর সামনে এমন ভাব করছিলেন, যেন বুদ্ধদেবের এই কৃতিত্বের মূলে তিনিই। বারবার বলছিলেন তাঁর সেই পুরোনো প্রবচনখানি। বলেছিলেন, আমি তো রোজদিনই এদের একটা কথাই বলি স্যার। বলি, সিনসিয়ারিটি কস্টস্ এ লিটিল, বাট পেজ এ মোর। ডি-এম সাহেব খুব একটা আমল দেন নি ওঁর কথায়। তার বদলে বুদ্ধদেবের খোঁজখবর নিয়েছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তার ঘরবাড়ি, বাবা-মা, শিক্ষা-দীক্ষা, সবকিছু জেনে নেবার পর বলেছিলেন, আমি তোমার ওপর খুবই খুশি হয়েছি। গো এ্যাহেড। দেশে তোমাদের মতো ছেলে আরও বেশি বেশি দরকার। কোনও অসুবিধেয় পড়লে সোজা আমার কাছে চলে এসো। তবে শুনেছি, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তোমার খুবই ওঠা বসা। ওটা বন্ধ কর। কম্যুনিস্ট্স্ আর ব্যাড পিপ্ল্।

বিডিও সাহেব অবশ্যি ফিরে এসে পুরো ঘটনাটাকে অন্যভাবে প্রচার করেছিলেন। ডি-এম নাকি ওঁকে বলেছেন, মিঃ ভৌমিক, আপনার লিডারশীপে যে আমার জেলায় এমনটা হতে পারল, তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি প্রশাসনের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ।

তাও দিন-দুয়েক মল্লিকার ওখানেই ছিল বুদ্ধদেব। দীপমালার সঙ্গেও কথা বলেছিল। প্রণয়দার সঙ্গেও। দ্বিতীয় দিনেই অনাথবন্ধু এলেন। বললেন, প্রথম ফাঁড়াটা তবে কাটল। সে রাতে খুবই খুঁজেছ আমায়। বাড়িতেও গিয়েছিলে। কিন্তু আমি তো তখন বাঁকুড়ায়। তুমি যখন আমার বাড়িতে, আমি তখন ডি-এম-এর বাংলোয়। যথাসময়ে ডি-এম’এর কাছে পৌঁছোতে না পারলে কেসটা অন্যদিকে ঘুরে যেত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে অন্যত্র। তুমি একেবারে সাপের ল্যাজে পা দিয়ে ফেলেছ। রক্ষা পেয়ে গেলে কোনও গতিকে, কিন্তু সাপটা যে ফণা তুলেই রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ছোবল দেবে। আসলে, তুমি হরবল্লভের আজন্মলালিত মর্যাদা আর প্রভুত্বের জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছ। নীল রক্তের অধিকারী ওরা, কখনো কারোর কাছে মাথা নোয়ানোর অভ্যেস নেই। তোমার জন্য তাকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। ফেলে দেওয়া থুথু গিলতে হয়েছে পুনরায়। সুযোগ পেলেই তার বদলা নেবে। আমি বলি কি, তুমি বরং ঐ এলাকাটা ছেড়ে অন্য কোনও অন্য কোনও অঞ্চলে পোস্টিং নিয়ে চলে যাও। এখানে থাকলে যে কোনও মুহূর্তে তোমার বিপদ হতে পারে।

বুদ্ধদেবের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বেঁকে বসেছিলেন খোদ ডি-এম সাহেব। বলেছিলেন, না, বুদ্ধদেব ওখানেই থাকবে। ওকে সরিয়ে নিলে বজ্জাতদের মোরেল বেড়ে যাবে। বাধ্য হয়ে বুদ্ধদেবকে থেকে যেতে হল। তবে ওকে কিছুতেই সিংহগড়ে থাকতে দেন নি অনাথবন্ধু। বুদ্ধদেবের আপত্তি ছিল তাতে। আমার জন্য আপনি কেন ওদের বিষ নজরে পড়তে যাবেন। শুনে হা-হা করে হেসেছিলেন অনাথবন্ধু। আমার কথা ভেবো না। আমার হল, সুমদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়,—সেই অবস্থা। আমি সেই প্রথম থেকেই ওদের বিষ-নজরে। কিন্তু তুমি একেবারে সাপের ল্যাজে পা দিয়ে ফেলেছ। ছোবলের জন্য তৈরি হও।

সেই থেকে হরবল্লভের ছোবল ঠেকাতে ঠেকাতে বিপর্যস্ত কনকপ্রভাদের সঙ্গে সমস্ত প্রকারের সংযোগ প্রায় হারিয়ে বসেছিল। এমনই এক মুহূর্তে কনকপ্রভাই একদিন নিকুঞ্জপতি

মারফৎ ডেকে পাঠান ওকে। এবং অনেক ধরনের সুখাদ্য পরিবেশনের পর এক সময়, কী আশ্চর্য, সরাসরি দিয়ে বসেন প্রস্তাবটা। আশ্চর্য, বিষম আশ্চর্য।

প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলেছিলেন কনকপ্রভা, কুন্তীকে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। তোমার আপত্তি আছে?

আচমকা এমন প্রস্তাবে একেবারে হতচকিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল বুদ্ধদেব। তার শরীর থেকে কয়েকটি শুকনো পাতা ঝরে পড়েছিল অজান্তে। কুন্তী তখন ধারেকাছে ছিল না। প্রশ্নটা করেই কনকপ্রভা থিরপলকে তাকিয়ে ছিলেন বুদ্ধদেবের দিকে। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল কন্যাদায়গ্রস্ত মায়ের অসহায়তা। ঐ অসহায়তার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি 'না' বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল বুদ্ধদেবের। আর 'হ্যাঁ' বলতেও ভয়। ভয়, ভয়। তার মনের মধ্যে শুরু হয়েছিল এক অচেনা দ্বন্দ্ব। কেন কি, ছুঁতে চায় মন, অথচ ছুঁলেই ফোস্কা পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ, এই তো কুন্তী। চিরকালই তো তেমনই সে। তৎক্ষণাৎ কোনও জবাবই দিতে পারে নি বুদ্ধদেব। সবিনয়ে জানিয়েছিল, আমি পরে জানাব।

৫. কনকপ্রভার অকাল বৈধব্য

কনকপ্রভা নির্নিমেষ তাকিয়েছিলেন। দেখছিলেন। দ্বারকেশ্বরের দ। অদূরে বিশাল বটের তলায় ছইবাঁধা গরুর গাড়ি। মাত্র একখানা। জীবনে এই প্রথম, একখানা মাত্র গরুর গাড়িতে চড়ে সফর সেরে ফিরছেন কনকপ্রভা। চারপাশের গাঁ-গঞ্জের মানুষজন যারা এতাবৎকাল প্রত্যক্ষ করেছে তাঁর রাজকীয় সফর, মনে মনে আবাক মানে। ভেবে ভেবে সারা হয়। কমপক্ষে আধডজন গরুর গাড়িতে লোকলস্কর, আত্মীয়পরিজন, অনুগত-বশংবদ, ঠাকুর-চাকর, ধোপানী, নাপতানি, মাল-বাহক-খিদমতকার সহযোগে ভ্রমণে বেরোন যিনি, তাঁর এমন হতশ্রী আয়োজন, ভাবা যায়? তবে কি ভেতরে ভেতরে কলসির জল একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে? যথেষ্ট পরিমাণে জাঁকজমক, আড়ম্বর দেখাবার রেস্ত কি একেবারেই শেষ? চারপাশের ডালে-পালায় শেষ বিকেলের ম্লান রোদ্দুর। পাখিপাখাল ফিরে চলেছে যে যার বাসায়। কনকপ্রভার বুঝি ভ্রূক্ষেপই নেই যে তাঁকেও ফিরতে হবে বাসায়। গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছে একাকিনী কুন্তী। চপল লোহার যথেষ্ট দূরত্বে একমনে চুটি টানছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে নিচ্ছে মালকিন নদীর পাড়ে বসে রয়েছেন, নাকি চলে এসেছেন গাড়ির কাছাকাছি। মালকিনের অমন অনাড়ম্বর নিরাভরণ সফরের কারণে বেচারা মরমে মরে রয়েছে। এই কিনা চুয়ামসিনার সুদর্শন সিংহবাবুর নাত-বৌয়ের সফরের ছিরি! সেই গতকাল থেকেই এই কারণে মনটা মিইয়ে রয়েছে চপলের।

এই মুহূর্তে দ্বারকেশ্বরের দু'পাড়ে বিছিয়ে দেওয়া বালুচরীর গায়ে চোখ বিঁধিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছেন কনকপ্রভা। চারপাশের নিসর্গ-জগৎ, গাছ-গাছাল, পাখ-পাখাল, পথচারী মানুষজন, সবকিছুই তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। একেবারে অন্য জগতে চলে গিয়েছেন কনকপ্রভা।

দ্বারকেশ্বরের পাড় ধরে যখন ধীরলয়ে চলছিল গরুর গাড়ি, কুন্তী একতাল কাপড়ের পুঁটলির মতো শুয়েছিল কনকপ্রভার কোলে, তখন থেকেই দৃষ্টিখানা একটু একটু করে আটকে

যাচ্ছিল নদীতে, ডুবে যাচ্ছিল ধীরলয়ে। এক সময় খুব মৃদু গলায় বলেছিলেন, 'চপল, গাড়ি থামা তো রে। একটু নামবে। কোমরটা টনটন কচ্ছে। বটের তলায় গাড়ি থামাল চপল লোহার। কনকপ্রভা খুব সাবধানে কুন্তীর মাথা নামিয়ে দিলেন কোল থেকে। কুন্তী চোখ মেলে চাইল। চোখের ভাষায় প্রশ্ন করল, গাড়ি থেকে নেমে কোথায় চলেছ মা? প্রশ্নটা বুঝি কনকপ্রভার বোধগম্য হয়। বিড়বিড়িয়ে বলেন, শুয়ে থাক্। কনকপ্রভা নেমে পড়েন। পায়ে পায়ে এগিয়ে যান নদীর একেবারে কিনারে। তখন ফাগুন মাস। নদীর পাড়ে যাবতীয় কাশফুল শুকিয়ে গিয়েছে। নদীর ওপাড়ে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত খাঁ-খাঁ, শূন্য। কুন্তী কিছুই শুধোয় না। তার চোখদুটি কনকপ্রভার শরীরকে সামান্যক্ষণ অনুসরণ করে থেমে যায় একসময়। তার পাণ্ডুর ঠোঁটদুটি কেবল বারকয় অতি মৃদু লয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। খুব শীত করছে শরীরে, এমনই এক ধরনের ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে সর্বাঙ্গে। গায়ের শালখানি ঠিক করে নেয় আলগোছে। কনকপ্রভা একেবারে জলের কাছটিতে গিয়ে থামেন। নদীর স্রোত নয় এটা। নদী থেকে বিচ্ছিন্ন দ'য়ের বুকে এক চিলতে কাকচক্ষু জল। দ'য়ের কিনার ঘেঁষে বসেন কনকপ্রভা। আর অমনি, তৎক্ষণাৎ, তাঁর মধ্যে, স্বচ্ছ জলে শরীরের ছায়া ভেসে ওঠার মতোই, ভেসে ওঠে এক উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী। হরিণীর মতো চঞ্চল পা' দুটিতে একজোড়া রূপোর মল, সারাদিন, সারাক্ষণ, রুমুর-ঝুমুর বাজে। তার কালো চোখের তারায় সারাদিনে অসংখ্য বিদ্যুতের চকিত চমক। সে কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। একেবারে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠতে পারে অকস্মাৎ। কারন, ইতিমধ্যেই সে পেয়ে গেছে তার শরীরের অন্তর্গত অপরূপ সৌন্দর্যের সন্ধান। চারপাশের সবাইয়ের চোখের তারায় সে আবিষ্কার করে ফেলেছে তার অগাধ-রূপের খবর।

লাবণ্যর চোখের তারায়ও সে খবর চাপা থাকেনি। কিশোরীটিকে দেখতে দেখতে লাবণ্যর মুখের প্রতিটি রেখা কমণীয় হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। কনকপ্রভার বাবাকে অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধিয়েছিলেন, কত জলদি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

কনকপ্রভার বাবা, মেদিনীপুর জজকোর্টের সামান্য মোক্তার, বুঝি আকাশের চাঁদ পেয়েছিলেন হাতে, নিজের মেয়ের সৌভাগ্যকে বুঝি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। লাবণ্যর আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন চুয়ামসিনা গেলেন তিনি। ফিরে এসে প্রায় যুবতী কনকপ্রভাকে কাছে টেনে নিয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন, আমার মেয়ে রাজরাণী হতে চলেছে। রাজরাণী। তারপর হপ্তাকাল ধরে চলেছিল তাঁর সিংহগড়-বন্দনা। কী বিশাল প্রাসাদ, মোটামোটা থাম, কত দামী দামী আসবাবপত্র, দীঘি, বাগিচা, লোক-লস্কর...এলাহি ব্যাপার। বলেছিলেন, আমরা ওদের কাছে চামচিকা।

প্রিয়ব্রত দেখতে আসেন নি কনকপ্রভাকে, তবে ফিরে এসে কনকপ্রভার বাবা ছেলের রূপের, গুণের প্রশস্তি করেছিলেন শতমুখে। পরে কনকপ্রভার তিলতিল মনে হয়েছে, ধনদৌলত, প্রাসাদ, মহল সম্পর্কে বাবার মূল্যায়ন ঠিকই থাকলেও প্রিয়ব্রতর প্রশ্নে তিনি বোধ করি অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, যখন তিনি সিংহগড়ে যান, কঠিন

রোগে ভুগতে ভুগতে প্রিয়ব্রতর শরীর তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। বাবা ব্যাপারটা তেমন করে বলেন নি কাউকে। অথচ প্রিয়ব্রতর বুকের দোষ তখনই ধরা পড়ে গিয়েছে ডাক্তারি পরীক্ষায়। বাবা কি জানতেন না সেটা? কেউ কি বলেনি? ব্যাপারটা কি বাবার কাছে ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছিলেন লাবণ্য? নাকি, সবকিছু জানা সত্ত্বেও বাবা হালকাভাবে নিয়েছিলেন ব্যাপারখানা? প্রিয়ব্রত যে সেই স্কুলজীবন থেকেই উড়ো-পাখি, সে যে স্বদেশী করত, সে যে কম্যুনিস্ট হয়েছিল, বনে-বাদাড়ে লুকোতে লুকোতে, পালাতে পালাতেই যে তার জীবন কাটে, এত তথ্য কি বাবা জানতেন না? নাকি, শুনেও তেমন গা করেন নি? মেয়ের বিশাল সৌভাগ্যের কথা ভেবে এই সবকিছুকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তাঁর? সিংহগড়ের সম্পদের জৌলুষে কি চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বাবার? অথচ, কনকপ্রভার স্থির বিশ্বাস, মেয়ের-বাবার সর্তক, সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে চোখ চারালে কনকপ্রভার বাবা অবশ্যই দেখতে পেতেন, এমন চোখ ধাঁধানো সম্পদের মধ্যেও কনকপ্রভার সুখপাখিটি কিছুতেই বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না। তেমন কিছু লক্ষণ তখনই ছিল সিংহগড়ের খাঁজে-ভাঁজে। বাবা নজর করেন নি সেটা। সম্ভবত ধন-দৌলত, অগাধ বৈভব থেকে অন্যদিকে নজর সরাতেই পেরে ওঠেন নি বাবা। পারলেও, হয়ত বা, লাবণ্যর মতোই বিশ্বাস করে ফেলেছেন, কনকপ্রভা তার আগধ রূপের ঐশ্বর্য দিয়ে প্রিয়ব্রতকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হবেন। উড়ন্ত পাখিটি ধরা দেবে, আজীবনকাল বন্দী থাকবে রূপের খাঁচায়।

এই কথাটি ভাবতে গেলেই কনকপ্রভার সারা মন হাহাকারে ভরে যায় আজও।

অগাধ রূপ আর যৌবন নিয়ে সিংহগড়ে প্রবেশ করেছিলেন কনকপ্রভা। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ দুরুদুরু রোমাঞ্চ। দু' চোখের নরম পাতায় কাজলের মতো আঁকা ছিল প্রিয়ব্রতকে নিয়ে কতকত স্বপ্ন, কল্পনা। কনকপ্রভাকে দেখামাত্তর যুবক প্রিয়ব্রতর দু'চোখ জুড়ে জ্বলে উঠবে বন্দনা-দীপ, এমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁর দিনগুলি কাটছিল।

মনে পড়ে, সিংহগড় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লাবণ্যপ্রভা খুব একান্তে গুটিকয় কথা বলেছিলেন। কনকপ্রভাকে প্রায় বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, এ সংসারে ঝি-চাকরের অভাব নেই। তোমাকে কুটোটিও নাড়াতে হবেক নাই। এখন থেকে প্রিয়ব্রতকে দেখাশোনা করাই তোমার একমাত্র কাজ। ছেলে নয়, সে এক উড়ন্ত পাখি। তাকে পোষ মানিয়ে সিংহগড়ে আটকে রাখাই তোমার একমাত্র কাজ। পারবে তো? কনকপ্রভা ততদিনে তাঁর রূপের মোহিনী-মায়ার সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলেছিলেন, পারব।

সেদিনের সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লে আজও প্রবল লজ্জায়, অপমানে, লাল হয়ে ওঠেন কনকপ্রভা। কারণ, লাবণ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতির শোচনীয় পরিণতি।

ফুলশয্যার রাতেই কনকপ্রভা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, একদা-রূপবান প্রিয়ব্রত বর্তমানে চামড়ায় ঢাকা একটি কংকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কোটরের কোন্ অতলে ঢুকে গিয়েছে চোখদুটি। কণ্ঠার হাড় প্রকট হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। হাঁপানী রোগীর মতো সাঁইসাঁই দম নিচ্ছিলেন মানুষটি। কিন্তু এসবও বুঝি কিছু নয়। কনকপ্রভা লক্ষ করছিলেন,

শরীরে তো নয়ই, মানুষটার দু'চোখের মণিতেও তিলমাত্র যৌবনের ভাষা ছিল না। নিস্পৃহ মুখমণ্ডল জুড়ে সীমাহীন উদাসীনতা। মনটা যেন কখনই থাকে না শরীরের খাঁচায়। কনকপ্রভার দিকে তাকালেন, কথা বললেন, কিন্তু সে দৃষ্টিতে তিলমাত্র উত্তাপ ছিল না। গলার স্বরে ছিল না কোনও আবেগ। আর, তারপরই তো তিনি পুনরায় উড়লেন।

যেদিন তিনি সিংহগড় ছেড়ে যাবেন, তার আগের রাতে কনকপ্রভার সঙ্গে সারারাত এক বিছানায় শুয়েছিলেন প্রিয়ব্রত। এলোমেলো দু'চারটে কথাও বলেছিলেন। কনকপ্রভার হাত দুটি তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। একরাশ কালো চুলের মধ্যে আঙুলগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু সে সান্নিধ্যে কোনও উষ্ণতা ছিল না। একসময় সরাসরি প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন প্রিয়ব্রত।

—কাল সকালেই আমাকে একটুখানি বাইরে যেতে হচ্ছে।

—কোথায়? ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছিলেন কনকপ্রভা।

—আমার কাজের জায়গায়। কত কাজ বাকি!

—আপনার কী কাজ? কোথায় কাজ?

সে কথায় প্রিয়ব্রত বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন কনকপ্রভার দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণে বুঝি বারেকের তরে উঁকি মেরেছিল এক চিলতে রহস্যময় হাসি। উঁকি মেরেই মিলিয়ে গিয়েছিল। কনকপ্রভার প্রশ্নের কোনও জবাব দেন নি প্রিয়ব্রত।

দুঃখে, অভিমানে সে রাতে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন কনকপ্রভা। আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন প্রিয়ব্রতর কাছে। আপনার শরীর এখনও পুরোপুরি সারে নি। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রিয়ব্রত সে কথার জবাব দেন নি।

শেষ মুহূর্তে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন কনকপ্রভা, আপনি চলে গেলে, আমি কী নিয়ে থাকব?

নিঃশব্দে পাশটিতে শুয়েছিলেন প্রিয়ব্রত। একসময় পাশ ফিরে শোন। খুব অনুত্তেজিত গলায় বলেন, আমি তো দিনকয় বাদে ফিরে আসব। তুমি মায়ের কাছে ভালই থাকবে।

প্রিয়ব্রত চলে গেলেন। অতবড় সিংহগড়খানা কনকপ্রভার কাছে মুহূর্তের মধ্যে খাঁ-খাঁ শূন্য হয়ে গেল। শূন্যতার বোধ যত না, তার চেয়ে বেশি লজ্জা, অপমান। লাবণ্যের কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে? সদ্য বিয়ে হওয়া রূপসী বউকে অগ্রাহ্য করে ঘর ছাড়ল বর, দুনিয়ার কাছে তিনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন? যে ক'দিন ঘরে ছিলেন প্রিয়ব্রত, লাবণ্য ছিলেন অতিমাত্রায় উচ্ছল। কনকপ্রভাকে বারংবার একান্তে ডেকে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলছিলেন, কী খেতে ভালবাসেন প্রিয়ব্রত, কী কী পছন্দ করেন, কোন্ বিষয়ে তাঁর নিদারুণ অপছন্দ...। কেমন করে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তাঁকে বশ করা সম্ভব, তাও। এবং প্রতিবারেই সাহস যোগাচ্ছিলেন কনকপ্রভার মনে, তুমি পারবে, মা। আমার কোনই সন্দেহ নাই। তুমি পারবে।

প্রায় মাসাধিককাল ফিরে এলেন না প্রিয়ব্রত। লাবণ্যর সারা মুখে একটু একটু করে মেঘ জমল। সিংহগড়ের ঝি-চাকর, অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে শুরু হল ফিসফিসানি কথাবার্তা। এবং সেই কথাবার্তার ভেতর থেকে একটু একটু করে উঠে এল দীপমালার নাম।

দীপমালার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর সম্পর্ক নিয়ে যাবতীয় জল্পনা কল্পনা, গুজব, কনকপ্রভার মনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তখনও অবধি দীপমালাকে দেখেন নি কনকপ্রভা। দেখেছিলেন অনেক পরে। এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ কনকপ্রভা একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে তাঁর রূপের কাছে দীপমালা নেহাতই নিষ্প্রভ। রূপের মোহে কনকপ্রভাকে ছেড়ে দীপমালার সঙ্গ কামনা করবেন প্রিয়ব্রত, এমনটা দীর্ঘকাল বিশ্বাসই করেন নি কনকপ্রভা। কিন্তু তবুও তাঁর মনে ধীরে ধীরে প্রত্যয় জন্মেছিল, যে কোনও কারণেই হোক, দীপমালার প্রতি প্রিয়ব্রতর একধরনের রহস্যময় দুর্বলতা রয়েছে। সেটা ঠিক প্রেম কিনা আজও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন কনকপ্রভা। তবে একটা বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ যে, পুরুষের মনের গভীরে বাঞ্ছিত এক নারীর প্রতি যে গোপন বাসনা লুকিয়ে থাকা সম্ভব, প্রিয়ব্রতর মনের মধ্যে তেমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কোনও অবৈধ সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে কোনও কালেই ছিল না। শুধু নারী নিয়ে নয়, জীবনের কোনও বিষয়েই প্রিয়ব্রতর মধ্যে কোনও দ্বি-চারিতা ছিল না, এমন বিশ্বাস আজও বুকের মধ্যে বহন করেন কনকপ্রভা। কিন্তু তাতে করে কনকপ্রভার আক্ষেপের তিলমাত্র লাঘব হয় নি। যতই প্রিয়ব্রত সিংহগড় থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, ততই কনকপ্রভা জ্বলতে থেকেছেন ধিকিধিকি। তুষের আগুনে নিঃশব্দে পুড়তে থেকেছেন তিনি, সকলের অগোচরে। এবং একসময় তাঁর মনের মধ্যে এমন বিশ্বাসই গাঢ়তর হয়েছে যে সবদিক থেকে তাঁর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ অতুল বৈভবের মধ্যে তার দম আটকে এসেছে। সিংহগড়ের যাবতীয় বৈভবের প্রতি তাঁর সৃষ্টি হয়েছে তিলতিল ঘৃণা। তাঁর মনে হয়েছে, এর চেয়ে কোনও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সুদর্শন সুঠাম ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলে তিনি ঢের বেশি সুখী হতেন। এমন ঈশ্বরদত্ত রূপ-যৌবন বৈভবের তলায় চাপা পড়ে নিরন্তর কাঁদত না। সারাদিন ঘর-গেরস্থালির কাজকর্ম পরিশ্রমের পর একটি যুবক শরীরের মধ্যে প্রতিরাতেই আশ্রয় পেতেন তিনি। সারাক্ষণ এক জোড়া তৃষাতুর চোখের মণি তাঁর সর্বাঙ্গ লেহন করত। সেই লেহনের রোমাঞ্চকর অনুভূতি আজীবনকাল কল্পনায় অনুভব করেছেন কনকপ্রভা। তাঁর পক্ষে শুধু কল্পনায় অনুভব করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। ইদানীং কনকপ্রভার বারংবার মনে হয়, কেবলমাত্র অতুল বৈভবের বিনিময়ে তাঁর সারাজীবনটাকে কিনে নিয়েছে সিংহগড়। চড়া মূল্যে কিনে নেওয়া সামগ্রী যেমন সযত্নে রেখে দেওয়া হয় বাহারি সিন্দুকে, কনকপ্রভাকেও মধ্যবিত্ত সংসার থেকে কিনে এনে রেখে দেওয়া হয়েছে সিংহগড়ের সিন্দুকে।

যখন প্রথম সন্তান এল কনকপ্রভার গর্ভে, যখন কুন্তীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এগিয়ে এল, সব নারীর মতো কনকপ্রভার বুক জুড়েও সারাক্ষণ টনটনানি ব্যথা, প্রিয়ব্রতর সান্নিধ্য কামনায়। পবন শিকারিকে দিয়ে কতবার খবর পাঠিয়েছেন তিনি প্রিয়ব্রতর কাছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছেন, খবর পেয়ে প্রিয়ব্রত আসবে। দোতলার জাফরি লাগানো বারান্দা থেকে সিংহগড়ের সিং-দরজার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতদিন কনকপ্রভার চোখ দুটি অজান্তে ভরে গেছে জলে। কতবার মধ্যরাতে কার যেন পায়ের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছেন বিছানায়। কিন্তু প্রিয়ব্রত আসেননি। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা,

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে পুনরায় পরের সকাল, এইভাবে, দিন কেটে গেছে, রাত কেটে গেছে, মাস, বছর.....প্রিয়ব্রত আসেননি। ধীরে ধীরে তিল তিল শুকিয়ে গিয়েছে বুকের যাবতীয় উচ্ছ্বাস। একদিন যাবতীয় অভিমানও। কনকপ্রভা একটু একটু করে পাথর হতে শুরু করেছেন।

আজ আর কনকপ্রভার দেহে, মনে যৌবনের সে উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু একদিন এমন ছিল, যখন তাঁর শরীর, মন, সদাসর্বদা একটি যুবক শরীরের জন্য লালায়িত হয়ে থাকত। তখন শরীরের কোষে-কোষে সারাক্ষণ এক অস্থির বাজনা বেজে যেত দ্রুত লয়ে। ঋতুভেদে সে বাজনার তাল বদল হত অবিরাম। তখন কায়মনোবাক্যে প্রিয়ব্রতকে কামনা করে গেছেন তিনি দিনের পর দিন। বৈশাখে নিদারুণ দাবদাহের পর সন্ধ্যা নামত। সিংহগড়ের তেতলার ছাদে হাওয়া বইত ঘুমপাড়ানি। আষাঢ়-শ্রাবণে পাকা জামের মতো মেঘ জমত আকাশে। বকের দল সারবন্দী মিছিল বানিয়ে উড়ে যেত কালোবরণ মেঘের চাঁদোয়ার তলা দিয়ে। শরতে-হেমন্তে শিউলি আর কাশফুল ফুটত। পুজোর ঢাক বাজত চড়বড়িয়ে। শীতের রাতে পর্যাপ্ত ওম্ চাইত শরীর। বসন্তে শালকাঁকির ডাঙায় বিশাল কৃষ্ণচূড়ার শরীরখানা আগুনের মতো জ্বলত। এরা সবাই মিলে কনকপ্রভাকে প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিত প্রিয়ব্রতর কথা। কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলতে পারতেন না কনকপ্রভা। শরীরে, মনে, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতেন নিঃশব্দে। সিংহগড়ের দাসী-বাঁদিরা কনকপ্রভার বুকের মধ্যেকার সেই দহনের খোঁজ রাখত। খুবই করুণার চোখে তাকাত ওরা কনকপ্রভার দিকে। সিংহগড়ের একমাত্র বধূকে সহানুভূতি জানাবার মতো দুঃসাহসও দেখিয়ে বসত ওরা। কনকপ্রভাকে সেই সহানুভূতিও নিঃশব্দে হজম করতে হত।

প্রিয়ব্রত যে চিরকালের মতো সিংহগড় ছেড়েছিলেন তা নয়। ন'মাসে ছ'মাসে এক আধবার আচমকা এসে পড়তেন তিনি। দু'চারদিন থাকতেনও। কিন্তু কনকপ্রভার সান্নিধ্যে বড় বেশি আসতেন না। সারাদিন, এমন কি গভীর রাত অবধি সদর মহলে এলাকার বাউরি, বাগদি, শিকারি, লোহারদের সঙ্গে কেটে যেত তাঁর। কনকপ্রভাও শেষের দিকে আর কায়মনোবাক্যে তাঁর সান্নিধ্য কামনা করতেন না। তাঁর মধ্যে আগাম এসে গিয়েছিল বৈধব্যের শীতলতা ও নিরাসক্তি। খুব ছেলেবেলায় বাবা জ্যোতিষী ডাকিয়ে কনকপ্রভার করকোষ্ঠী গণনা করিয়েছিলেন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যতবাণী ছিল, কনকপ্রভার ললাটে বাল-বৈধব্যের যোগ রয়েছে। কনকপ্রভাকে কোনদিনও সে কথা প্রকাশ করে বলে নি কেউ। প্রিয়ব্রতর মৃত্যু হল যখন, কনকপ্রভার বয়স তখন তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। বাল-বৈধব্য বলে না একে। তবে একদিক থেকে দেখতে গেলে কনকপ্রভার ক্ষেত্রে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী মিলে গিয়েছিল। কারণ, প্রিয়ব্রতর জাগতিক মৃত্যুর অনেক আগেই কনকপ্রভার দৃষ্টিতে মৃত্যু ঘটেছিল তাঁর। একেবারে আকাট যৌবনেই কনকপ্রভা বুকের মধ্যে একটু একটু করে পেতে শুরু করেছিলেন বৈধব্যের স্বাদ। শরীরে থান-কাপড় জড়াবার অনেক আগেই তিনি মনের শরীরে থানকাপড় জড়িয়ে নিয়েছিলেন। সধবা রমণীর সিঁদুরের টিপখানি তো কেবল তার কপালের মধ্যিখানেই শোভা পায় না, বুকের মধ্যে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে তা। কনকপ্রভা বুকের মধ্যেকার টিপখানিকে মুছে ফেলেছিলেন অনেক আগে।

কঠিন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে একদিন লাবণ্য চলে গেলেন। কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে সিংহগড়ে ফিরে এলেন প্রিয়ব্রত। তিনিও একদিন সবার অগোচরে সিংহগড় ছেড়ে গেলেন। এবং কনকপ্রভা একদিন কিশোরী কুন্তীকে নিয়ে জগৎ-সংসারে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন।

সেই কিশোরী কুন্তী আজ যুবতী। তাকে নিয়ে অহরহ এক ধরনের আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা কনকপ্রভার মনে। ইদানীং সেটা বেড়ে গেছে অনেকগুণ। পিতৃসান্নিধ্য পায়নি কুন্তী। তাই নিয়ে তার মনের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা ও হীনমন্যতা রয়েছে বলে মনে হয় কনকপ্রভার। একটু বেশি পরিমাণে জেদী আর অভিমানী মেয়ে। বাস্তবজ্ঞানও নিতান্তই কম। সহসা কুন্তীর মুখখানা ভেসে ওঠে। কনকপ্রভার মনে পড়ে যায় অনেকক্ষণ যাবৎ কুন্তী গরুর গাড়ির মধ্যে একাকিনী রয়েছে। দ্বারকেশ্বরের পাড়ে এই যে আচমকা নেমে পড়লেন কনকপ্রভা, দ'য়ের পাড়ে বসে রইলেন নদীর দিকে তাকিয়ে, তার পেছনে দুটি কারণ বিদ্যমান। ইদানীং মজে আসা দ্বারকেশ্বরের দু'পাড়ের ধু-ধু বালির চর দেখতে দেখতে তাঁর নিজের ছবি ফুটে ওঠে। বিশেষ করে মূলনদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বরের দ'খানির মধ্যে তিনি অবিকল নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজে পান। এবং দুই, আজকের এই নিঃসঙ্গ সফরে কুন্তীকে নিয়ে তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে সিংহগড়ে ফিরতে চান না। সন্ধের অন্ধকারে ঢেকে নিতে চান নিজের ও কুন্তীর শরীর।

৬. গাঁয়ের মান রাখে অবোধ বৃক্ষ

চাঁদিফাটা রোদ্দুরে শয়ে শয়ে কোদাল চলছে। শয়ে শয়ে কামিন ঝুড়ি ভরতি সে মাটি বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে রাস্তার ওপর।

ঘাম ঝরছে। মাথা ঘুরছে। কলিজা শুকিয়ে কাঠ।

পাথরবেট্যা থেকে কাজিপুকুর অবধি মাইলটাক রাস্তা দু'দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। নচেৎ দেশের বদলাম, দশের বদলাম, সারা লায়েকবাঁধ ইউনিয়নের বদলাম। বিডিও সাহেব এই প্রথম আসছেন কাজিপুকুর গাঁয়ে। জীপে আসবেন। বিষ্টুপুর থেকে পাথরবেট্যা পর্যন্ত রাস্তাটা মোটামুটি ভালই। হেলে দুলে এগোবে জীপ। কিন্তু পাথরবেট্যা থেকে কাজিপুকুর অবধি একেবারে শোচনীয় অবস্থা। পুরো পথটাই ভাঙাচোরা, খানাখন্দে বোঝাই। মাঝখানে একজায়গায় অনেকখানি কাটা। এতদিন কেউ গা করেনি। কাজিপুকুরে কে কবে জীপ নিয়ে এসেছে যে রাস্তাঘাট সারাতে হবে। কাটা জায়গাটাতে বর্ষাকালে জল জমত। সে সময়টা মানুষ কোমরজলে হেঁটে পার হত। একখানা গামছা নিয়ে রওনা হত সবাই। জলা জায়গাটিতে পৌঁছেই কাপড় খুলে গামছা পরে নিত। ওপারে গিয়ে আবার কাপড় পরে নেওয়া। বাবুভায়াদের বাড়ির মানুষজন, বউ-ঝি, গিন্নিবান্নিরা যেত পাল্কিতে, ডুলিতে। আর বাউরি-বাগদিরা? ওদের ওসবের বালাই নেই। কোমরের তলায় যেখানে ওদের দুটো করে পা গজিয়েছে, শুধু সেই থানটুকু ঢাকা দিতে পারলেই হল। অবশিষ্ট পুরো শরীরখানা তো উদোমই থাকে বছরের দশ মাস। ওদের কাছে জলও যা, ডাঙাও তাই।

হরবল্লভ সিংহবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হলেও তাঁকে কদাচ পাথরবেট্যা কিংবা

কাজিপুকুর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় না। তিনি যাতায়াত করেন জয়রামপুর, রাধানগর দিয়ে। পাথরবেট্যার মানুষ তাই দীর্ঘকাল যাবৎ বোঝাতেই পারেনি, রাস্তাটির দুরবস্থা ঐ এলাকার মানুষদের কী পরিমাণ দুর্গতির মধ্যে ফেলেছে। নেহাতই দুটো গাঁয়েই বাউরি-বাগদিদের বসবাস বলে ওই রাস্তাটাকে সারানোর কথাটা ভুলেই গিয়েছেন বাবুরা। সেই রাস্তাটাই আজ এতদিন বাদে আচমকা বেজায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দু'দিনের মধ্যে ওটাকে জীপ চলাচলের উপযুক্ত করে তুলতেই হবে। কারণ, স্বয়ং বিডিও সাহেব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণে কাজিপুকুর গাঁয়ে যেতে চেয়েছেন।

দিন সাতেক আগে হরবল্লভের গোমস্তা রতিকান্ত গোস্বামী এসেছিল কাজিপুকুর গাঁয়ে। গাঁয়ের মোড়ল পতিত বাউরির নামে একখানা চিঠি বয়ে এনেছিল সে। পতিত বাউরির তো চিঠি পড়বার ক্ষমতা নেই, রতিকান্তই যোলআনার সুমুখে পড়ে দিয়েছিল সেই চিঠি, প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার মর্ম। বিডিও সাহেব আর ক'দিন বাদে যাচ্ছেন কাজিপুকুর গাঁয়ে। যেভাবেই হোক, তাব মধ্যে পাথরব্যেটা থেকে কাজিপুকুর অবধি রাস্তাটাকে জীপ চলাচলের উপযুক্ত কবে তুলতেই হবে। শুনে টুনে তো কাজিপুকুরের মানুষ থ। বিডো সাহেব আসবেন এই গাঁয়ে! অত ভাগ্য হবে কাজিপুকুরেব! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে সবাই।

এ অবস্থায় বেশিক্ষণ দোলাও চলে না। সময় মাত্র ক'দিন। এতখানি রাস্তার খানাখন্দ বোজানো। তাঁতিগেড়িয়ার কাছে ঐ বিশাল কাটা জায়গাটাকে মাটি ফেলে ফেলে সমান করা.. । লক্ষ্মণের শক্তিশেলে হনুমানের একরাতের মধ্যে উড়ে গিয়ে গন্ধমাদন বয়ে আনার চেয়েও কঠিন এই কাজ। তবে করতেই হবে। যে কোনও গতিকে। লচেৎ বিডো সাহেবের জীপ সেই পাথরবেটিয়ায় পড়ে থাকবে। এই এতখানি পথ সাহেবকে পদব্রজেই আসতে হবে। এমন আসায় লাভ কি কাজিপুকুরের! জীপখানাই যদি পড়ে রইল গ্রাম থেকে দু'মাইল তফাতে তাহলে আর লাভ কি। গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে সরকারি মোটর ধুলোর কুণ্ডলি তুলে গাঁয়ে ঢুকবে, গাঁয়ের কাচ্চা-বাচ্চা পিলপিল দৌড়ুতে থাকবে পেছনে পেছনে, ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে বউ-ঝিরা ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ডাগর চোখে দেখতে থাকবে, গাঁয়ের বা জামতলায় এসে থামবে জীপ, আর তার থেকে নামবেন স্বয়ং বিডোসাহেব, নেমেই চারপাশে একটি বার নজর বুলিয়ে বলবেন, এই তবে কাজিপুকুর? মোড়ল পতিত বাউরি খুব গদগদ হয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে সাহেবের সুমুখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলবে আপনি আইলেন হুজুর, আমাদের এই কাঁজিপুকুর গাঁ এ্যাদ্দিনে ধর্ন হইল্যাক।

মূলত এসব কথা ভাবছিল পতিত বাউরি স্বয়ং। কাজিপুকুর গাঁয়ের মোড়ল হয়েও এ্যাদ্দিন কোনও রাজপুরুষের সুমুখে গ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ আসেনি তার জীবনে। খুব দেমাকি গলায় বলে, দু'দিনের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করবেক কাজিপুকুরের মানুষ। অমন সুবন্য-সুযুগ কোউ ছাড়ে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবার মতনই হবেক তা'লে ব্যাপারখান। গ্রামবাসী তৎক্ষণাৎ সায় দেয় পতিত বাউরির কথায়। বটে ত। যদিও কেন এটা অতখানি 'সুবন্য-সুযুগ', কাজিপুকুরের কী ভাল হবে তাতে, এ বিষয়ে তেমন কোনও স্পষ্ট ধারণা কারোরই নেই। গুনগুনিয়ে কথা চলে নিজেদের মধ্যে। কেউ কেউ এ বিষয়ে তাদের

অজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করে ফেলায় অন্য কিছু মানুষ, যারা নিজেদেব ওয়াকিবহাল মনে করে, ওদের ওপর বাঘের ঝাপট নেয়। বলে, তুয়ারা সব কুঁয়ার ব্যাঙ, কাজিপুকুরের বাইরে ত াস নাই কুনোদিনো, বুঝবি কী কইর্যে কত ধানে কত চাল! অত বড় মনিষ্যি, ইচ্ছা কইর্‌লে তে কিছু কইর্যে দিতে পারেন। উঁযাদ্যার অসাধ্যি কী আছে? শুধু ইচ্ছাটা কইর্‌লেই পাথরে াঁচ কিল।

কিন্তু অতখানি রাস্তা যে সারানো হবেক, মাত্তর দু'দিনের মধ্যে, টাকা দিবেক কে? সবকার কি টাকা মঞ্জুর করবেক এ বাবদ?

—সরকার? রতিকান্তকে এবার হাসতেই হয়। সরকার মঞ্জুর করবেক টাকা? শালা, এই া হইলে বাউরিদের বুদ্ধি! বিডো সাহেব নিজে খরচা কইর্যে রাস্তা বানিয়ে তুয়াদ্যার গাঁয়ে াইবেক তুয়াদ্যার ভাল কইর্‌তে! তাহলে, এটাও বল্, উঁয়ার খাতিরযত্ন, খানাপিনাব খরচও ঁয়াকেই দিতে হবেক।

সবাই নিদারুণ লজ্জা পায়। অকাট্য যুক্তি দিয়েছে রতিকান্ত। বিডিও সাহেব যে এ গাঁয়ে ায়েব ধুলো দিতে চেয়েছেন, এই তো ঢের। এখন পথঘাট বানিয়ে তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে াগত জানানোটা তো গ্রামবাসীরই কাজ। চাবপাশের দু'দশ গাঁয়ের মধ্যে কাজিপুকুরের মান ড়তে চলেছে, এ কি কম কথা! কোন্ উজবুক খরচের কথাটা তুলল্যাক হে! বাউরি-জাতের লঙ্কটি কে? শালা, বিডো সাহেবের মাহিত্য তুই কী বুঝবি রে, গাঁড়োল!

এই পুরো প্রসঙ্গে হরবল্লভ প্রায় অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছেন দেখে রতিকান্ত এবাব ালোচনার খাত অন্যদিকে বহাবাব চেষ্টা করে। বলে, শুধু সিট্যাই লয়, আমাদ্যার পিসিডেন-বু কত কষ্টে, কত সাধ্য-সাধনা কইর্যে সাহেবকে রাজি করিয়েছেন, শুধু তুমাদ্যার মু চেয়ে। খন যদি বিডো সাহেবকে রাস্তার কারণে না আনা যায় তো উয়াঁর মুখখানাও ত পুইড়্বেক, কী? আর জন্মেও কাজিপুকুর গাঁয়ের মুখদর্শন কইর্‌বেন উনি? এমন অশুভ সম্ভাবনার াশঙ্কায় নিমেষে শুকিযে আসে বাউবি-সমাজের প্রবীণ মুখগুলি। পিসিডেনবাবু রাগ কবে ার জন্মেও এ গাঁয়ে না এলে ঠিক কী ক্ষতিখান হবেক, সেটা কেউই তেমন সঠিকভাবে ন্দাজ করতে পারে না বটে, এবং যেহেতু অচেনা জলকেই বেশি ভয় পায় মানুষ, সেই রণেই কাজিপুকুরের মুরুব্বিদের মুখমণ্ডলে আশঙ্কাটা দ্বিগুণ গাঢ় হয়। বাপ্‌রে, সে না জানি য়ের কত ক্ষতি!

পতিত বাউরি আর দোনোমনো ভাবখানাকে বাড়তে দিতে মোটেই রাজি নয়। সে সহসা ত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, খামোখা কথা কেইচ্যে লাভ কি? রাস্তা আমরাই সারাব। জিপুকুরের মানুয মইর্যে যায় নি হে। গাঁ'র সন্মানটাই বড় কথা। কথাগুলো একেবারে কর কাছে গিয়ে বাজে। ফলে পরদিন অলির ভোর থেকে শুরু হয় মাটি কাটার কাজ। য় শয়ে উদোম মানুষ ঘাম ঝরিয়ে কোদাল-গাঁইতি চালাতে থাকে রুক্ষু ডাঙায়। টাঁড় টিতে ঠ্যাং-ঠ্যাং আওয়াজ ওঠে। আগুনের ঝিলিক মারে কোদাল-গাঁইতির ডগায়। পতিত উরি ছাতা মাথায় তদারকি চালায় ঘুরে ঘুরে।

সব তো হল, কিন্তু হঠাৎ বিডো সাহেবের পায়ের ধুলো দেবার হেতুটি কি? কাজিপুকুর য়ে এ যাবৎ সরকারি লোক বলতে এসেছে অভিরাম চৌকিদার। পিসিডেনবাবুর হুকুমে

একে ওকে তলব করতেই আসে সে। মাঝে মাঝে, এলাকায় চুরি-চামারি হলে, তখন বিষ্টুপুর থেকে খাঁকি পোশাকের সিপাই আসে। পলকের মধ্যে বাড়ির বউ-ঝি, ছা-ছাওয়াল ঝুপড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে যায়, ঠিক যেমন করে ইঁদুর ঢুকে পড়ে গর্তে। ওরা গটমটিয়ে আসে, একে ওকে ধমকচমক দেয়। হুংকার ছাড়ে ঘনঘন। এর-ওর ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে তছনছ করে সবকিছু। বাছা বাছা জনাকয়কে ধরে, কোমরে রশি বেঁধে রওনা দেয়, বিষ্টুপুরের দিকে। যাওয়ার সময় খুশি মতো নিয়ে যায় মুরগি-খাঁড়া, মুরগির ডিম, গাছের ফল-ফুলারি। একবার মেজোবাবুর আসবার কথা ছিল গাঁয়ে। শেষ অবধি এসে উঠতে পারেন নি। এই হল আজ তক্ক কাজিপুকুর গাঁয়ে রাজপুরুষদের আগমনের খতিয়ান। এ হেন অভাগা গাঁয়ে আচমকা বিডো সাহেবের আগমন ঘটছে কিসের কারণে?

কারণ তো একটা আছেই।

কাজিপুকুরের নিমঝুড়ি দীঘির ঈশান কোণে যে প্রাচীন নিমগাছটা রয়েছে তাতে ফি বছর গ্রীষ্মের মরসুমে রস বেরোয়। গাছের গুঁড়িতে একটা আদ্যিকালের কোটর। ঐ কোটরের মুখ দিয়ে অবিরল ধারায় গড়িয়ে আসে রস। চারপাশের জমিন ভিজে যায়, আর সেই ভিজে জমিতে কালো হয়ে চাক বেঁধে থাকে লাখে লাখে কালো বিষ-পিঁপড়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। নিমের রস যে হালকুচ তেতো সেটা কে না জানে। পিঁপড়ের তো তার চক্ষু সীমায় আসার কথা নয়। নেহাতই কৌতূহল বশে এক-আধজন সাহসে ভর করে চেখে দেখে সেই রস, এবং মুহূর্তে তাদের দু'চোখ বিস্ময়ে আকাশে উঠে যায়। তেতো তো নয়ই, বরং এ রস চিনির পানার মতো মিষ্টি। এ কি আচানক কথা! নিমের রস মিষ্টি! কথাটা নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। সারা বাউরিপাড়া হাজির হয় নিমগাছের তলায়। একে একে চেখে দেখে। চারপাশের গাঁগুলো থেকেও পিলপিল করে ছুটে আসে মানুষ। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায় চতুর্দিকে। এবং অজ গাঁয়ের প্রাচীন নিমগাছটি দু'দিনেই দেবত্বের গৌরব লাভ করে। এক সময় হরবল্লভ সিংহবাবুর কানেও আসে কথাটা।

হপ্তাটাক আগে হরবল্লভের কাচারিতে বসে বিডিও সাহেব শুনলেন কথাটা। শুনে ভারি কৌতূহল জেগেছে তাঁর মনে। গাছটাকে সচক্ষে দেখতে চেয়েছেন তিনি। এ খবর কাজিপুকুরের বাউরিদের কানে আসা মাত্তরই তাদের বুকগুলি দেমাকে ফাটো ফাটো। নিমঝুড়ি পুকুরের পাড়ের বুড়ো নিমগাছ এবার বিখ্যাত হতে চলেছে। স্বয়ং বিডো সাহেব দেখতে আসছেন ওকে। ক্রমে ক্রমে আরও কত সাহেব আসবেন। সারা গাঁয়ের মান বাড়াল কিনা একটা অবোধ বৃক্ষ!

৭. দহন শেষের বর্ষণ

গতকাল থেকে নিশান বাউরি প্রবল জ্বরে বেঁহুশ।

ঝুঁঝকা ভোরে বিছানা ছেড়েই রাধানগরের দিকে পা বাড়িয়েছিল অগ্নি। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। অনাথ ডাক্তারের কাছ থেকে গোটাকয় পুরিয়া আনা এবং পরীক্ষিত বাউরির তত্ত্বতালাশ করা। অনাথবাবু ইদানীং হোমিওপ্যাথি করেন। রাধানগরে একটা ঘর নিয়ে ডিসপেনসারি খুলেছেন। সারাক্ষণ তাঁর ডিসপেনসারি গরীব-গুরবোতে ভরে থাকে। গরীবদের কাছ থেকে

কোনও ফি নেন না অনাথ ডাক্তার। এমন কি ওষুধের দামও নয়। তা বাদে, অগ্নি ভেবেছিল, পরীক্ষিত বাউরির খোঁজখবর ওঁর কাছেই পাওয়া যেতে পারে। ইদানীং অনাথ ডাক্তারেব সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে পরীক্ষিতের। যেটুকু সময় এতদঞ্চলে থাকে, অধিকাংশ সময় কাটায় অনাথের বাড়িতে কিংবা ডিসপেনসারি-ঘরে। দেশের সম্পর্কে নানাবিধ কথা শোনান অনাথ ডাক্তার। স্বদেশী আন্দোলনের অনেক অজানা কাহিনী তুলে আনেন স্মৃতি থেকে। দেশভাগ ও স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনেকের কাছে যদিও সে সব কথা তেতো লাগে, পরীক্ষিত খুব মনোযোগ সহকারে শোনে। অগ্নির ধারণা, অনাথ ডাক্তারের মুখ থেকে পুরোনো দিনের কথাকাহিনী শুনতে শুনতে পরীক্ষিত তার পুরোনো দিনগুলোকে নতুন করে ফিরে পায়। আজ মাসটাক হল ঘরে আসেনি পরীক্ষিত। ইদানীং বুকে এক ধরনের ব্যথা হয় তার। খুলে বলতে চায় না কিছু, কিন্তু অগ্নিকে লুকোতে পারে না। মাঝে মাঝে ব্যথাটা বাড়ে। বুকের ব্যথাখানা নিয়েই এবারে ঘর ছেড়েছিল পরীক্ষিত। তারপর থেকে ওর কোনও খোঁজই পায়নি অগ্নি। এমনিতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে অগ্নির। পরীক্ষিতের অভাব সে বড় একটা বোধ করে না ইদানীং। কিন্তু নিশানের প্রবল অসুখই তাকে কিঞ্চিৎ চিন্তায় ফেলেছে। কেন জানি ওর মন বলছে, নিশানের শেষ সময় উপস্থিত। এবং সত্যিই যদি তাই হয়, তবে এই মুহূর্তে সে মনে মনে বড়ই খুঁজছে পরীক্ষিতকে।

অনাথ ডাক্তারের ওষুধঘরে পরীক্ষিতের কোনও খোঁজ পায়নি অগ্নি। ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে। গোবাচাঁদটাও ঘরে নেই। সে রয়েছে শালতোড়ার বোর্ডিং-এ। তিলকটা থাকলেও, অগ্নিকে এই সাতসকালে ডাক্তারের পাশ দৌড়ে আসতে হত না। অগ্নি বললে সে না করে না কোনও কথায়। অগ্নির কাজ করে দেবার জন্য সে একপায়ে খাড়া। কিন্তু সেও তো আজ ক'দিন ঘরে নেই। চোর-পুলুশ খেলা করছে ওরা। সামনের সেটেলমেন্টে যাতে সমস্ত বর্গাদার বর্গা রেকর্ড করায়, যাতে এলাকার জোতদারদের বেনামী জমিনগুলো ধরা যায়, তার জন্য সুকুমারের দল রাতের আঁধারে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করে বেড়াচ্ছে। তিলক যে ইদানীং কখন ঘরে ঢোকে, কখন বেরিয়ে যায়, ভগবানকে মালুম।

চুয়ামসিনায় সেটেলমেন্ট ক্যাম্প বসবে। খানাপুরী ভুজারত। মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে সরজমিনে দেখা হবে একটি একটি করে সবগুলি প্লট। মালিকেরা যে যার কাগজপত্তর নিয়ে উপস্থিত থাকবে মাঠে মাঠে। সাহেবদের দেখাবে। সাহেবরা কাগজপত্তর ছাড়াও সাক্ষী-সাবুদ নেবেন। তারপর মালিকের নামে রেকর্ড করবেন সে জমিন। শুধু মালিকের নামই থাকবে না সে রেকর্ডে, যে দখলে আছে, যে বর্গাচাষ করে, তাদের নামও থাকবে।

বিষ্টুপুর থেকে ফিরে এসেই হরবল্লভ রতিকান্তর মাধ্যমে চারপাশের গাঁয়ের অনুগত ও বিশ্বাসী জোতদারদের তলব করলেন। জলদি আসো সবাই, শিয়রে শমন।

হরবল্লভের বাবা প্রতাপলাল ছিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে ধুরন্ধর ব্যক্তি। আসল কাজখানা করে রেখে গেছেন তিনিই। সরকারি সিলিং মতে যেটুকু কৃষি-অকৃষি পুকুর-বাগিচা রাখা চলে তাতো রেখেছেনই, তা বাদে, এলাকার যত মুনিশ-মাইন্দার, অনুগত-বশংবদ মানুষ সবাইয়ের নামে জমি রেখে গেছেন প্রচুর। জমিদারি আমলের চেক পেছনের তারিখে কেটে কেটে তাবৎ জমি তাদের নামে বন্দোবস্ত করে গেছেন। যদিও ঐ মানুষগুলো তার বিন্দু-বিসর্গ

জানে না। যা কিছু হয়েছে, সবই কাগজে-কলমে, আর কাগজপত্তরগুলো রয়েছে সিংহগড়েই। এছাড়া সিংহগড়ের দুটি মন্দিরে জড়ো হয়েছে ডজন দুয়েক পাথর-মূর্তি। তাদের নামেও বিস্তর জমি রেখে দিয়েছেন দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে, এবং সিংহবাবুরা হয়েছেন তাদের সেবাইত। প্রচুর শোল, কানালি জমিকে বর্ষাকালে জল জমিয়ে রেখে পুকুর কিংবা টক কুলের গাছ লাগিয়ে বাগিচা হিসেবে দেখিয়েছেন। কাগজপত্তর সব পাকা। কোনও খুঁত নেই সেখানে। তবুও হরবল্লভের মন থেকে আশঙ্কা যায় না। আশঙ্কার কারণও ঘটেছে ইদানীং। বিভিন্ন কারণে হরবল্লভের কেন জানি প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল এবারের সেটেলমেন্ট পর্বটা নিরুপদ্রবে কাটবে না।

প্রথম কারণ, সুকুমার আচার্য। ইতিমধ্যেই সে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং চালিয়ে যাচ্ছে গোপনে। বাউরি-বাগদিদের মধ্যে সে এটাই প্রচার করে চলেছে যে, সরকারি মতে যদি পরিবার পিছু পঁচিশ একর কৃষি-জমি এবং পনের একর অকৃষি জমি রাখা চলে তো, হরবল্লভের পরিবারে কৃষি ও অকৃষি মিলিয়ে কয়েক হাজার বিঘা জমিন কী করে রয়েছে। কী রহস্য এর পেছনে? নির্ঘাৎ সিলিং-এর বাইরে আরও বহুৎ জমিন বেনামে রেখেছে সিংহবাবুরা। কেমন করে রেখেছে, কী সেই কৌশল, সেটাই খুঁজে বের করতে চাইছে সুকুমারের দল। হরবল্লভের কাছে খবর আছে, এর মধ্যেই দু'তিনবার সে গিয়েছিল বিষ্টুপুর সেটেলমেন্ট অফিসে। সিংহবাবুরা 'বি' ফর্মে কোন্ কোন্ জমি ছেড়েছে, কোন্ কোন্ জমি নিজের মালিকানায় রেখেছে, তার তালিকাটা দেখতে চেয়েছিল সেখানে। সিনিয়র রেভিনিউ অফিসার হরিসাধন বটব্যালের কানে কথাটা পৌঁছানো মাত্তর তিনি যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে রেখে দিয়েছেন নিজস্ব হেফাজতে। সুকুমার তাও হাল ছাড়েনি। নানাভাবে সে সুড়ুক-সন্ধান নেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হরবল্লভের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। যদিও হরিসাধনবাবু অমায়িক ভদ্রলোক, হরবল্লভদের শুভাকাঙ্খী, তবুও তাঁরও তো চাকরি বলে কথা। একেবারে তো পুবকে পশ্চিমে বানিয়ে দিতে পারেন না তিনি।

সিংহগড়ের বৈঠকখানায় ঢালাও শতরঞ্চির ওপর বসে এসব কথাই আলোচনা করছিল মহাদেব কয়াল, ঝাড়েশ্বর নায়েকের দল। এরা প্রত্যেকেই সিলিং ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু জমি বেনামে রেখেছে। কাজেই সবাইয়েরই একই জায়গায় ব্যথা। এ ব্যাপারে সবাই আকুল নয়নে তাকিয়ে রয়েছে হরবল্লভের দিকে। তিনিই উপায় স্থির করবেন, কারণ সকলের মাথার উপর তো তিনিই।

হরবল্লভ গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। সকলের এলোমেলো আলোচনা অর্ধেক শুনছিলেন অর্ধেক শুনছিলেন না। উপস্থিত সবাই জানে, তারা নিজেদের মধ্যে বসে বসে কথা কাচছে বটে, তবে এ সবের কোনও মূল্য নেই। আসল কথাটি অবশেষে বেরোবে হরবল্লভের মাথা থেকেই। এলোমেলো কথা কাচতে কাচতে সেটার জন্যই অপেক্ষা করে থাকা।

এক সময় মুখ খোলেন হরবল্লভ। বলেন, শোন, কিছুদিনের মধ্যেই হরিসাধনবাবু লোক লস্কর লিয়ে পৌঁছাবেক। সিংহগড়েই উঁয়াদ্যার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাতির-যত্নের

কোনও ত্রুটি হবেক নাই। নগদে যা দিবার, দিবা হবেক। কিন্তু বিপদ আসতে পাবে অন্যদিক থিক্যে। তুমাদ্যার সামাল দিতে হব্যেক। হরবল্লভ গলাটি সামান্য ঝেড়ে নেন। তারপর বলেন, সুকুমার আচার্য যেমন করে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে, যেভাবে মিটিং কচ্ছে রোজ রাত্তিরে, সেটাই ভাবনার কথা। শেষমেষ বাউরি-বাগদিদের একত্র করে সে না এক কাণ্ড ঘটাই বসে।

—থানাকে বলে শালাকে ভাল কইর‍্যে ওষুধটা দিবার ব্যবস্থা করুন না। শালার বড্ড বাড় বেড়্যেছে।

হরবল্লভ এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হন। বলেন, উয়ার তরে জব্বর ওষুধ ঘুঁটা চইল্ছে। সিট্যা তুমাদ্যার্কে ভাবতে হবেক নাই। তুমরা লিজেদ্যার কাজটা কর দেখি ঠিকঠিক। পাড়ায় পাড়ায় উসব মিটিং বন্ধ কর।

ঝাড়েশ্বররা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মিটিং কী কইর‍্যে বন্ধ কইর্ব আমরা?

—আহ্, মিটিং ক্যানে বন্ধ কইর্তে যাবে? তুমরা শুধু দেইখ্বে, যাতে সুকুমারের মিটিং-এ একটি লোকও না যায়। লোক না হইলে শালা মিটিং কইর্বে কাকে লিয়ে? কথা শুনাবার তরে লোক চাই তো।

এ কথাও মাথায় ঢোকে না ঝাড়েশ্বরদের। আমাদ্যার কথায় উয়াবা মিটিং যাওয়া বন্ধ কইর্বেক?

—ক্যানে কইর্বেক নাই? আলবৎ কইর্বেক। নিজের উরুতে চাপড় মেরে বলে ওঠেন হরবল্লভ, উয়ারা বারোমাস তিরিশ দিন তুমাদ্যার ঘরে পেট পালবেক, তুমাদ্যার জমিনে খাটবেক, তুমাদ্যার থিক্যে দাদন-কর্জ লিব্যাক দুঃসময়ে, আর তুমাদ্যার কথা মানবেক নাই? ঝাড়েশ্বরদের চোখে সরাসরি চোখ রাখেন হরবল্লভ, যারা সুকুমারের মিটিং-এ আনাগোনা কচ্ছে, উই সব লিয়ে লাচালাচি জুড়েছে, উয়াদ্যার দাদন-কর্জ বন্ধ কর, কাজ দিও নাই একবেলার তরেও, হাতের বদলে ভাতে মাইর্লে দুনিয়ার সেরা শয়তানও জব্দ।

গভীর রাতে সেটাই সাব্যস্ত হয়। সুকুমারের চেলাদের ভাতেই মারতে হবে। এছাড়া কোনও পথ নেই।

এলাকার তাবৎ জোতদারকে যথাযথ শলা পরামর্শ জুগিয়ে হরবল্লভ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কম্যুনিস্টরা পাড়ায় পাড়ায় সক্রিয় হচ্ছে। এক্ষুনি ব্যবস্থা না নিলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। ফলে সুকুমারদের ধরবার জন্য পুলিশ বাহিনী রাতের আঁধারে চড়াও হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। কিন্তু সুকুমাররা আগেভাগে কুরিয়ার মারফৎ খবর পেয়ে চলে যাচ্ছে অন্যত্র। পুলিশবাহিনী পাড়ায় ঢুকে দেখছে, ওরা পৌঁছুবার খানিক আগেই পাখি ভাগল্বা। ইদানীং ফি-রাতে সুকুমারদের সঙ্গে পুলিশের চলছে ইদুর-বেড়াল খেলা।

বেড়ার আগড়ের গায়ে হাত ছোঁয়ানোর মুহূর্তে অগ্নির নজর চলে যায় বারান্দায়। দেখে, একজন লোক, অগ্নির দিকে পেছন ফিরে একমনে কথা বলছে ওর পোষা টিয়েটার সঙ্গে। বাঁশের খাঁচাটা দাওয়ায় ঝোলানো। লোকটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে কত কিছু বলে চলেছে পাখিটাকে। সামান্য নজর করতেই অগ্নি দেখে শুধু কথা বলাই নয়, লোকটা বাঁ হাত থেকে খাদ্যশস্যজাতীয় কিছু নিয়ে নিয়ে খাঁচার মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে খাওয়াচ্ছে

পাখিটাকে।

ভ্রূসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে অগ্নির। এই সাতসকালে কে এল ফের। পেছন থেকে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে পাড়ার কেউ নয়। কারণ পাড়ার কেউ এই সাতসকালে হাঁটু অবধি ধুতি আর আধ-ময়লা নীল ছিটের হাফশার্ট পরে আসবে না অগ্নির বাড়িতে। অগ্নি আকাশ পাতাল ভাবতে শুরু করে। মনের মধ্যে শুরু হয় সাত-সতের উবুর-ডুবুর খেলা। আস্তে আস্তে আগড় খোলে অগ্নি। ধীরপায়ে উঠোনে আসে। খুব অনিশ্চিত গলায় বলে ওঠে, কে? কে বটে!

সে কথায় মুখ ফেরায় লোকটি। এবং নিমেষের মধ্যে অগ্নির সারা শরীর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

গজেন।

অগ্নির শরীরে চোখ পড়া মাত্র কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় গজেন। খুব তাড়াতাড়ি, প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওষুধ নিয়ে ফিরেছে, সামান্য হাঁফাচ্ছিল অগ্নি। বুকজোড়া ওঠানামা করছিল তালে তালে। গজেনের দৃষ্টি অগ্নির সারা শরীরের প্রায় সমস্ত পাড়ায় একবার মুগ্ধ-চক্কর মেরে থেমে যায় বুকদুটির ওপর। দু'চোখ থেকে চুইয়ে পড়ে লোভ, গজেন কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না।

একটা তেঁতুল্যা-বিছা, সেই কবে থেকে, আপাদমস্তক শুয়ে ছিল অগ্নির শরীর জুড়ে। সহসা সে ছোবল দিয়েছে ব্রহ্মতালুতে। জ্বলে যাচ্ছে ব্রহ্মতালু। সে জ্বলুনি শরীরের শয়ে শয়ে শিরা-উপশিরা বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে এবং এই মুহূর্তে অগ্নির সারা শরীর এক নীলরঙের বিষের নদী।

থর থর করে কাঁপছিল অগ্নি ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। দু'চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে।

ঠিক তেমনি মুহূর্তে গজেন খুব গদ্গদ ভঙ্গিতে, গলায় মধু মাখিয়ে বলে, তুয়ারা সব কেমন আছুরে?

অগ্নি আর বুঝি নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। গজেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নখে-দাঁতে ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে মন চায়। কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে সে প্রায় ঝড়ের গতিতে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

নিশান বাউরির জ্বরটা সামান্য কমেছে। তবে বড্ড দুর্বল। পেটটা কাল থেকে গরম হয়েছে খুব। অগ্নি ফেরার সময়ে কোঁচড় ভর্তি জলজমানির পাতা এনেছিল। কুঠুরির মধ্যে বসে বসে পাতাগুলোকে চটকাতে থাকে জলে। অল্পক্ষণের মধ্যে জলটা দইয়ের মতো থলথলে হয়ে যায়। অগ্নি ওটার সঙ্গে খানিকটা বনচিনি মেশায়। এগিয়ে দেয় নিশানের দিকে। বলে, জলদি খেইয়েঁ ফেল। লচেৎ জইম্যে কাঠ হয়ে যাবেক। নিশান বাউরি শরবতটা একটু একটু করে খেয়ে ফেলে। প্রায় চিঁ-চিঁ গলায় বলে, পরীক্ষিতের খোঁজ পেইলি?

অগ্নি চমকে ওঠে। দাদু কেমন করে জানল যে ওষুধ আনার পাশাপাশি সে বাপের খোঁজেও গিয়েছিল। অগ্নি তো বলে যায়নি তেমন কথা। নিশানও বলে দেয়নি যাবার কালে। তবে? চমকটা সামলে ওঠে অগ্নি। কাগজের ভাঁজ খুলে এক-পুরিয়া ওষুধ ঢেলে

দেয় নিশানের মুখে। নিশানের ফোকলা মাড়ি, জিভ, তালু, মুর্ধা একত্রিত হয়ে সারা মুখ জুড়ে ঐ টুকুন ওষুধকে নিয়ে হুলুস্থুলু জুড়ে দেয়। অগ্নি খাটো গলায় বলে, কুনো সন্ধান নাই উয়ার। ডাক্তার-কাকাও বইল্‌তে লাইর‌্ল্যাক। উঁয়ার পাশও আসে নাই কত দিন। বলতে বলতে অগ্নির গলাখানি আচমকা ধরে আসে। গলা জুড়ে কচু ডাঁটার স্বাদ। ছেঁড়া শতরঞ্চিখানা দিয়ে নিশানের সারাশরীর আচ্ছা করে মুড়ে দিতে থাকে।

বাইরে খাঁচার মধ্যে পাখিটা ডাকছে। ওর সব ডাকেরই মানে অগ্নি বোঝে। পাখিটা বলছে, বাইরের লোক এসেছে, বাইরের লোক এসেছে। অগ্নি তো সেটা জানেই। লোকটা এসেছে এবং এই মুহূর্তে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে রয়েছে। শরীরের জ্বলুনিটা তিলমাত্র কমে নি অগ্নির। ব্রহ্মতালুর থেকে ভাঁপ উঠছে। কী করা উচিত হবে, বুঝে উঠতে পারে না। কেবল কুঠুরির ভেতর থেকে মুখ-ঝামটা মারে পাখিটাকে। থাম্, থাম্, চিল্লাস নাই। অগ্নি নিশানের পাশটিতে ধপ করে বসে পড়ে।

সম্ভবত গজেনের উপস্থিতিটা টের পায়নি নিশান। পেলে, বলত। সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে দাওয়ায়। অগ্নির জন্যই যে, তাতে কোনও সংশয় নেই। অগ্নির এখন বাইরে বেরোনো দরকার। পাখিটাকে খাওয়াতে হবে। রান্নাঘরে এঁটো বাসনকোসন পড়ে রয়েছে। ডোবায় নিয়ে গিয়ে মাজতে হবে। দুয়োর-ঘরে ঝাঁট দিতে হবে। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। দাদুকে একটু মুড়ি চটকানো জল খাওয়াতে লাগে। কাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। নিজের জন্য একটু কিছু ফোটাতে হবে। কিন্তু লোকটা যদি এমনি কবে দুয়োর জুড়ে খাড়া থাকে...! অগ্নি বসে বসে ভাবতে থাকে...।

খবর পেয়েছিল, আবার বিয়ে করেছে গজেন। একটা না দুটো বাচ্চাও হয়েছে। এক ঝলক ওর দিকে তাকিয়েছিল অগ্নি। তাতেই বুঝেছে, শরীর অনেকখানি ভেঙে গিয়েছে। সারা শরীরে অনিয়ম আর অত্যাচারের ছাপ। এ্যাদ্দিন পরে কোন্ ছলনায় এল, কে জানে। ভাগ্যে পরীক্ষিত বাউরি নেই বাড়িতে। থাকলে, লঙ্কাকাণ্ড হত। গজেনের প্রসঙ্গ উঠলে আজও পরীক্ষিতের ভেতরে কুণ্ডলি পাকানো সাপটা গরগর করে ফণা তোলে। বাগে পেলে যে ওকে শেষ শিক্ষা দিয়ে দেবে পরীক্ষিত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ অগ্নি।

এই একটু আগে ডালে-পালায় রোদ্দুর ছিল, এখন সারা উঠোন ভরে গেছে রোদ্দুরে। অনেক বেলা হল। পাখিটাও তারস্বরে ডেকে চলেছে। এখন তার ডাকখানা অন্য। ক্ষিদে পেয়েছে ওর। চিল্লিয়ে ডেকে চলেছে অগ্নিকে।

অগ্নি উঠে দাঁড়ায়। এক ঝটকায় বেরিয়ে আসে দাওয়ায়। দেখতে পায়, পাখিটার থেকে বেশ খানিকটা তফাতে দেয়ালে পিঠ ঠেসিয়ে বেশ জুত করে বসে রয়েছে গজেন। অগ্নি ওর দিকে তাকায়ও না। সোজা গিয়ে হাজির হয় পাখিটার খাঁচার সামনে। চেরা গলায় ধমক দেয় পাখিটাকে। থাম্, থাম, ক্ষিদায় এক্কেরে মইরে যাচ্ছু নাকি? গতকাল কয়েকটা পাকা বটফল কুড়িয়ে এনেছিল। নারকোলের মালায় ভরে ওগুলো তুলে রেখেছিল কুলুঙ্গিতে। মালাখানি নামিয়ে নিয়ে একখানা বট ফল ধরে দেয় পাখিটার মুখে। আর, সেই মুহূর্তে অনুভব করে, পেছনে বসে উশখুশ করছে গজেন। অগ্নি ফিরেও তাকায় না পেছনে। পাখিটাকে ফল খাওয়াতেই মগ্ন থাকে সে। পাখিটা খেতেই থাকে। খেতেই থাকে। অগ্নি একটু একটু

করে পেছোতে পেছোতে পৌঁছে যায় একটি সন্ধ্যার' দোরগোড়ায়।

যেদিন গজেনের সঙ্গে ওর বিয়ে হল।

নিজের বাড়ি শালকাঁকিতে বিয়ে হয়নি অগ্নির। জাতিচ্যুত হওয়ার কারণে এ তল্লাটের কেউই ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। অগ্নির বিয়ে হয়েছিল রাইপুর থানার ফুলকুসমা গাঁয়ে মেশো শুযেণ বাউরির বাড়িতে। শুযেণের বাড়িতে কিছুদিন ছিল অগ্নি। গজেনের ভারি পছন্দ হয়েছিল অগ্নিকে। মেশো সেই সুযোগটাই নেয়। যদিও অগ্নিরা মল্লব বাউরি আর গজেনরা শিকর‍্যা বাউরি, দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে সাদি হয় না, তবুও গজেন যখন রাজি হল, শুযেণ বাউরি লম্ফ দিয়ে ধরে প্রস্তাবটা। বলে, জাত-ছুটকা ঘরের মেয়া, হয়ত বিয়াটিয়া হবেক নাই কুনোদিন, যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কোউ? ছেইল্যা-পক্ষ যখন রাজি,আমরা ক্যানে ডগ্ ভাইঙ্‌তে যাব বটে? আসলে, এখন অগ্নি বোঝে, মেশোর গরজটা ছিল অন্যখানে। গজেনের পছন্দটাকে ভাঙিয়ে মোটা টাকা কনেপণ আদায় কবেছিল সে। পরেপশ্চাতে কথাটা কানে এসেছিল অগ্নির। কেউ বলে পাঁচশো, কেউ বলে হাজার। শুযেণ বাউরির যা কিছু আঠা ছিল, ওখানেই। তো, সেই সন্ধ্যায় গজেনরা সারা রাস্তা নাচ-গান করতে করতে যখন এসে পৌঁছল শুষেণ বাউরির দুয়োরে, ততক্ষণে অগ্নির কপালে সিঁদুর আর চন্দনের ফোঁটা পড়ে গিয়েছে। বামুনপাড়ার সুদাম ঠাকুরের ঘর থেকে এক ঘটি জল এনে মাঝ উঠোনে রেখেছিল শুষেণের বউ। একটা মউলের ডাল, জাতের রীতি অনুসারে ভেঙে এনে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল উঠোনে। মউল ডালের সুমুখেই বিয়া হবে। ফুলকুসুমা বাউরিপাড়ার মোড়ল ফুলেশ্বর বাউরি কপালে লম্বা সিঁদুরের ফোঁটা কেটে মদে চুর হয়ে বসেছিল দাওয়ায়।

গজেনরা উঠোনে এসে পৌঁছনো মাত্রই শুরু হয় বিতণ্ডা। মউল ডাল ছাড়াও একটা সিদা গাছের ডাল এনেছিল ওরা। দুটো ডালই পুঁততে চায় উঠোনে। শুযেণ বাউরির তাতে ঘোর আপত্তি। বলে, আমরা মল্লব বাউরিরা শুধু মৌলডালই পুঁতি। সিদা গাছের ডাল আমাদ্যার বিয়াতে চইল্‌বেক নাই। গজেনের আত্মীয়-কুটুমরা শুনে রেগে-মেগে কাঁই। বলে, আমাদের শিখর‍্যা বাউরিদের বিয়া সিদা ডাল ছাড়া হব্যেক নাই। এই নিয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ চলে বাদ-বিসংবাদ। বিয়ে প্রায় ভেঙে যায় অবস্থা। অবশেষে শুযেণকে বোঝায় মোড়ল ফুলেশ্বর। কানে কানে অনেক কিছু বলে। শেষমেষ নিমরাজি হয় শুযেণ বাউরি। কনেবাড়ির মৌল ডালের পাশে পোঁতা হয় বরপক্ষের মৌল এবং সিদা ডাল। অগ্নির মাসতুতো বোনেরা গজেনের কপালে চন্দন-সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। মাদল বাজতে থাকে দ্রিম....দ্রিম....। শুয়োরের মাংস রান্নার গন্ধে ম-ম করে পুরো তল্লাট।

মাঝ উঠোনে খেজুর পাতার তালাই পাতা ছিল সেই সন্ধে পহর থেকে। বরপক্ষ বসে। শুষেণ বাউরি পান, তামাক নিয়ে হাজির হয় মাঝ উঠোনে। গজেনের বাপের দিকে দৃষ্টি হেনে বলে, বল দেখি মুরুব্বির পো, ঝাকুড় ঝুকুড় গাছটি/ফল ধইরেছে বারটি/পাইক্‌লে হয় একটি/ কি বটে?

— বার মাস। এক বচ্ছর। এবার তুমি বল দেখি, পিঠে চেইপ্যে যায়/ বিনা দোযে মার খায়।

—কী আবার। ঢাক। বল দেখি, ফলের মধ্যে জলটি, জল হুড়্ হুড়্ করে/ আর, আকাশেতে

আগুন জ্বলে, ধুয়া বারায় নলে। কি?

— হুঁকা আর কইল্‌কা।

এতক্ষণে হাতের হুকাখানিতে গনগনে কল্কে চাপায় শুষেণ। তামাক সেবনের যোগ্যতা অর্জন করেছে বরপক্ষ। গজেনের বাপের দিকে হুঁকাখানি এগিয়ে দেবার আগে মন্তর পড়ে হুঁকা-কলকে শুদ্ধি করে নেয় শুষেণ বাউরি।

ক্ষুদিয়া ক্ষুদিয়া বীচিগুলান
লম্বা লম্বা পাতা
শুন, শুন মহাশয়, তামাকেরো কথা।
এক ছিলিম তামাক বানাইলে সব্বলোকে খায়
পথের পথিক গেলে ফির‍্যা ফির‍্যা চায়।
উত্তম গাছের ফল আনিয়ে লারকোল,
উয়াতে দিয়ে, মা গঙ্গার জল,
বুসাইয়া ঝারির নল,
হুঁক্যা করে ভুড়ভুড়, কইল্‌ক্যা করে সাঁই
ধইর্‌ল্যম হুঁকা, মাইর্‌ল্যম ফুঁক
শুদ্ধ কইর্‌ল্যম কইল্‌কার মুখ।।

মুড়ি আর ঝিলাবি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় বরপক্ষকে। তারপর ছাঁদনাতলায় আসে বর। তখনই অগ্নি টের পেয়েছিল, গজেন টলছে। পাশে গিয়ে বসতেই মুখ থেকে ভকভকানি গন্ধ! অগ্নি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বরপক্ষও বামুন বাড়ির জল এনেছিল। মউলের ডাল দিয়ে সেই জল অগ্নির মাথায় ছিটিয়ে দেয় ফুলেশ্বর মোড়ল। কনেপক্ষর রাখা জলও ছিটিয়ে দেয় গজেনের মাথায়। অবশেষে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করে সবাই।

বিয়ের পর বরপক্ষ — কনেপক্ষ একত্রে খেতে বসে। ভাত, শুয়োরের মাংস এবং প্রচুর পরিমাণে পচাইয়ের আয়োজন করেছিল শুষেণ বাউরি। খুব সাপটে-সুপটে খায় সবাই। অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে খুব ছড়া কাটতে থাকে বরপক্ষের মেয়েরা। জবাবে অগ্নির মাসতুতো বোন, বউদিরাও ছড়া কেটে জবাব দেয়। এক সময় মদের নেশায় চুর হয়ে উঠোনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। অগ্নির যুবতী শরীরের ডালে ডালে একরাশ পাখির বসবাস। ঐ রাতে পাখিগুলো নিথর হয়ে বসেছিল ডালে ডালে। সে রাতে আধো তন্দ্রার মধ্যে অনেক কুস্বপ্ন দেখেছিল অগ্নি। একটা শুয়োরকে কারা যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙামময়। ছুটতে ছুটতে মরণ আর্তনাদ তুলেছে পশুটি। সারা ডাঙার বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই গোঙানির আওয়াজ। সকালে, ঘুম ভাঙলে পর, ননদেরা শুধিয়েছিল, অমন গুঁগাচ্ছিলে ক্যানে লিদেব ঘোরে?

পরের দিন অগ্নিকে নিয়ে রওনা দেয় গজেনরা। গজেনের নেশা তখনও কাটেনি। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। পা দু'টি টলছিল। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অগ্নির বুকের মধ্যে টলমল করে কান্না। বুকখানা গুঁড়ো গুঁড়ো হতে থাকে নিঃশব্দে। শুষেণ বাউরির বাড়ি থেকে

গজেনদের বাড়ি মিনিট পনেরোর পথ। শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছতেই প্রথমে অগ্নিকে হলুদ-তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেয় ওপাড়ার সমবয়েসী মেয়েরা। যারা এর আগে অগ্নিকে দেখেনি, ভুলভুল চোখে দেখতে থাকে ওর রূপের ছটা। গজেনের সৌভাগ্যকে বাহবা দেয় প্রকাশ্যে। বরের বাড়ির উঠোনে, ছাঁদনাতলায়, গজেন আর অগ্নিকে বসিয়ে ওদের পাড়ার মুখিয়া সন্তোষ বাউরি বামুনবাড়ির জল মউলের ডাল দিয়ে ছিটিয়ে দেয় দুজনের মাথায়। বিড়বিড় করে আশীর্ব্বাদ করতে থাকে দুজনকে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে, ছাঁদনাতলাতেই হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলে গজেন। অজীর্ণ ভাত, মাংস আর পচাইয়ের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। অগ্নি শাড়ির আঁচল দিয়ে নাকচাপা দেয়। তার দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। জাত কুটুমেরা দৌড়ে এসে গজেনকে তুলে নিয়ে যায়। শুইয়ে দেয় দাওয়ায়। মাথা ধুইয়ে দেয় ঠাণ্ডা জলে। উঠোনের বমি নিকিয়ে সাফ করে দেয়। গোময় দিয়ে নিকিয়ে দেয় উঠোন। কিন্তু এত করেও গন্ধটাকে নির্মূল করতে পারে না ওরা। গন্ধটা ভেসে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়, অগ্নির নাকের কাছাকাছি। অগ্নি যেখানে যায়, ওটাও পিছু পিছু ধায়। আজ এ্যাদ্দিন বাদে, এত বছর বাদেও, অগ্নি অনুভব করে গন্ধটা ওর পিছু ছাড়ে নি। মাঝে মাঝে যখন খুব ফুরফুরিয়ে হাওয়া বয়, চাঁদের আলোয় ফিং ফোটে চারপাশে, মনের মধ্যে যখন যাবতীয় কুঁড়িগুলি ফুটে উঠতে চায় যুবতী মেয়েদের, যখন একেবারে শিমুল তুলোর মতো হালকা হয়ে যেতে চায় শরীরখানা, তখনই অগ্নির চারপাশ আচমকা উগ্র গন্ধে ভরে যায়। বমি আসে তার, কান্না পায়। কাজে কর্মে ডুবে থাকলে, গন্ধটা পায় না অগ্নি। একলাটি হলেই, পেছনের দিকে হাঁটাহাঁটি জুড়লেই আচমকা হাওয়ায় অসহ্য ভকভকানি গন্ধ। যেমন, এখন, এই মুহূর্তে আবার গন্ধটা পাচ্ছে। গন্ধটা তার বুকের মধ্যে গুলিয়ে দিচ্ছে সব কিছু। একটু একটু করে বমি পাচ্ছে ওর।

এতক্ষণ যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছিল অগ্নি। সহসা তার খেয়াল হয়, পেছনে বসে গজেন যেন বিড়বিড় করে কী সব বলে চলেছে অনর্গল। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কান চলে যায়। গজেনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলোকে শিকার করতে থাকে নিঃশব্দে।

গজেন বিড়বিড়িয়ে বলে চলেছে, পাতা-লাচের দল লিয়ে আইছিল্যম ত। ছান্দারের জম্‌লাসিনির থানে লাচ ছিল কাল রাইতে। ত, দলের লোকজন উখ্যেনেই রয়্যেছে, আমি ভাবল্যম, দেইখে আসি, বউ-বাচ্চা ক্যামুন আছে।

অগ্নি কান এড়ে শুনছিল। এক ধরনের বিকট গন্ধ পাচ্ছিল হাওয়ায়। গন্ধটা চেনা চেনা, কিন্তু ধরতে পারছিল না কিছুতেই। গন্ধটা উগ্র, অল্পেতেই মাথা ধরে আসে অগ্নির। এবং খানিকবাদে সে বুঝতে পারে, পচানি নয়, গাঁজার উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে গজেনের শরীর থেকে। গজেন বিড়বিড়িয়ে বকেই চলেছে, কতদিন দেখা নাই, সাইক্ষ্যাৎ নাই, ব্যাটাটা যে কত বড় হইল্যাক, ভাবল্যম, যাই, অত কাছে যখন আইছি....।

অগ্নি জবাব দেয় না। সে আরও বেশি করে মনযোগ দেয় পাখিটার দিকে। বটফলটা একটুখানি খেয়ে আর খেতে চাইছিল না পাখিটা। অগ্নি ওকে জোরসে ধমক লাগায়, আ-হা, আহ্লাদি, লাল টুকটুইক্যা বটফল, মুখে রুচ্‌ছে নাই। খা—।

গজেন বলে, ব্যাটা কুথা? আমার বড় ব্যাটা? কুথা উ?

অগ্নি জবাব দেয় না। গোরার হালহদিশ দিতে চায় না লোকটাকে। কী আবার এক অশান্তি বাধাবে ওখানে গিয়ে। এ সময়টা গোরা ইস্কুল বোর্ডিং-এ থেকে ভালই হয়েছে। অগ্নি ভাবে। অমন পুড়ামুখ ছেলেটার না দেখাই ভাল।

অগ্নি জোরে জোরে পা ফেলে চলে যায় ডোবার দিকে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধোয়। ঘাড়ে গলায় জল দেয়। ডোবার নৈঋত কোণে অগ্নির থেকে সামান্য তফাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জলকাল্লা হয়ে রয়েছে জলের মধ্যে। ঠিক কামরাঙার মতো দেখতে। জলের কিনারে কয়েক জাতের গঁদ। এ সবই নিশানের সম্পত্তি। চিরকালই সামান্য ঘরোয়া চিকিৎসা করে। মানুষজন আসে এখনো। জলকাল্লাগুলোতে না পা পড়ে যায় তেমন সাবধানতা নিয়ে অগ্নি উঠে আসে ডোবা থেকে। শ্যামালতার শরীর থেকে আচমকা বনজ গন্ধ পায়। উঠোনে ফিরে এসে দেখে, গজেন তখনও সমানে বকবক করে চলেছে। যখন লাচের দল লিয়ে বারাচ্ছি, মাসি বইল্ল্যাক, অত কাছে যাচ্ছু যখন, লিজের বউটাকে দেইখে আইস্‌বি টুকচান। ত, আমি বইল্ল্যম, সে আর তুমাকে বইল্‌তে হবেক নাই, মাসি গ.....।

—তুমি ইখন যাও। মাঝপথে কথা থামিয়ে দিয়ে খুব নিচু গলায় বলে অগ্নি, ঘরে অসুখ। তুমি যাও।

—অসুখ! গজেন বুঝি সামান্য উৎসুক হয়। পরক্ষণেই স্বভাবে ফিরে আসে, শরীল থাইক্‌লেই অসুখ-বিসুখ হবেক্‌ই। এই দ্যাখ্‌ না, মাস-দুই আগে, সারা গা হইল্‌দা মাইর্‌য়ে গেল্যাক। চোখ হইল্‌দা, জিভ হইল্‌দা, হাতেপায়ের নখ হইল্‌দা, পিসাব অবধি হইল্‌দা। তুয়ার বোন বইল্ল্যাক, কামলা রোগ। তুমি রাইপুরের শুক্‌রা হাড়ির পাশ যাও। উ কামলা রোগের ন্যাবা-মালা দেয়। তো, শুক্‌রা হাড়ির পাশ মালা পইরে শেষমেষ ইখন টুকচান ভালর দিকে। তো, বইল্‌তে পারু, অমন শরীল লিয়ে পাতালাচের দলে আসা ক্যানে? ত, বলি, তুয়ার বোনও ইট্যা বইল্‌ছিল্যাক। কিন্তু দলের ছুগরাগুলান কি ছাড়ে? বলে, গজেনদা গো তুমি ছাড়া পাতালাচে সঙ্গত দিবার লোক দেখি না রাইপুর থানায়।

—তুমি যাও না ইখন। অগ্নি সাপের মতো ফোঁস তোলে, বইল্‌ছি না, ঘরে অসুখ!

—ত, বইল্‌তে পারু, যে দেশে হরি ঘোষ নাই, সে দেশে কি আউখ-চাখ নাই হয়? যে দেশে গজা বাউরি নাই, সে দেশে পাতালাচ বন্ধ! ত, বলি—।

অগ্নি টিয়ে পাখির দিকে মুখ ফিরিয়েই কথা বলছিল এতক্ষণ। সহসা সে ঘুরে দাঁড়ায়। কুলুঙ্গির থেকে চকচকে হাঁসুয়াখানা তুলে নিয়ে সোজাসুজি তাক করে গজেনের মাথায়, এই দণ্ডে না বারালে রক্তগঙ্গা বইয়ে যাবেক। দূর হ, দূর হ।

গজেন দেখে, অগ্নির সারা শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। চোখদুটো খরিশ সাপের মতো জ্বলছে। আর মাথার ওপর লকলক করছে ধারাল হাঁসুয়া। চটজলদি উঠে দাঁড়ায় সে। হতচকিত বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে উঠোনে নামে। বেড়ার আগল খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে। অগ্নির নাগালের বাইরে পৌঁছবার পরই মুখখানি খুলে যায় গজেনের। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চিল-চিৎকার জোড়ে সে। মাগী, এই তুয়ার ব্যাভার? লিজের বিয়া করা সোয়ামী এক যুগ পরে

আইল্যাক, কুথা রেঁধে বেড়ে খাবাবি, স্যাবা-যত্ন কইর্‌বি ..।

'আয়—।' অগ্নি মাথার ওপর হাঁসুয়াখানি তুলে ধরে উঠোনে নামে, দু'ঘা ঝাঁটা খাবাই তুয়াকে। আরে, আমার সোয়ামী বে....। অমন সোয়ামীর কলিজায় ছুরি দিতে লাগে।

—কে আইস্‌তে চাইছিল তুযার পাশ? গজেন বেড়ার ওপার থেকে হুঙ্কার দিতে থাকে, গজা বাউরি অত কাম-বালিয়া লয়। ছুটকিও কান কামড়্যে বইলেছিল, যাইও নাই উই জাত-ছুটকা মাগীর পাশ, কিন্তু কৌশল্যা মাউসী অমন জাপুট্যে ধইর্‌ল্যাক ...।

—'তুই মর্, তুয়ার কৌশল্যা মাউসী মরু, তুয়ার ছুটকির অসাধ্যি হউ ...। বলতে বলতে রুদ্রমূর্তি অগ্নি হাঁসুয়া হাতে ছুটে যায় আগড় অবধি।

গজেন সেই রুদ্র মূর্তির সুমুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পায় না। একটু একটু করে পিছু হটতেই হয় তাকে। কিন্তু সেই ফাঁকে সে এক ঝলক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেয় অগ্নিকে। দেখতে দেখতে তার দু'চোখে ফুটে ওঠে লোভী শিয়ালের লালসা। নাহ্, গজেনকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, প্রথম পক্ষেরটি তার যথার্থই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপসী। ইদানীং যেন জৌলুষখানা দশ গুণ বেড়েছে। বেশিক্ষণ নাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরে যায়। ছুটকিটা সে তুলনায় পেত্নিই। কেন যে ওটাকে গলায় বাঁধল গজেন! কী ভীমরতি যে ধরল। গজেন নিজেই অবাক মানে।

গজেন চোখের আড়াল হওয়ার বেশ খানিক বাদে ধীরে ধীরে হাঁসুয়াখানি নামায় অগ্নি। টানটান শরীরখানাকে আস্তে আস্তে ঢিলে করে দেয়। চোখের আগুন নিভে আসে। ধীরে ধীরে মেঘ জমে তার সারা বুক জুড়ে। হাওয়া বয়। একসময় তার দুটি চোখ ভরে আসে জলে।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি, বৃষ্টি।

৮. পাখি-ধরা খেলা

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রতাপলাল সিংহবাবু তাঁর বিশাল তালুকের একটা গতি করতে পেরেছিলেন। বিষ্ণুপুরের শরদিন্দু উকিল নাগাড়ে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন সিংহগড়ে। সেটেলমেন্ট দপ্তরের হরিসাধন বটব্যালও এসে কাটিয়েছিলেন কয়েক রাত।

কিছু ডাঙা-ডিহি-জঙ্গল অবশ্যি ছাড়তেই হল। তবে অধিকাংশ শোল-কানালি জমি, জোড়, বাঁধ রেখে দেওয়া গিয়েছে। নিয়মমত পঁচিশ একর কৃষি জমি এবং পনের একর অকৃষি জমি রেখেছেন নিজের নামে। ছেলে হরবল্লভকেও পৃথক পরিবার দেখিয়ে, রাখা গেছে সম পরিমাণে কৃষি ও অকৃষি জমি। তা বাদে, দুই নাতি প্রভঞ্জন, দেবিদাস এবং নাতনি উমার নামেও ঢের সম্পত্তি। গৃহদেবতা সিংহবাহিনী, রাধামাধবের নামেও দেবোত্তর। পাগল শিকারি, ইন্দ্র বাগদি, কালো শিকারি গোছের বিশ্বাসী ও অনুগত মুনিশ মাইন্দারের নামেও বেশ কিছু জমি চালান করে দিয়েছেন। এতসব করেটরেও প্রচুর জমি সিলিং-এর বাইরে থেকে গেল। বুদ্ধি যোগান শরদিন্দু উকিল। কানালি আর বাইদ জমিতে বুনে দিন কিছু টোপা কুলের গাছ। বেশি নয়, মাঝে মাঝে দু'চারটা করে। ফলের বাগান। যত খুশি রাখা যায়। আর গভীর শোল্ জমিনগুলোতে জল জমবে বর্ষায়। টলটলে দীঘি সব। হরিসাধনকে নিয়ে

এসে দেখিয়ে দিন শ্রাবণে-ভাদ্রে। পুকুর হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাক। পুকুরও তো যতখুশি রাখা যায়।

সেই মতই কাজ হয়েছে। থেকে গেছে আরও চার-পাঁচশো বিঘে জমি।

শরদিন্দু উকিল আরও একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। বৌদিকে কাগজে-কলমে 'ডাইভোর্সড' দেখিয়ে দিন। একটা পৃথক পরিবার হয়ে যাবেন তিনি। বেশ খানিকটা জমি থেকে যাবে সেই বাবদ। আর, কোলকাতায় কাউকে পাঠিয়ে কিছু শালগ্রাম শিলা, পেতলের লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী কিনিয়ে আনুন। নামকরণ করুন সবগুলোর। রেখে দিন সাবেক মন্দিরের একোণে ওকোণে। প্রত্যেকেব নামে দেবোত্তর জমি রাখা যাবে অনেক। প্রতাপলাল প্রথম পরামর্শটি মানতে পারেননি। তবে মন্দিরে ঠাকুর-দ্যাবতার সংখ্যা কিছু বাড়িয়েছেন। বাধাকান্ত, ব্রজনাথ, বিপদত্তারণ. এমন এমন সব নামকরণ কবেছেন তাদের। এতসব করেটরেও বহুৎ সম্পত্তি থেকে গেল শিলিং-এর বাইরে। শরদিন্দু উকিল একান্তে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'বি' ফর্মটা এখন দাখিল করবেন না। চুপটি করে বসে থাকুন। কাগজপত্তর সব তৈরি তো রইলই। এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেই মত বেশ কিছুদিন মটকা মেরে বসেছিলেন প্রতাপলাল। অবশেষে 'বি' ফর্ম দাখিল করতেই হল। শরদিন্দুর পরামর্শে বেশ বুদ্ধি করে ছাড়া হল জমি। একখানা চাক পুরোপুরি ছাড়া হল না কোথাও। প্রতাপলালের সমস্ত প্লট থেকেই দশ-বিশ শতক করে ছেড়ে দেওয়া হল 'বি' ফর্মে। মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে কুলকুলিয়ে হাসতে থাকেন শরদিন্দু। এসব জমি যদি কোনদিন ভেস্টও হয়, দখল নেবার বেলায় খেলটা জমবে!

— কেন? প্রতাপলাল বুঝতে পারেন না।

— কেন কি? বড় বড় চোখে তাকান শরদিন্দু। প্রতিটি আইলবদ্ধ প্লট থেকে মাপ জোক করে দু'দশ শতক জমি খুঁজে, মেপে, আলাদা করে নেওয়া সহজ নাকি? কত আমিন লাগবে সরকারের? কত বছর কেটে যাবে আলাদা করতে। তারপরও সে জমির পাট্টা যদি কেউ পায়ও, দু'পাঁচ শতক জমির দখল নেবে কি করে? চারপাশে আল বাঁধতেই তো ফুরিয়ে যাবে অর্ধেক জমি। বাকিটুকুতে চাষ করাতো দূরের কথা হালই ঘুরবে না। ঐ একচিলতে জমির দখল নিতে গিয়ে অত কাণ্ড করতে যাবে কে? দোলা ভাড়ায় বউ বিক্রির জোগাড়!

কাজটা খুব জুতসই হয়েছে বলে মনে হয়েছে প্রতাপলালের। শোল-কানালি বাইদ মিলে প্রায় দু'হাজার প্লট তাঁর। প্রতিটি জমি থেকে সামান্য সামান্য ছাড়া হয়েছে। প্রতাপলালের জমার জমি থেকে ঐটুকু করে ছেড়ে দেওয়া জমিকে আলাদা করে নিতে, যদি দশজন আমিন লাগায় সরকার, তাও বছর দুই-তিন লেগে যাবে কেবল মাপজোক করতে। সেটেলমেন্ট দপ্তরে আমিনই তো মোটে জনা তিনেক। আর, বিষ্ণুপুর থানায় প্রতাপলালই তো একমাত্র জোতদার নন।

বিদায়কালে চুপি চুপি বলে যান শরদিন্দু উকিল, এখন কোনও জমিরই দখল ছাড়বার দরকার নেই। সরকার আগে ভেস্ট ডিক্রেয়ার করুক, মাপজোক সারুক, দখল নিতে আসুক,তখন দেখা যাবে। আর, জমিদারী আমলের সাদা চেকবইগুলো রাখবেন যত্ন করে।

কাজে লাগতে পারে ভবিষ্যতে। পুকুর কিংবা বাগান বানানো শোল-কানালি জমিগুলোকে যদি কোনদিন ধরতে চায় সরকার, ব্যাক-ডেটেড চেক লিখে অনুগত কারোর নামে ট্রানস্‌ফার করে দিলেই হবে। অর্থাৎ কিনা জমিদারী-উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার আগেই সে জমি আপনি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন অন্যের নামে। সে জমি এখন আর আপনার মালকানায় নেই।

পরামর্শ মতো সব কিছু করেটরে একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন প্রতাপলাল। বল এখন সরকারের কোর্টে। সকাল-সন্ধ্যে এলাকার সঙ্গতি-সম্পন্ন মানুষজন আসেন। প্রতাপলালের পায়ের তলায় বসে শলা-পরামর্শ করেন। জ্ঞান-বুদ্ধি নেন। আগামী দিনগুলোর জন্য আটঘাট বেঁধে তৈরি হতে থাকেন।

প্রতাপলাল যতখানি পাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন, কনকপ্রভার গড়ে তার ছিটেফোঁটাও হয়নি। চারপাশের সমস্ত জোতদার, জমিদারদের মতো কনকপ্রভার লোকজনও প্রচলিত নিয়মে লুকিয়ে ফেলেছিল কিছু জমিন, কিন্তু সে ছিল বড়ই কাঁচা বন্দোবস্ত। কোনও পাকা গিঁটই ছিল না সে ব্যবস্থায়। রতিকান্তর কানে আসতেই সে হা-হা করে হেসেছিল। বলেছিল, হবেক্‌ই তো। একজন যজমানিয়া বামুনের পুত্তুর, অন্যটি যাত্রার বিবেক। শুনতে পাই, সে শালা ফের নাকি সুঁচে সুতা পরাতে পারে না। দুয়ে চালাচ্ছে এস্টেট। আরে, ছাগল দিয়ে কি হালচাষ হয় হে!

বড় বিচিত্র ছিল কনপ্রভার জমি লুকোবার কায়দা কৌশল। যেমন কাকেরা। অকস্মাৎ কিছু বেশি খাদ্য পেয়ে গেলে, সামান্য খেয়ে বাকিটা লুকিয়ে রাখে গেরস্তের খড়ের চালে। চালের খড় সরিয়ে গর্ত বানায়, সেই গর্তে খাবার লুকিয়ে রেখে ফের খড়চাপা দিয়ে দেয়। পুরো ব্যাপারটাই ওরা সারে, চোখ বন্ধ করে। চোখ বন্ধ করলে যেহেতু ওরা কিছু দেখতে পায় না, ওদের সম্ভবত ধারণা হয়, চারপাশের কোনও কিছুই কারো চোখেই দৃশ্যমান নয়। ফলে, লুকোনো খাবারের হাল-হদিশ কেউই পাবে না। বেশ পাকা কাজ করা গেল একখানা। খাদ্যটুকু লুকিয়ে কাক উড়ে যায়। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। খিদে পেলে ফিরে আসে গেরস্তের খড়ের চালে লুকোনো খাবারের সন্ধানে। কিন্তু গুপ্ত স্থানটা সঠিকভাবে আর কিছুতেই খুঁজে পায় না বেচারা। কোথায় কোথায় গুঁজে রেখেছিল বেমালুম ভুলে যায়।

কনকপ্রভার অবস্থা খানিকটা সেরকমই।

জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর,সিলিং বহির্ভূত প্রচুর জমি এর-ওর নামে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কার নামে কোন্ চাকের কতখানি জমি, সে সব আর আলাদা করে মনে নেই। জমিদারি সেরেস্তায় পুরোনো দিনের চেকবই ছিল অগুনতি। নিকুঞ্জপতি সেই চেকবইতে বহু বশংবদ প্রজা, মুনিশ-মাইন্দারের নামে পেছনের তারিখে চেক কেটে বন্দোবস্ত দিয়েছে প্রচুর জমি। তার মধ্যে অনেক কল্পিত নামও ছিল। কনকপ্রভার মহলের কুকুর বেড়ালগুলোর নামেও চেক কেটেছিল নিকুঞ্জপতি। হুলো বেড়ালের নাম লিখেছিল হুলোরাম দাস। মাদী বেড়ালের নাম মার্জারী দাসী। ভুলো কুকুরের নাম ভোলানাথ দাস, কেলোর নাম কেলো দাস। প্রতাপলাল এবং অন্য জোতদারদের দেখাদেখি সেই পথই অবলম্বন করেছিল নিকুঞ্জপতির দল। তারপর একটু একটু করে বিলাস-ব্যসনে ডুবে গিয়েছে। গানের

আসর, জলসা, পর্যটন, বারো মাসে ছত্রিশ উৎসব....। ওদিকে জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রে একটু একটু করে ধুলো জমেছে। উই ধরেছে। পোকামাকড়ে কেটেছে। ছাতা পড়েছে। ....একদিন মালুম হল, চেকবইগুলোর বারোআনা চলে গিয়েছে পোকামাকড় আর উইদের পেটে। বহু কাগজ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। ফলে, কনকপ্রভার হয়েছে ঐ খাবার লুকোনো কাকের দশা। কোথায় কোথায় কোন্ গুপ্ত গহ্বরে গুঁজে রেখেছিলেন খাবার, কিছুতেই আর মালুম করতে পারছেন না।

কথাটা রতিকান্তর মুখ-ফেরতা পৌঁছেছিল প্রতাপলালের কানে। তাঁর তখন অন্তিম অবস্থা। দিনরাত শয্যাশায়ী। এই বয়েসে ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি শিথিল হয়ে আসে। সবকিছু শিথিল হয়ে যায়, রাগ-রোষ, ঈর্ষা, জেদ...। তখন শিশুর মতো হয়ে যায় মানুষ। স্মৃতি কথায় কথায় প্রতারণা করে। অতীতের বর্তমানের অনেক কিছুই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। সেই অন্তিম বয়সে এসে সাবেক সিংহগড়ের ওপর তাঁর আজীবন লালিত বৈরিতার অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রতাপলাল। ক্রমশ আকাশমুখী হচ্ছিল তাঁর মন। হালকা, পলকা, উদার...। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল সিংহগড়েরই এক শরিক, সেও আবার দুটিমাত্র অসহায় রমণী, আচমকা নিঃস্ব হতে বসেছে। সিংহগড়ের তকমা গায়ে এঁটে দু'দিন বাদে হয়ত হরেক উঞ্ছবৃত্তি করে বেঁচে থাকতে হবে ওদের।

হরবল্লভকে ডেকে বলেছিলেন, কনককে আমার পাশ লিয়ে আয়। আমার কথা আছে উয়ার সাথ।

বাবার এই সিদ্ধান্ত হরবল্লভের তিলমাত্র পছন্দ হয়নি। রতিকান্তর ছিল ততোধিক অপছন্দ। ওর বাবা কৃষ্ণদাস গোস্বামী ছিলেন সাবেক সিংহগড়ের আজীবন গোমস্তা। ধীরস্থির, প্রাজ্ঞ ও প্রভুভক্ত মানুষটি আজীবন কায়মনোবাক্যে সিংহগড়ের সেবা করে গিয়েছেন। রতিকান্ত বাপের থেকে বৈষয়িক বুদ্ধিখানা পেয়েছে ষোলআনার জায়গায় আঠার আনা। কিন্তু আর সব কিছুতেই সে ছিল বাপের ঠিক বিপরীত। অসম্ভব ধূর্ত ছিল সে। মেয়েমানুষের দোষ ছিল ষোল আনা। মানুষকে, সে বন্ধুই হোক কিংবা শত্রু, ডুবিয়ে দেবার প্রবণতা ছিল অপরিসীম। সত্যি কথা সে কদাচিৎ বলত। ফলে, কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর যখন রতিকান্ত বাপের পদখানির জন্য হা-পিত্যেশ করে ঘুরে বেড়াল, লাবণ্যপ্রভা কিছুতেই তাকে বহাল করেননি গোমস্তার পদে। সুদর্শনের রক্ত বইত লাবণ্যর শরীরে। মানুষ চিনতে তিনি ভুল করেননি। তখন সাবেক সিংহগড়ে নিকুঞ্জপতির প্রবেশ ঘটেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমী, সদাচারী মানুষ সে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মিষ্টভাষী। আর লাবণ্যর প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তির কোনও তুলনা নেই। নিকুঞ্জপতি থাকতে রতিকান্তর মতো ধুরন্ধর, লম্পট ব্যক্তিকে বহাল করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি লাবণ্যপ্রভা।

সাবেক সিংহগড় থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রোষে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে রতিকান্ত। চতুর্দিকে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ায়, লাখ টাকা দিলেও উখ্যেনে কাজ লিব্যেক নাই রতিকান্ত গোঁসাই। একে তো মেয়া মানুষ, বারোহাত কাপড়েও ল্যাংটা, তায় ফের বিধবা। অমন ইস্টেটে ভদ্দরলোক ঢুকে? তা বাদে, যজমানিয়া বামুন আর যাত্রাদলের বিবেক যিখ্যেনে

ইস্টেটের মুরুব্বি, সিখ্যেনে গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ফেল মাইর‍্যেকই। কিছুদিন বাদে নানান কৌশল ফেঁদে প্রতাপলালের গড়েই বহাল হয় রতিকান্ত। তার গুণের কথা প্রতাপলালেরও অজানা ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি ওকে বহাল করেছিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে তার স্বচ্ছ মগজের কথা ভেবে। তাছাড়া, তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, তিনি কিংবা হরবল্লভ বেঁচে থাকতে রতিকান্ত বড় একটা উড়তে পারবে না। সিংহবাবু বংশের মানুষেরা জানে, কিভাবে উড়ন্ত পক্ষীর ডানা ছেঁটে দিতে হয়।

প্রতাপলালের সিদ্ধান্তে যতই না মনে মনে রুষ্ট হোক, তখনও অবধি তাঁর নির্দেশ অমান্য করবার জো ছিল না কারোরই। ফলে, কনকপ্রভাকে ডাকিয়ে এনে প্রতাপলালের শয্যার পাশটিতে হাজির করেন হরবল্লভ। তখন রাঢ়ের বুকে এক পহর রাত। একটু আগেই গীতা পাঠ করে শুনিয়ে গিয়েছে শ্যাম পণ্ডিত। রোজ সন্ধেবেলায় এসে একঘন্টা গীত পাঠ করে শুনিয়ে যায় প্রতাপলালের শিয়রে বসে। আগে শোনাত বাবা কপিলেশ্বরের পূজারি নিশাকর ভট্চাজের বাপ সত্যাদেশ ভট্চাজ। কিন্তু ঘনঘন বড্ড কাশে আর গোঁয়োর তোলে। আর পাঠ করা কালীন দু'তিন শব্দের মাঝে মাঝে খালি 'এ্যাঁ—, এ্যাঁ—' করতে থাকে। আসলে, ঘনঘন 'এ্যাঁ—'র শেকল দিয়ে সে দু'চারটি করে দুরূহ শব্দকে জুড়তে জুড়তে এগোয়। বিরক্ত হয়ে ওকে বাতিল করে দিয়েছেন প্রতাপলাল। তার বদলে বহাল হয়েছে শ্যাম পণ্ডিত। ইস্কুলের মাস্টার সে। উচ্চারণটা অপেক্ষাকৃত ভাল।

কনকপ্রভা ঢোকামাত্তর হরবল্লভকে ঘরের বাইরে চলে যাবার নির্দেশ দেন প্রতাপলাল। তারপর অনেকক্ষণ স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকেন, নাত-বউয়ের দিকে। চোখের কোনা সামান্য আর্দ্র হয়ে ওঠে।

এক সময় নিচু গলায় বলেন, কিছু চেকবই ছাপাই আন, বাঁকুড়া-বিষ্টুপুর লয়, তুমার বাপের দেশের কুনো ছাপাখানা থিকে। চাউলের বস্তার মধ্যে মাস-ছয় রাখ। পুরানো হয়ে যাবেক লতুন করে চেক কেট্যে দাও চাষীদের নামে। দ্যাখ, এতে করে যদি সম্পত্তিটা বাঁচে আর —। প্রতাপলাল গলাখানি আরও খাদে নামিয়ে আনেন, আর, দিনরাত উইসব হৈ-হুল্লোড়, ভূত-ভোজন বন্ধ কর।

সেদিন অনেক রাত অবধি প্রতাপলাল কনকপ্রভাকে ছাত্রজ্ঞানে শিখিয়েছিলেন ভূমি নামক পাখিটিকে খাঁচায় আটকে রাখবার কৌশল।

কনকপ্রভা মন দিয়ে শুনছিলেন। কোনও জবাব দেন নি। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রতাপলালের ঘর থেকে। হরবল্লভ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখদুটো হুঁড়ারের মতো জ্বলছিল। কনকপ্রভা বহুদিন ভুলতে পারেন নি হরবল্লভের দৃষ্টির সেই আগুনকে। আগুন আগুন।

৯. প্রবল পিপাসা ও জলাতঙ্ক

মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন দ'।

কনকপ্রভা নিজের সঙ্গেই বারবার তুলনীয় করে তোলেন তাকে। সুদর্শন সিংহবাবু, কনকপ্রভার দাদা শ্বশুর, যতদিন বেঁচেছিলেন, সিংহবাবু-বংশের মূল স্রোতখানা বইত সাবেক

সিংহগড়ের ওপর দিয়ে। ধীরে ধীরে মজতে লাগল সে নদী। চড়া পড়ল তার দু'ধারে। নদী তার গতিপথ বদলে সরে গেল সামান্য তফাতে, প্রতাপলালের গড়ে। এখন প্রতাপলালের গড়েই সে নদী উথালপাথাল। এখন প্রতাপলালের গড়কেই সবাই সিংহগড় বলে ডাকতে শুরু করেছে। কনকপ্রভার গড়কে কেউ ডাকে মহাপাত্রগড়, কেউ বা পুরোনো সিংহগড়। এখন অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সবই নতুন সিংহগড়ে। এখন সাবেক সিংহগড় সর্বার্থে নদী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ'। এই যেমন দ্বারকেশ্বরের দ। সেই কারণেই বুঝি, আগাগোনার কালে দ্বারকেশ্বরের পাড়ে এলেই কনকপ্রভা দ'টার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। নিজের এবং সাবেক সিংহগড়ের সমতুল বলে মনে হয় ওটাকে। কখনো সখনো তাই দ'টার পাড়ে গিয়ে বসেন। কান এড়ে শুনতে থাকেন নদী থেকে বিচ্ছিন্ন দ'টার দীর্ঘশ্বাস। আজ অবশ্য অন্য কারণেও এসে বসেছেন। আজ তিনি শুনশান দহটার পাড়ে বসে কিছুটা সময় খরচ করছেন। সূর্যকে অস্ত যাওয়ার সময় দিচ্ছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার সুযোগ দিচ্ছেন। কারণ, আজ আর দিবালোকে তাঁর চুয়ামসিনায় ফেরার উপায় নেই। আজ তাঁর সঙ্গে কুন্তী রয়েছে যে।

বকের দল চরছে নদীর ধু-ধু চরে। কেমন খাঁ-খাঁ শূন্য লাগে জীবনটা।

প্রিয়ব্রতর লাশ যেদিন ফিরে আসে সিংহগড়ে, কনকপ্রভা কেঁদে বুক ভাসাননি। বুকের ভেতরটা জমাট পাথরের পিণ্ড লাগছিল। বাস্তবিক, প্রিয়ব্রতর মৃত্যুতে তেমন কোনও ব্যথা অনুভব করেননি অন্তরে। কেন এমনটা হল, বাঙালি পরিবারের সধবা রমণী, স্বামীর মৃত্যু তার বুকে শেল হয়ে বাজল না কেন, অনেকদিন যাবৎ মনের মধ্যে ঘুরন্ত তকলির মতো ঘুরপাক খেয়েছিল প্রশ্নটা। তকলি ঘুরছিল, সুতো জমছিল। উত্তরটা এসেছে মনের একেবারে ভেতর মহল থেকে। আসলে, প্রিয়ব্রত সম্পর্কে যাবতীয় কৌতূহল, প্রত্যাশা, অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। নিজের সম্পর্কেও। প্রদীপে তেল না থাকলে যেমন করে নিভে আসে আলোর শিখা। তখন হয়ত বা শুকনো সলতেখানি পুড়তে থাকে আরও কিছুটা সময়। এক ধরনের জ্বালা, যা তখনও অবধি শুকনো সলতের মতো ধিকিধিকি পোড়াচ্ছিল বুকের ভেতরটা, তা হল, অতুল বৈভবের মূল্যে একটা পরিপূর্ণ জীবনকে কিনে নিল সিংহগড় নামে এক স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। কিনে নিয়ে ভরে দিল এক সোনার সিন্দুকে। তারপর আর কেউ খোঁজই রাখল না। সোনাদানার চাপে বুকের মধ্যেকার মানুষটা দম আটকে মরে গেল। সেই মৃতদেহের চারপাশে থরে থরে সাজানো রইল অতুল সম্পদ। সেই সম্পদের পাহাড়কে বেষ্টন করে রইল কিছু লোভী মানুষ। শুভাকাঙ্খীর ছদ্মবেশে। অকস্মাৎ একদিন বুকের মধ্যেকার সেই মৃতদেহখানি উঠে বসল। দেখল, তার চতুর্দিকে সম্পদের পাহাড়। কিন্তু সেই সম্পদকে মানুষের মতো ভোগ করবার উপায় নেই। মানুষ কোনও কিছু একা একা ভোগ করতে পারে না। তার ভোগের অংশীদার চাই। দোসর। কনকপ্রভার জীবনের কোনও অংশীদার নেই তখন। অথচ তাঁর চারপাশে থরে থরে ভোগ্যসামগ্রী। স্বামী ছাড়া, শাড়ি ছাড়া, সিঁদুর ছাড়া কেমন করেই বা সম্পদ ভোগ করবে এদেশের রমণীরা। অর্থ সম্পদ ভোগ তো দেহ দিয়েই করতে হয়। কনকপ্রভার শরীরে তো তখনই দ্বারকেশ্বরের মতো বালুচর সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘিয়ে রঙের গরদের সরু পাড় ধুতি, অবিকল দ্বারকেশ্বরের

বালুচরের মতো বর্ণ তার।

একাদশী-পিসি ছিল বালবিধবা। সিংহগড়ে আশ্রয় পেয়েছিল সে দূর-আত্মীয়া হিসেবে। প্রিয়ব্রতকে সে কোলেপিঠে মানুষ করেছিল। সবই ভাল ছিল তার, কিন্তু আমিষ নিয়ে তার শুচিবাই প্রায় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষত মাছ-মাংস তার ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারত না। এমন কি মাছ-মাংস রান্না হলে তার গন্ধও সহ্য করতে পারত না। সারাক্ষণ নাকে আঁচল চাপা দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বসে থাকত। যে বাসনে মাছ-মাংস খাওয়া হত কিংবা রান্না করা হত, সেই বাসনও স্পর্শ করত না সে। অন্যরা যখন মাছ-মাংস খেত, একাদশী-পিসি পারতপক্ষে তাকাতেই পারতো ওদের দিকে। তাকালেও এমন ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাত যেন কী এক অতি নিষিদ্ধ, অস্পৃশ্য বস্তু, যা হাত দিয়ে ছোঁয়ারও অযোগ্য, তাই কেমন কচকচিয়ে চিবোচ্ছে এরা। বুঝি গু'খাচ্ছে কুকুরে, কিংবা যবনে খাচ্ছে গোমাংস। মাছ-মাংস নিয়ে তার ঘেন্নাপিত্তি, শুচিবাই দিনদিন বিরক্তিকরভাবে বাড়ছিল। কিন্তু কনকপ্রভা, কেবল কনকপ্রভাই একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে বসেন উল্টো ছবিখানা। সে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার! একদিন, খুব এক একান্ত দুর্বল মুহূর্তে একাদশী-পিসি কেবল কনকের কাছে হাট করে খুলে ফেলে নিজেকে। কয়েক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যায়, বিগত আধ-শতাব্দীর অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধনের এক করুণ ইতিহাস।

তখন কনকপ্রভা সদ্য বিধবা হয়েছেন। সমস্ত রকমের আমিষ রান্না ছেঁটে ফেলতে হয়েছে তাঁর জীবন থেকে। একাদশী পিসি সানন্দে নিজের হেঁসেলে ভর্তি করে নিয়েছে কনকপ্রভাকে। নিজের জন্য রোজ দু'বেলা যা হোক একটা কিছু ফুটিয়ে নিতেন। কিন্তু কনকপ্রভার জন্য তো আর তেমনটি চলে না। তিনি হলেন সিংহগড়ের মালকিন। হ্যাঁ, তখন তিনি মালকিনই তো। কাজেই একাদশী পিসি নানা পদ রেঁধেবেড়ে আদর করে পাত পেড়ে খেতে দেয় কনকপ্রভাকে। পাশটিতে বসে খাওয়ার তদারকি করতে থাকে। কনকপ্রভার মুখে তখন কিছুই রুচছিল না। তার মুখে সর্বদা এক ধরনের তেতো স্বাদ। আসলে, অন্যেরা হয়ত বা ততটা নয়, কিন্তু কনকপ্রভা অনুভব করতে পারছিলেন, জিভে নয়, ঐ তিক্তস্বাদের উৎসখানি আরো অনেক তলায়। একেবারে বুকের মধ্যিখানে। কনকপ্রভা এটা নাড়ছিলেন, ওটা নাড়ছিলেন। একটু-আধটু মুখে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আহারে তিলমাত্র রুচি ছিল না। একাদশী পিসি পাশটিতে বসে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। অভিজ্ঞ বৈদ্যর দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করছিল ওঁকে।

এক সময় বলে, 'খাচ্ছ নাই ক্যানে, বউমা? রান্না ভাল হয় নাই?'

'তোমার রান্না ভাল হবে না?' কনকপ্রভা মৃদু হাসেন, 'নিরামিষ রান্নায় জুড়ি আছে তোমার?'

'তবে? কিছুই ক্যানে মুখে তুলছ নাই?'

'পিসি, আমার একেবারেই ক্ষিদা নাই গো।' কনকপ্রভা চোখে মুখে এক ধরনের পেটজ্বলা-বুকজ্বলা গোছের ভাব করেন।

একাদশী-পিসি পলকহীন দেখতে থাকে সেই অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞ বৈদ্যর মতো পেতে চেষ্টা করে উপসর্গর অন্তরালের আসল রোগটার হদিশ।

এক সময় ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, তুমাকে আর দোষ কি দিব, মা, মাছ-মাংস যে খেয়েছে একটিবার, দিনদিন নিরামিষ উয়ার মুখে রুচবেক ক্যানে? মনে হয়, ঘাস খাচ্ছি।

যেমন অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দেয়ালে মাথা ঠুকে যায়, কনকপ্রভার বুকের মধ্যেও ঠক্ করে বাজে একাদশী পিসির শেষতম বাক্যটি। যেন শূন্য ঢেঁকির গড়ে পলকের অসতর্কতায় আছড়ে পড়ল মুষল। কনকপ্রভার দু'চোখে তীব্র কৌতূহল। একাদশী-পিসির শেষ বাক্যটি তাঁকে প্রবলভাবে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। মনে হয়, ঘাস খাচ্ছি! যেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে আনা একটি বাক্য। যেন একাদশী-পিসিরই মনে হয় তেমনটা। ঘাস খাচ্ছি।

কনকপ্রভার দু' চোখে জ্বলে ওঠে খড়ক্‌পুরের গিরি-ময়দানে বসা সার্কাসের সার্চ-লাইটের মতো তীব্র অনুসন্ধানী আলো। কনকপ্রভা একাদশী-পিসিকে আঁতিপাতি খুঁজতে থাকেন ওর সারা মুখে। বুকের একেবারে গূঢ়তম প্রদেশে আলো ফেলেন। বলেন, তুমি কোনওদিন মাছ-মাংস খেয়েছ, পিসি?

সে কথায় সহসা অন্যমনস্ক হয়ে যায় একাদশী-পিসি। আচমকা ডুব দেয় ভেতরে। ডুবেই থাকে। অনেকক্ষণ। এক সময় ফের ভেসে ওঠে। খুব স্মৃতিমেদুর, তদ্গত কণ্ঠে বলে ওঠে, খাই নাই ফের? মাছ-মাংস ছাড়া আমি খেতেই পারত্যম নাই। কী যে ভাল লাইগ্‌থ। বলতে বলতে একাদশী-পিসির গলায় যষ্টিমধুর গাঢ়, আঠাল রস। বিড়বিড় করতে থাকে একাদশী পিসি, 'বার বচ্ছরে বিয়া হইল্যাক, চোদ্দ বছরেই সব শেষ।' একাদশী-পিসি এমন করে বলল কথাটা, সব শেষ, যেন শুধু স্বামীই নয়, স্বামীর সঙ্গে তার জীবনের সব কামনা-বাসনা, রূপ-রঙ সব কিছুরই ইতি ঘটেছে। যেন, শুধু স্বামীই ছেড়ে যায় নি, সেই সঙ্গে ছেড়ে গেছে তার শরীর ও মনের যাবতীয় অন্তঃসার। ঠিক যেমন করে হাতিতে খাওয়া কয়েত বেলের ভেতরের যাবতীয় সারবস্তু নিঃশেষে হজম হয়ে যায় সবার অজান্তে, পড়ে থাকে কেবল খোলাটি, একাদশী-পিসির শরীরখানা এখন তেমনই এক অন্তঃসারহীন খোলামাত্র। যেন একাদশী পিসির মনখানা এক স্বচ্ছ কাচের ঘরে বন্দী। যেন বাইরে থেকে মনখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন কনকপ্রভা। দেখতে দেখতে তাঁর বুকখানা সহসা টনটন করে ওঠে। একাদশী পিসির সঙ্গে নিজেকে এক আত্মার অংশ বলে মনে হয়।

'মাছ-মাংস খেতে ইচ্ছে করে তোমার, পিসি?' কনকপ্রভা খুব ভয়ে ভয়ে শুধোন, 'লোভ হয়?' এমনভাবে প্রশ্নটা করেন যেন এর জবাবের ওপরই তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

একাদশী পিসি পুনরায় ভেতর বাগে হাতড়াতে থাকে। ভাবে। বড়ই ইতস্তত করে। এক সময় বিড়বিড়িয়ে বলে, উঁসব চিজ্জের সুয়াদ একবার যে পেইয়েছে, সে কি ফের ভুলতে পারে, মা?' একাদশী পিসির গলায় স্বজন হারানোর হাহাকার। এমনভাবে বলে কথাগুলো, যেন মাছ-মাংসের স্বাদ এখনও অবধি লেগে রয়েছে তার জিভে, টাকরায়। যেন এই খানিক আগে মাছ-মাংস দিয়ে আহার সেরেছে। যেন এখনো শুঁকলে তার হাতের পাতায় আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাবে।

কনকপ্রভা শুধোন, 'এখন যদি তোমায় মাছ-মাংস দেওয়া হয়, খেতে পারবে, পিসি?'

কথাটা শোনামাত্র তৎক্ষণাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় একাদশী পিসি। যেন কানের ভেতর দিয়ে একান্ত প্রিয়জনের মরণ-আর্তনাদ শুনেছে সে। ভয়ে শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। সারা মুখ প্রবল ঘৃণায় বেঁকে যায়। যেন কনকপ্রভা এক বিষধর সাপ হাতে নিয়ে ক্রমাগত দোলাচ্ছেন তাঁর সুমুখে। যেন তক্ষুনি ছোবল মারবে সাপটা। আতঙ্কে উত্তেজনায় বুঝি সামান্য হাঁফাচ্ছিল একাদশী পিসি। গাঢ় সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় কনকপ্রভার দিকে। কোনও গতিকে জবাব দেয়, 'আর কি মুখে তোলা যায়, মা? ছি, ছি!'

'যদি খাও, কী হবে?'

ততক্ষণে বুঝি খানিকটা সামলে নিয়েছে একাদশী পিসি। সামান্য গুছিয়ে নিয়েছে বুঝি নিজেকে। খুব সরলপানা হাসি উছলে ওঠে মুখে। বলে, 'মনে লেয়, বমি কইর‍্যে ফেলাব।'

একাদশী পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কনকপ্রভা ওর মনের শেষ তল অবধি পৌঁছে যেতে পারেন। প্রিয়তম খাদ্যবস্তুগুলিকে পরিহার করবার জন্য কতখানি মানসিক কৃচ্ছ্রসাধন যে করতে হয়েছে তাকে, কতখানি ঘৃণা, বিবমিষা যে তিলতিল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হয়েছে, আর সেসব করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে কত কত রক্তাক্ত লড়াই যে চলেছে আজীবনকাল, কনকপ্রভার বুঝতে বাকি থাকে না। প্রিয় বস্তুটিকে ভুলে থাকতে তার প্রতি তীব্রতম ঘৃণা তৈরি করেছে একাদশী পিসি। সেই ঘৃণাটিকে বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে আজীবনকাল।

যেমনটা হয় জলাতঙ্ক রোগীদের ক্ষেত্রে। ভেতরে প্রবল তৃষ্ণা, অথচ জলপান করা প্রায় দুঃসাধ্য, এমন অবস্থায় জলের প্রতি রোগীর তৈরি হয় এক ধরনের আতঙ্ক। জাতক্রোধ। জল দেখলেই সে ভীত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

সিংহগড়ের ধন-দৌলত সম্পর্কেও তেমনই হয়েছে কনকপ্রভার। ধনদৌলত কে না ভোগ করতে চায়। কনকপ্রভার মনেও ভোগলিপ্সা কিছু কম ছিল না। কিন্তু কাকে নিয়েই বা ভোগ করবেন তিনি। প্রিয়ব্রত যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, তখনও কনকপ্রভা ছিলেন নিঃসঙ্গ, প্রিয়ব্রতর মৃত্যুর পরও তাই। এত এত সম্পদ, ভোগ করবার বাসনাও ষোলআনা, অথচ ভোগবিলাসের দরজাগুলিতে সব শক্ত খিল আঁটা। ধীরে ধীরে সিংহগড়ের যাবতীয় সম্পদের প্রতি তাঁর বিকর্ষণ বাড়তে থাকে। এক ধরনের ক্রোধও। নরম গদির বিছানা। কিন্তু কনকপ্রভার সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা। বিছানায় গা এলাতে গেলেই সে জ্বালা বেড়ে যায় বহুগুণ। অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় কনকপ্রভা একদিন প্রবল ক্রোধে বিছানাটাকে ছিঁড়ে ফর্দাফাই করতে শুরু করেন। তুলোগুলোকে দু'হাতে তুলে ধরে ছড়িয়ে দেন, উড়িয়ে দেন হাওয়ায়। সুখশয্যার প্রতি সমস্ত রকমের অনুরাগ হারিয়ে বসেন। শরীর ও মনের যাবতীয় বাসনার অতৃপ্তি, সে এক জ্বালা। আজীবনকাল তিলতিল নিঃসঙ্গতা, সে এক জ্বালা। সিংহগড়ের সোনার সিন্দুকে রমনীয় বন্দীত্ব, সে এক জ্বালা। সব জ্বালার উৎস হিসেবে সিংহগড়ের বৈভবকেই দায়ী করেন মনে মনে। দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেন। মনের মধ্যে জেগে ওঠে অপরাধীকে দণ্ড দেবার বাসনা। একদিন নিকুঞ্জপতিকে ডেকে বলেন, কিছু জমি বেচতে চাই। খদ্দের

দেখ। স্বামীর জেঠতুতো ভাই, সম্ভবত প্রিয়ব্রতর চেয়ে বয়েস সামান্য বেশিই হবে নিকুঞ্জপতির, কিন্তু তবুও, কোন্ এক রহস্যময় কারণে নিকুঞ্জপতি কনকপ্রভাকে বৌদি বলেই ডাকে। এবং প্রথম দিকে সম্বোধনহীন কথাবার্তা বললেও, ইদানীং কনকপ্রভা তাকে নিকুঞ্জ বলেই ডাকেন। কনকপ্রভার নির্দেশ পাওয়া মাত্র জমির খদ্দের জুটে গেল। হাতে এল নগদ পয়সা। কনকপ্রভা সেই অর্থ দু'হাতের মুঠো ভরে ছুঁড়তে লাগলেন আকাশের দিকে। আকাশ থেকে সে অর্থ ঝনঝনিয়ে নেমে এল মাটিতে। আর, আকাশ থেকে অর্থবৃষ্টি হচ্ছে, দেখা মাত্রই হরিরলুটের বাতাসা-কুড়ুনের দল দ্রুত ভিড় করল কনকপ্রভার চতুর্দিকে। খানাপিনা, ফি-সন্ধ্যায় জলসার আসর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর, খড়্গপুর, মেদিনীপুরে ফি-হপ্তায় সদলবলে সিনেমা দেখতে যাওয়া, হুটহাট দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়া, সে এক রাজকীয় সফর। অর্থের পাহাড় থেকে খাবলা খাবলা তুলে নিয়ে মুঠো মুঠো আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারা, চতুর্দিকে রূপবাণ স্তাবকের কলরব, এত এত মানুষের মধ্যে মক্ষীরাণীর মতো জীবনযাপন, শরীর ও মনের যাবতীয় জ্বালা এক অন্যতর মাত্রা পেয়ে যায়। প্রায় কটু নেশার পর্যায়ে পৌঁছে যায় ব্যাপারখানা। নেশার বস্তুটি সেবন করা মাত্র শরীরের যাবতীয় জ্বালা অস্থিরতা স্তিমিত হয়ে আসে। নেশাটি কেটে যাওয়া মাত্র পুনরায় শুরু হয় অস্বস্তি, অস্থিরতা, শরীরের কোষে কোষে চিনচিন ঝিনঝিন অনুভব। কাজেই পুনরায় ডাকতে হয় নিকুঞ্জপতিকে, এবং বলতে হয়, 'নিকুঞ্জ, বিঘা-কতক জমি বেচব। খইদ্দার দ্যাখ।'

নিজের মহলের মধ্যে আকণ্ঠ খানাপিনা, ফি-সন্ধ্যায় জলসার আসর, — কনকপ্রভা এসব শুরু করেছিলেন প্রিয়ব্রত বেঁচে থাকতেই। প্রিয়ব্রত তখন নিদারুণ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। অন্দরমহলের একতলার একটি ঘরে কেটে যেত তাঁর দিন, রাত। কনকপ্রভা তাবলে বন্ধ করেননি কোনকিছুই। প্রিয়ব্রতর নাকের ডগায় চলেছে সবকিছু। কনকপ্রভা হয়ত বা আশা করেছেন, একদিন প্রিয়ব্রত ক্ষেপে উঠবেন। হয়ত বা নির্মম গলায় বন্ধ করতে বলবেন ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা। কনকপ্রভা অপেক্ষা করেছেন সেই দিনটির তরে। কিন্তু সেই দিনটি আর আসে নি। প্রিয়ব্রত ফুঁসে ওঠেননি একদিনের তরেও। চোখে-মুখেও জানান দেননি নিজের অপছন্দের কথা। অথবা অসহায় ক্ষোভে করুণ হয়ে ওঠেনি ওঁর মুখমণ্ডল। পরম নিস্পৃহতায়, নিরাসক্তিতে কাটিয়ে দিয়েছেন দিনগুলি। আসলে, কনকপ্রভার মনে হয়, তাঁকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করবার এও এক তরিকা ছিল প্রিয়ব্রতর। তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডর থেকে সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে থাকা। এবং এতদ্বারা তাঁর উপস্থিতি এমন কি অস্তিত্বখানিকেই অস্বীকার করা। এই শীতল উপেক্ষাও এক কিসিমের জ্বালা।

প্রতাপলাল সিংহবাবু, যাদের সঙ্গে সিংহগড়ের আজীবনকাল বৈরিতা, মৃত্যু শয্যায় শুয়ে থাকতে থাকতে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন কনকপ্রভাকে। পাশটিতে বসিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলেছিলেন কতকিছু। মিনতি জানিয়েছিলেন কনকপ্রভাকে। নিজের সম্পত্তিকে এমনভাবে দু'হাতে, দু'পায়ে ছড়িয়ে দেবার পরিণতি ব্যাখ্যা করেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। কনকপ্রভা মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন সব কিছু। প্রতিবাদ করেন নি একতিল। কোনও প্রতিশ্রুতিও দেননি প্রতাপলালকে। বুকের তলা থেকে ঠেলে উঠতে চাইছিল অনেক কথা, অনেক ক্ষোভ। প্রকাশ করেননি কিছুই। অভিজ্ঞ প্রতাপলাল সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন

কনকপ্রভার মনের কথাগুলি। বলেছিলেন, তুয়ার নিজের জন্য নাই বা ভাবলি, তুয়ার হয়ত বা ধনদৌলতের প্রয়োজন ফুঁরাই গেছে, কিন্তু মেয়েটার কথা ভাব্। তুই অমন করে সব উড়াই দিলে মেয়াটার কী গতি হবেক। তুয়ার নিজের পেটের মেয়া, অন্যের ঘরে বাসন মাজছে, ইট্যা দেখতে ভাল লাগবেক তুয়ার? অপচয়ের ফলে সমুদ্দের বালিও ফুরাই যায়। এ আর কতটুকু সম্পত্তি।

কুন্তী ভেসে যাবে, এমন অনুভবে বুকের মধ্যে অবশ্যই টনটন করে ওঠে। প্রায় পিতৃহীন জীবন কাটিয়েছে মেয়েটি। হয়ত বা সেজন্য তারও বুকের মধ্যে দগদগ করছে কোনও দূরারোগ্য ক্ষত। নচেৎ, অত জেদী কেন ঐ মেয়ে, যখন খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে তখনও কেন ছলছল করে চোখদুটি? কেন কনকপ্রভার মতো কুন্তীও অষ্টপ্রহর ডুবে থাকতে চায় কলরবে? এসব তো এক জাতের অস্থিরতার লক্ষণ। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানুষ এমন অবিশ্রান্ত দৌড়তে চায়। আকণ্ঠ ডুব মারতে চায় নেশায়। কোনও এক জাতের নেশায়। এই একটিমাত্র ভাবনা কনকপ্রভাকে ভাবায়। প্রতাপলালের গড় থেকে ফিরে এসে বেশ ক'দিন থম মেরে বসে থাকেন কনকপ্রভা। বন্ধ থাকে পানভোজন, জলসা, ভ্রমণের রাজকীয় আয়োজন। সারা মহলখানা আষাঢ়ে খইয়ের মতো মিইয়ে থাকে। মৌলোভীদের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে।

কিন্তু কনকপ্রভার ঐ ভাববৈকল্য ছিল নিতান্তই সাময়িক। হপ্তা দুই যেতে না যেতেই তিনি নিকুঞ্জপতিকে কাছে ডাকেন, নিকুঞ্জ, একটা জমি বেচব। খইদ্দার দেখ।

নিমেষের মধ্যে ঢাকে কাঠি পড়ে। এবং সারা মহল জুড়ে চাউর হয়ে যায় কথাটা। গিন্নি মা ফের চাঙ্গা হয়েছেন। আবার ফিরে আসছে আগের জীবন। ফলে সকাল সকাল পুকুরে জাল পড়ে। পাঁঠা ঝোলে ছাল ছাড়ানোর অপেক্ষায়। পান্নালাল লোক পাঠিয়ে বিলাতি আনান বিষ্টুপুর থেকে। হাজাকগুলো ঝেড়েমুছে সাফ করা হয়। খবর পাঠানো হয় এলাকার সুরসিকদের কাছে। শতরঞ্চি, জাজিম, তাকিয়া রোদ্দুরে দেওয়া হয়। পুনরায় তেল মাখানো হয় গরুর গাড়ির ধুরিতে। বলদগুলোর শিং-এ তেল মাখানো হয়। গলায় ঘুঙুরের মালা পরানো হয়। শ্রাবণের মেঘ কেটে গিয়ে আবার ঝলমল রোদ্দুরে ভরে যায়, ভেসে যায় কনকপ্রভার গড়।

এত এত খানাপিনার আয়োজন, কনকপ্রভা কিন্তু ওসবের ভোক্তা নন কোন কালেই। মাছ-মাংস তিনি কবেই ছেড়েছেন। সবাই যখন মদ্যে-মাংসে ডুবে যায়, তিনি তখন একাদশী-পিসির রান্না করা নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন দিয়ে আহার সারেন।

এই আকণ্ঠ ভোগবিলাসের স্বাদ কনকপ্রভার বুকের গভীর অবধি পৌঁছায় না। আসলে, নিজের শরীর ও মনের যাবতীয় জ্বালা জুড়োচ্ছেন কনকপ্রভা। নিজের চারপাশ থেকে সম্পদের পাহাড়খানাকে দু'হাতে ঠেলে ঠেলে সরাচ্ছেন। বড়ই শ্রমসাধ্য সে প্রয়াস।

১০. সাম্প্রদায়িকতার দায়ভাগ

সুকুমার যখন মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে হরিবোল দাসের চায়ের দোকানে পৌঁছায় তখন দিনের আলো যায় যায়। চায়ের দোকানে যারা বসেছিল, মকবুলের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকায়। ইদানীং জয়কৃষ্ণপুর কলোনীর মধ্যে সুকুমারদের সংগঠন খুবই বেড়েছে। শুধু

এখানেই নয়, জেলার সর্বত্রই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব যথেষ্ট। মূলত দু'টো কারণে। এক, উদ্বাস্তুরা দেশভাগসহ তাদের যাবতীয় দুর্দশার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করে। কংগ্রেস বিরোধিতাকে তাই তারা এক ধরনের ব্রতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বাস্তবিক, সুকুমার এদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে, কংগ্রেস-নেতাদের প্রতি এদের কী অন্ধ রাগ, কী গভীর ঘৃণা। কম্যুনিস্ট পার্টি এই ঘৃণার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। উদ্বাস্তুদের নানান সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে। দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার প্রশ্নে কম্যুনিস্ট পার্টিই প্রবলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই সব কারণে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কম্যুনিস্টদের সর্বত্রই অখণ্ড আধিপত্য। ইদানীং উদ্বাস্তু কলোনীগুলি কম্যুনিস্টদের এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।

জয়কৃষ্ণপুরের চরে, যাবতীয় নলবন, শরবন কেটে সাফ করে যখন রাতারাতি গায়ের জোরে কলোনী বানিয়ে ফেলেছিল উদ্বাস্তুরা, পুরো এলাকার মানুষ এক ধরনের প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। পুরো এলাকার হাওয়া বেজায় এলোমেলো। উত্তপ্ত। ঘনঘন দিক বদলাচ্ছিল। গতি বদলাচ্ছিল। এমনটা এলাকার মানুষ কস্মিনকালেও দেখেনি। একটা নদীর নির্জন চর। নলবন শরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল। সাপ খোপ, হায়েনা-হুঁড়ার থাকত। সন্ধ্যে না নামতেই শেয়ালের দল সমবেতভাবে ডেকে উঠত। আচমকা একদল মানুষ এল। ঝড়ের বেগে শরবন কেটে সাবাড় করে ফেলল। দেখতে দেখতে এল দ্বিতীয় দল। তারা নিয়ে এল দড়ি, বাঁশ। ঝড়ের বেগে বানিয়ে ফেলল ঝুপড়ির ফ্রেম। ততক্ষণে খড়, তালপাতা, খেজুরপাতার বোঝা মাথায় নিয়ে তৃতীয় দল এসে হাজির। রাতভর জয়কৃষ্ণপুরের চরে দক্ষযজ্ঞ চলল। কিন্তু এতটাই নিঃশব্দে যে চার পাশের গাঁ ঘরের মানুষজন বুঝতেই পারেনি ঘুণাক্ষরে। যখন ভোরের আলো ফুটল, মানুষজন অপরিসীম বিস্ময়ে দেখল, পেছনে দ্বারকেশ্বরকে প্রেক্ষাপট করে একখানা ছবি আঁকা রয়েছে জয়কৃষ্ণপুরের চরে। কোনও নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা এক অতি উচ্চাঙ্গের ছবি। পেছনে বয়ে চলেছে দ্বারকেশ্বর, সামনের বিস্তীর্ণ চরায় সারিসারি ঝুপড়ি। রাতভর পরিশ্রমে ক্লান্ত মানুষগুলো ঝুপড়ির পাশাপাশি বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের শরীরে কালো হয়ে জমে গিয়েছে ঘাম। কিন্তু মুখমণ্ডলগুলির থেকে ঠিকরে পড়ছে সাফল্যের সুখ। দিনের প্রথম রোদ্দুর পড়েছে ওদের মুখে। ঝকঝক করছে মুখগুলি। বাস্তবিক, ছবি বলেই মনে হয়। অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। গতকাল দিনের আলো নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্ত অবধি যে জায়গাতে দুর্ভেদ্য শরবন দেখেছে সবাই, ভোরের আলো ফোটা মাত্রই সেই শরবন বেমালুম উধাও, সে জায়গায় পঞ্চাশখানি সারবন্দী ঘর। ভেল্কির খেলাতেও অতখানি সম্ভব নয়।

সেই দুপুরেই সুকুমার আচার্য বুনো মোষের মতো ঢুকে পড়েছিল সেই কলোনীতে। উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিল, তুমরা দেখালে বটে।

মানুষগুলো পিটপিট করে তাকায়। আগাপাশতলা দেখে সুকুমারকে। পরিমাপ করে। সন্দেহে কুতকুত করে চোখগুলি। এ দেশীয় মানুগুলো সম্পর্কে এদের পুরোনো অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। এ ক'বছরে স্রোতের টানে যে দিকেই ভেসে বেড়িয়েছে, স্থানীয় মানুষজনের কাছে এরা হয়েছে মূর্তিমান গলগ্রহ। আপদ। নিদারুণ শান্তিভঙ্গকারী। বিপজ্জনক। দু'চারটে

জবরদখলের ঘটনা ঘটে যেতেই 'গেল গেল' রব উঠেছিল চতুর্দিকে। বর্গীদের পর এবার বাঙাল আঁইছে দেশে। 'সামাল সামাল' রব তুলেছিল সবাই। বর্গীরা লুটপাট কইর্যে ফিরে গেছে, ইয়ারা ইখেনে থাইক্‌বেক। ছাতির উপর চিরকাল চাইপ্যে বুইস্যে রোম উপড়াবেক। দিন-দুপুরে চড়াও হবেক গিরস্তের ঘরে। বাস্তবিক, শতজনে দলবদ্ধ হয়ে একটা ব্যক্তিগত জমিনকে জবরদস্তি দখল করে নেওয়া, এই তল্লাটের মানুষ বাপের জন্মে এমন দৃশ্য দেখেনি। মানুষজন ভয় পেয়ে গিয়েছিল নিদারুণ। তাদের চো'খে বর্গীদের লুটপাটের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল এটা। কিংবা তার চেয়েও বেশি। চরটা ছিল অযোধ্যার চাটুজ্জাদের। তাদের কানে খবরটা পৌঁছনোমাত্রই ব্যাপারটা সংঘাতের রূপ নিয়েছিল। জনা দশ-বারো লগদিসহ ছুটে এসেছিলেন গোমস্তাবাবু স্বয়ং। কিন্তু উদ্বাস্তুরা তখন এককাট্টা, মরিয়া। একেবারে রুদ্ররূপ ধরেছিল ওরা। হাতের মুঠায় জানখানি লিয়া দেশ ছারছি আমরা। মরণের ভয় নাই আমাগো। হয় জান লিব, নয় দিব। ওদের এককাট্টা মরিয়া ভাব দেখে আর এগোবার ভরসা পায় নি লগদির দল। পুরো ঘটনাটা ফিরে গিয়ে জানিয়েছিল নরনারায়ণ চাটুজ্জাকে। নরনারায়ণ তৎক্ষণাৎ দৌড়েছিলেন বিষ্ণুপুরে। সমস্ত ঘটনা বিতাং করে বলেছিলেন অন্নদা চক্রবর্তী আর কামেশ্বর হাজরাকে। শুনেটুনে অনেকক্ষণ গুম মেরে বসেছিলেন ওঁরা। অবশেষে একান্তে বলেছিলেন, আমরা উয়াদ্যার ব্যবস্থা লিচ্ছি। প্ল্যান-কষা চলছে। অন্য মুলুকে পাঠান হবেক উয়াদ্যারকে। ক'দিন ধৈর্য ধর। আর খুব হৈ-চৈ না করে শালাদ্যার মেরে তাড়াতে পার কিনা দ্যাখ। কিন্তু মনে থাকে যেন, হৈ-চৈ করা চলবেক নাই। কেন কি, তুমি এলাকার পাঁড়-কংগ্রেসী। সবাই ভাববেক কংগ্রেসীরা উদ্বাস্তুদের মারছে।

অন্নদা চক্রবর্তী আর কামেশ্বর হাজরার কথাগুলো নরনারায়ণের জমিদারি রক্তে ঈষৎ আগুন ছুঁইয়ে দেয়। লাঠির ডগায় কত প্রজার জমিতে দখল কায়েম করেছেন তিনি এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা। জমি দখলের জন্য বলপ্রয়োগ তাঁদের রক্তে। কিন্তু ঐ একটা রশিতে বাঁধা পড়ে গেছেন নরনারায়ণ। হৈ-চৈ বাধানো চলবে না। এ নিয়ে কোনও সোরগোল যেন না ওঠে। তবে সে রশিকে ঢিলে করবার উপায়ও অজানা নেই নরনারায়ণের। শুকনো খড় আর তালপাতার ঝুপড়ি, রাতের অন্ধকারে একটা মাত্র দেশলাই কাঠির মামলা। সকালের আলো ফুটলে সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখবে, পঞ্চাশটি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই। পরিকল্পনা মতো নিঃশব্দে এগোচ্ছিলেন নরনারায়ণ। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সুকুমারের কাছে ফাঁস হয়ে যায় কথাটা। কালো বাউরির বেটা মেথর বাউরি, এলাকার পাক্কা সিঁদেল চোর সে, যথারীতি রাত গাঢ় হলে পর গায়ে তেলকালি মেখেটেখে রওনা দিয়েছিল মৃগয়ায়। বিশ্বস্ত জনা দুই লগদিকে নিয়ে নরনারায়নের গোমস্তা তখন গুটিগুটি এগোচ্ছিলেন অকুস্থলের দিকে। হাতে ছিল নেভানো মশাল। গুনগুনিয়ে কথা বলছিল ওরা। ঝোপের আড়াল থেকে দু'চারটে কথা কানে আসতেই বাকিটা বুঝতে কষ্ট হয় না মেথরের। এ দুনিয়ায় যতই গোপনীয়তা রক্ষা করা হোক, চোর আর লম্পটের চোখ এড়ানো কঠিন। সিঁধকাঠি কোমরে গুঁজে নিয়ে মেথর বাউরি দৌড় লাগায় সুকুমারের ঘরের দিকে। সেই রাতে চারপাশের বাউরি-বাগদি পাড়া থেকে শতাধিক লোক জুটিয়ে সুকুমার নিঃশব্দে ঘিরে ফেলে পুরো কলোনীটাকে। মধ্যরাতে

নরনারায়ণের লোকজনেরা আসামাত্রই ধরা পড়ে যায় হাতে নাতে। দু'চার ঘা পিঠে পড়তেই সবকিছু ফাঁস করে দেয় ওরা। মুহূর্তে চতুর্দিকে চাউর হয়ে যায় সে খবর। বিষ্টুপুরের নেতাদের কাছেও পৌঁছে যায় তা। সেই থেকে প্রতিরাতে সুকুমারের লোকজন কলোনীটাকে ঘিরে রাখে। শুরু হয়ে যায় রাত-পাহারা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সুকুমার ঐ ছিন্নমূল মানুষগুলোর অতি আপনার জন হয়ে ওঠে।

জয়কৃষ্ণপুরের চরে উদ্বাস্তুদের কলোনী স্থাপন এতদঞ্চলের মানুষের কাছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জমিদারদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই পর্ব তো চলছিলই। পাশাপাশি শুরু হয় এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট। চারপাশের মানুষজন ওদের ভুলভুল চোখে দেখতে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীখ করে ওদের বেশ ভুষা, হাঁটাচলা, খাবার-খাদ্য, কথাবার্তা। কোন্ মুলুকের মানুষ এরা। কত ঘাটের জল খেয়ে এই মুলুকে এসে শিকড় পুঁতল। এদের অনেক কিছুর সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের গরমিল। এদের ভাষা স্বতন্ত্র। বোঝা দায়। ওল, কচু, শুটকি মাছের যম। এদের গান স্বতন্ত্র, নাচ স্বতন্ত্র, পিঠে-পুলি স্বতন্ত্র, পূজা-পার্বন স্বতন্ত্র। রাঢ়ের মানুষের অপর্যাপ্ত মুড়ি খাওয়া দেখে এরা হাসাহাসি করে। রাঢ়ের টুশু, ভাদু, পাতালাচ, মনসার ঝাঁপান, ইদপরব, পুন্যিপুকুর, ভাসুর-বুয়াসিনি এদের মনে কোনও অনুরণনই তোলে না। পৃথিবীর কোনও দেশেই আশ্রিতরা কখনই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে না। করলেও পায় না। কাজেই রাঢ়ের মানুষ এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের হেয়জ্ঞান করতে শুরু করে। ওরা বাঙাল। বাঙাল মনুষ্য লয়, উড়িয়া এক জন্তু/ গাছে গাছে লাফ মারে, ল্যাজ নাই কিন্তু। ওরা ছড়া বাঁধে বাঙালদের নিয়ে। সুর করে গায়, বাঙাল কান্দেরে — বাঙাল কান্দে/ আজ উয়াদ্যার কিছু নাই লোটাকম্বল কাঁধে। রাঢ়ের মানুষ ওদের নিঃসম্বল অবস্থায় দেখেছে। ওরা বিশ্বাসই করে না যে এই মানুষগুলোরও এককালে ঘরদোর ছিল, পুকুর-বাগান ছিল। তাই, ওরা যখন ওদের সোনার দেশের গল্প শোনায়, সাজানো গোছানো সংসারের কথা কয়, সম্পত্তির তালিকা পেশ করে, রাঢ়ের মানুষ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। জয়কৃষ্ণপুর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হল যে সব উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়ে, তারা সারাক্ষণ এদেশীয় সহপাঠীদের উপহাসের পাত্র হয়ে যায়। আমাগো কী নাই সিলো? গোয়াল ভরা গরু সিলো, পুকুরভরা মাছ সিলো, গোলাভরা ধান সিলো। নারকোল গাছে নারকোল, সুপারি গাছে সুপারি....। উপহাস করতে গিয়ে কথাগুলোকে অদলবদল করে আউড়ায় এদেশীয় বাচ্চারা। আমাগো কী নাই সিলো? গোয়াল ভরা মাছ সিলো, গোলাভরা গরু সিলো, পুকুর ভরা ধান সিলো। নারকোল গাছে সুপারি ফলতো। বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ে বাচ্চার দল। বয়স্করা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বলে, তোমরা প্রত্যেকে সম্পত্তির যা হিসাব পেশ কর, একত্র কইর্‌লে গোটা ভারতবর্ষের থিক্যেও বেশি হইয়ে যাবেক। স্কুলের বাচ্চারা, এমন কি মাস্টাররাও ওদের ভাষা নিয়ে টিটকিরি করে সারাক্ষণ। ওরা যে 'র' আর 'ড়' কে উল্টোভাবে ব্যবহার করে তাই নিয়ে সারাক্ষণ ভেঙায়। আমার একটা ঘড় আছে, ভারা লিবি? হাতে ফুলের তোরা লিয়ে, কুথাকে যাচ্ছু তোড়া? বিপন্ন মানুষগুলো সব নিঃশব্দে হজম করে।

সুকুমার এদের সঙ্গে মিশে দেখেছে, মানুষগুলো খারাপ নয়। বরং এদেশীয় মানুষের

চিন্তাচেতনার থেকে অনেকখানি এগিয়ে। বাঁশের বেড়া আর খড়-পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরগুলিকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে। মজুর খেটে দিন-গুজরান করলেও ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠায়। চারপাশের মানুষজনদের আপদে-বিপদে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে। কেবল, মুসলমানদের ওপর ওদের সীমাহীন জাতক্রোধ। মুসলমানদের সহ্য করতে পারে না, বিশ্বাসও করে না। সেই কারণেই মকবুল যখন সুকুমারের সঙ্গে কলোনীতে ঢুকেছিল, ওরা কেউ ভাল চোখে দেখে নি ওকে। এখনও দেখে না। বরং, এখন, এলাকার মাটিতে শক্তপোক্ত শিকড় চারানোর পর, ওরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের সঙ্গে টক্কর দিতে যায়। সুকুমার ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে, সব মুসলমানই খারাপ নয়। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষই ওদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে হামলাবাজ বানিয়েছে। আর, পরিকল্পিতভাবে ক্ষেপিয়ে তুললে সাধারণ মানুষও হামলাবাজ হয়ে ওঠে। সুকুমার এক বছর ধরে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে এদের সদ্‌ভাব তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফল পেয়েছে যৎসামান্য। আসলে, নিজেদের এই অপরিসীম দুর্দশার জন্য কিছু হটকারী মানুষকে নয়, একটা ধর্মকেই এরা অপরাধী বানিয়ে ফেলেছে। সুকুমারকে ওরা প্রাণের অধিক ভালবাসে। কিন্তু তাদের একটাই ক্ষোভ, সারাক্ষণ একটা 'মোস্‌লা'কে লিয়ে ঘোরে কেন মানুষটা। সুকুমার এদের বোঝাতে বসে। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে সে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেকার তিক্ততার উৎস সন্ধানে রত হয়। বলে, ধর, আজ যদি পূর্ববাংলার মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়, তার জন্য কি হিন্দুরা কোনও অংশেই দায়ী নয়? মানুষগুলো ফুঁসে ওঠে, হিন্দুদের দোষ কি? সুকুমার বলে, বারোআনা দোষ তো হিন্দুদেরই।

—কেমন করে?

সুকুমার বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে। সেই প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের কঠোর জাতি-বর্ণ প্রথা, শ্রমজীবী মানুষকে শুদ্র আখ্যা দিয়ে পায়ের তলায় ফেলে রাখার ইতিহাস, সব কিছু বিতাং করে বলে। শোনায় মনু-সংহিতার কঠোর, অপমানজনক নিয়মগুলির কথা। শোনায় অস্পৃশ্যতা নামক মানবসভ্যতার পক্ষে লজ্জাকর ব্যবস্থার কথা। বলে, মানুষ মানুষকে ছুঁয়ে ফেললেই তার জাত যায়, নিচুজাতের ছায়া মাড়ানোও পাপ, তাদের মন্দিরের ধারে-কাছে পৌঁছোনোর অধিকার নেই, — এসব নিয়ম কে চালু করেছিল এই সমাজে? দক্ষিণ ভারতে 'পারিয়া' নামে এক সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। যাতে উচ্চবর্ণের মানুষরা ভুলক্রমে তাদের ছায়া মাড়িয়ে না ফেলে সেই জন্য এখনো অবধি তাদের গলায় ঘণ্টি বেঁধে ঘুরতে হয়। মানুষকে এতখানি ঘৃণা করতে হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কেউ শেখায়নি। হিন্দুধর্মের জুলুম-নিপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাজারে হাজারে ব্রাত্য মানুষ একদিন বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। একদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধদের ওপরও চড়াও হল। শয়ে শয়ে বৌদ্ধ মারা পড়ল। বৌদ্ধমন্দিরগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বৌদ্ধদের একটা বড় অংশ মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিল সেদিন। আচ্ছা বল তো, সুকুমার আলগোছে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়, এই যে মকবুল, মুসলমান, কোথা থিকে আইল্যাক উ? ইরান থিকে, নাকি বাগদাদ থিক্যে? মকবুলের দিকে সস্নেহে তাকায় সুকুমার, এদেশেরই মানুষ ও। এক সময় উয়ার

পূর্বপুরুষরা হিন্দুই তো ছিল্যাক, লচেৎ বৌদ্ধ। উচ্চবর্ণের হিন্দুদ্যার থিকে প্রাণ বাঁচাতে মুসলমান হয়ে গিয়েছে উয়ারা। কার দোষ? কে উয়াদ্যার অন্য ধর্মের দিকে ঠেলে দিল্যাক?

মানুষগুলি মনোযোগ সহকারে শুনছিল। সুকুমার পুনরায় শুরু করে, আবার দ্যাখ, মুসলমান হইয়েও তো উয়াদ্যার কপালে মান-সন্‌মান জুটল্যাক নাই। হিন্দুপ্রধান দেশে, উয়ারা সেই আগের মতনই অস্পৃশ্য থাইক্যে গেল্যাক। বুকে হাত দিয়ে বল ত, পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন তুমরা, তুমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষ, মুসলমানকে জন্তু-জানোয়ারের থিক্যেও বেশি ঘৃণা কইর্‌তে কিনা? উয়ারা দুয়ারে উঠলে গোময় দিয়ে সারা ঘরদোর নিকাতে কিনা? উয়ারা জল মাগলে মাটির সরায় জল দিতে কিনা? এইসব অপমান উয়ারা দিনের পর দিন মুখ বুঁজে সয়েছে। ভাব ইবার, তুমাদ্যার সম্পর্কে উয়াদ্যার মনোভাব কী হইতে পারে?

—উয়ারা যে গরু খায়। পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে।

—চিরকাল তো গরু খেতো নাই উয়ারা। যখন নিচুজাতের হিন্দু ছিল, বৌদ্ধ ছিল, তখন কি গরু খেত? তখনও উঁচু জাতের হিন্দুরা উয়াদ্যার ছায়া মাড়াত নাই ক্যানে? বল? তাছাড়া, উয়ারা উয়াদ্যার খাদ্য খায়, তুমরা তুমাদ্যার খাদ্য খাও। উয়াদ্যার খাদ্য তুমাদ্যার পসন্দ নাও হইতে পারে। তা বলে অতখানি ঘৃণা মানুষ কখনো মানুষকে করে? দুনিয়ার কত জাত আছে, কত কিসিমের খাদ্য উঁচু জাতের মানুষদের কেউ কুত্তা খায়, বিলাই খায়, সাপ খায়, আশশুলা খায়, পিঁপড়া খায়, বাঁদর খায়। যার যা রুচি। যে যা খায় না, সে অপরকে ঘৃণা কইর্‌বেক? উয়ারা গরু খায়, আমাদের ধর্মে গরু খাওয়া নিষেধ। আমরা যে কাছিম খাই, যা উয়াদ্যার ধর্মে নিষেধ। আসলে, মানুষকে ঘৃণা কইর্‌বার শিক্ষা যে সমাজপতিরা দিয়েছিল্যাক, উয়ারা বুঝে নাই, ঘৃণা সইতে সইতে অপরপক্ষও সুযোগমতো উয়ার বদলা লিতে পারে। খুব খাটো গলায় স্বগতোক্তি করে সুকুমার, অন্যকে ঘৃণা কইর্‌বার মাশুল হিন্দুদ্যার আরও বহুৎ দিন দিতে হব্যেক। এর পর সুকুমার ব্যাখ্যা করতে থাকে, মানুষকে পায়ের তলায় রাখবার অর্থনৈতিক কারণগুলি। উঁচুজাতের মানুষদের তখন জানোয়ার-তুল্য অবোধ শ্রমজীবীর দরকার ছিল সমাজে। উয়াদের মানুষের মতন সন্‌মান দিলে উচ্চবর্ণের সুখের তরে খাইট্‌ত কে? উঁয়াদ্যার লেগে চাষবাস কইর্‌থ কে? কাপড়চুপোড় কাচতো কে? নখ-চুল কাটত কে? মলমূত্র সাফ কইর্‌ত কে? পাথর ভাঙত কে? পালকি বইত কে?

—মুসলমানরা তুমাদ্যার উপর জুলুম করেছে। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। সুকুমার এভাবেই আলোচনায় ইতি টানে, কিন্তু তুমরা অর্থাৎ কিনা আমরা, হিন্দুরা, উয়াদ্যার উপর যে কত যুগ ধরে জুলুম কচ্ছি, তার বেলায়? তুমাদ্যার উপর জুলুম হয়্যেছে বলে তুমরা বদলা লিবার সুযোগ খুঁজছ। উয়াদ্যার উপর যে বংশাণুক্রমে জুলুম হইয়েছে, উয়ারা তার বদলা লিব্যাক নাই ক্যানে? বল?

—আমার কথায় দোষ লিও নাই। উঠে দাঁড়ায় সুকুমার, ভাবছ, মুসলমানদের পক্ষ লিয়ে বলছি। কিন্তু আমার কথাগুলান পারলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো।

হরিবোল দাসের চায়ের দোকানে বসে এসব কথাই ভাবছিল সুকুমার। এক নাগাড়ে বোঝাতে বোঝাতে সে হয়ত বা উদ্বাস্তুদের উদ্গত রোষকে কিছুটা লঘু করতে পেরেছে।

কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে ওদের বিরূপতাকে ষোলআনা নির্মূল করতে পারেনি। এখনও মকবুলকে ওরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

হরিবোল দাসের দিকে তাকায় সুকুমার, কুথা গো হরি দা, আইজ চা খাবাবে কি লয়?

হরিবোল দাস ফোকলা মুখে সরলপানা হাসে। পরিপাটি করে চা বানিয়ে ধরে দেয় সুকুমারের সামনে। তারপর, দোকানের এক কোণে যে একখানা কাচের গেলাস আলাদা করে রাখা ছিল, উঠোনে গিয়ে ধুতে বসে গেলাসখানা। সুকুমার এবং মকবুল বুঝে ফেলে, মকবুলের জন্য আলাদা একখানা গেলাস সরিয়ে রেখেছে হরিবোল দাস। এবার আলাদা চা বানিয়ে মকবুলকে দেবে। ঐনিয়ে খুব ঝঞ্ঝাট হয়েছিল প্রথম দিকে। মকবুলকে চা দেওয়া তো দূরের কথা, অন্যদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসতেও দিত না হরিবোল দাস। দেখতে দেখতে একদিন ক্ষেপে উঠেছিল সুকুমার। সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, মকবুলের ঠাঁই না হলে আমিও আর আইস্‌ব নাই তুমার দোকানে। হরিবোল দাস খুব অসহায় চোখে তাকিয়েছিল। সুকুমার সেদিন খুবই ক্ষেপে ছিল। গলা চড়িয়ে বলেছিল, তুমি তো জাতে বোষ্টম। আসল জাতটা কি বটে? হরিবোল দাস অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলেছিল, কৈবর্ত।

— তো, আমি তো বামুনের ছেইলা। কৈবর্তের হাতে চা খাব ক্যানে বটে? তুমি তো আমার চোখে লিচু জাত।

—আমি আইজ্ঞা অখন বোষ্টম। বোষ্টমের জাত নাই।

— বটে, বটে! খুব ত বোষ্টম বোষ্টম কচ্ছ, তুমাদ্যার ধর্মের মূল কথাটি তো আজ অবধি জান নাই হে। বোষ্টম ধর্মের মূল কথাটি হইল্যাক, মাইন্‌ষের কুনো জাত নাই। সব মানুষই সমান। তুমাদ্যার অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কতগুলি মুসলমান চেলা ছিল, জান? কত হাড়ি, ডোম, চামার, যবন লিয়ে তিনি থাইক্‌তেন। কেবল গলায় কণ্ঠিমালা পইর্‌লেই কী আর বোষ্টম হওয়া যায়। খুলে ফেল উই মালা। ফের মাছ ধইর্‌বার কাজে নাম তুমি। সুকুমার যে খুবই রেগে গিয়েছে সেটা বুঝতে কোনই অসুবিধে হয়নি হরিবোল দাসের। খুব অসহায় চোখে তাকিয়েছিল সে। দোকান ফাঁকা হলে পর একান্তে বলেছিল, কী করুম আচায্যি দা, মকবুল্‌রে চা দিলে অরা কেউ আমার দোকানের পা দিব না। ছা-ছাওয়াল্‌রে খাবামু কি,?

হরিবোল দাসের সঙ্কটের কথাটা সুকুমার উপলব্ধি করেছিল। ঐ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেনি তখন। ধীরে ধীরে কলোনীর মধ্যে সংগঠনটা বাড়িয়েছে। পার্টির মেম্বার হয়েছে অনেকেই। পার্টিক্লাসে মার্কসবাদ পড়েছে। কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশন্যালের পাঠ নিয়েছে। এখন অনেকের মধ্যেই জাতের বাতিকটা কমেছে। তবুও হরিবোল দাস পুরোপুরি সাহস পায়নি। এখনও মকবুল পৃথক বেঞ্চিতে বসে। পৃথক গেলাসে চা খায়।

সুকুমার মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে বলে, শুধু একটা কথা স্মরণে রাইখো। এই মকবুল নামের ছেইলাটা তুমাদ্যার পাশ যত অপমান সইছে, সব উয়ার বুকের মধ্যে জইম্‌ছে। বটে কিনা? ত, যদি কুনোদিন সুযোগ পায়, এর বদলা লিব্যাক নাই? সুকুমার মকবুলের দিকে মুখ ফেরায়, কী রে মকবুল, লিবি নাই?

মকবুল নিঃশব্দে হাসে। হাসতেই থাকে।

চায়ে চুমুক দিচ্ছিল বটে সুকুমার, তবে চায়ে তার মন ছিল না। সে ইতিউতি তাকাচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে একজনকে আশা করছিল মনে মনে। একটা জরুরি খবর নিয়ে আসবে সে। খবরটার ওপর এই এলাকায় পার্টির অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

১১. রাঢ়ের আকশে ডোমচিল

ধন্য রাজার পুণ্যদেশ, যদি বরষে মাঘের শেষ। শাস্ত্রের বচন। রাঢ়ভূমিতে এ বছর বৃষ্টি হয়নি মাঘ মাসে। ফাগুনেও না। চৈত্র-বৈশাখেও না। কালবোশেখীর ঝড় হয়েছিল বারকয়। ধুলুণ্ডি-ঝড় উঠেছিল চতুর্দিকে। কিছু বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রতিদানে দু'ফোঁটাও ঝরিয়ে যায় নি। ফাগুনের শেষ থেকে ঝাঁঝরা বুকে ধুঁকছে সমগ্র রাঢ়। ফলে, রাঢ়ের কল্লাচ মাটি তেতে পুড়ে লোহা। টাঁড় মাটি ফেটে যাচ্ছে দ্রুত, বিশাল বিশাল ফাটল হচ্ছে জমিনে। মাকড়া পাথর পুড়তে পুড়তে গনগনে আগুনের মতো লাল। ইদানীং ডাঙা-ডিহিগুলো দিনভর নিঃশব্দে আগুন গিলতে থাকে। দিগন্তের গায়ে গায়ে বিস্তীর্ণ শাল জঙ্গল পাংশু, ম্রীয়মান। শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে এই মধ্য আষাঢ়ে। বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে গাছ-গাছালির সাবেক রঙ। বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে লালচে রঙ ধরেছে এখনই।

সারা তল্লাটে পুকুরের সংখ্যা নিতান্তই কম। যাও বা দু'চারটে রয়েছে, শুকিয়ে কাঠ। কিংবা তলানিতে কাদাকাদা জল। চুয়ামসিনার হাজরা দীঘিতে মাত্র দু'তিন হাত জল। এমন কি পদম দীঘিতেও বড় জোর এক কোমর। কুঁয়াগুলোতে জল নাবতে শুরু করেছিল মাঘ-ফাগুন থেকে। এখন তাদের অধিকাংশই শুকিয়ে কাঠ। কোন-কোনটায় ঘোলাটে জল রয়েছে সেই পাতালের কাছাকাছি। হরিণমুড়ির দু'ধারে ধু-ধু বালির চড়া। মাঝ বরাবর সরু সুতোর মতো চিকন ধারা। নদীটা এই মধ্য আষাঢ়ে মরা সাপের মতো শুয়ে রয়েছে নিশ্চুপ। কেবল দ্বারকেশ্বরের মাঝবরাবর সঙ্কীর্ণ জলের স্রোত। বাঁকটাকের দ'গুলোতে হাঁটু কিংবা কোমর প্রমাণ। অত বড় নদী, সেও ধুঁকতে লেগেছে। তারও দু'চোখে মৃত্যুভয়, মুমূর্ষু রোগীর মতো ধুকপুক করছে বুক, তারও। ভয়-তাড়াসে মরে, যে কোনও মুহূর্তে থেমে যেতে পারে ধুকপুকানি। দু'পাশের বিস্তীর্ণ বালির চরার বুকে জলের ঢেউয়ের একদা-কারুকার্য আজও স্পষ্ট। কোনও অতীত দিনের পুরাকীর্তি বলে মনে হয়। একদিন টলটলে জলে ভরে ছিল এই বালির বুক.... আহ্লাদি ঢেউ আছড়ে পড়ছিল ছলাৎ ছলাৎ....আজও সেই চিহ্ন, জলের চিহ্ন, ভাবলেও আশায় আশায় বুক ভরে আসে, তৃষ্ণা বেড়ে যায়।

সকাল না হতেই দু'পাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে মেয়ে, বউড়ি-ঝিউড়ি, প্রশস্ত বালির চর বরাবর সারবন্দী হেঁটে আসে। জলের ক্ষীণ ধারাটির আশেপাশে বসে, প্রাণপণে বালি সরিয়ে উনুই খোঁড়ে। সারাদিন চলে এই মিছিল। দূরদূরান্ত থেকে আসছে মানুষ। তাদের আসতে একবেলা যায়, ফিরতে একবেলা। আসে গরু-মোষের দল জল খেতে। সারাদিন ঐ অগভীর জলের স্রোতে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে চান করে কত মানুষ। কাপড় কাচে।

বেলা বাড়তে থাকে। রাঢ়ের লালচে কল্লাচ মাটি তেতে পুড়ে গনগনে, গাঢ় লাল হতে থাকে। টাঁড় মাটির বুক থেকে শেষ রসটুকু চুষে নিয়ে আকাশে উঠে যায় গরম হাওয়া। আগুনের পাখি হয়ে ভাসতে থাকে আকাশে। ধীরে ধীরে চারপাশের মাটি, জঙ্গল, হাওয়া,

আকাশ, সবকিছুর রঙ বদলাতে থাকে দ্রুত। ধরিত্রী ক্রমশ নিদয়া হতে থাকে। রুদ্ররূপ ধরে সমগ্র প্রকৃতি। সারা এলাকায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে বুদ্ধদেব দেখতে পায় প্রকৃতির এই চণ্ডরূপ। যেদিকে, যতদূর দৃষ্টি যায়, যেন একটা বিশাল, ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড চলছে সর্বত্র। বুদ্ধদেব এমনটা দেখেনি। তাদের কাঁথি মুলুকে প্রকৃতির মুখে অতখানি রোষ, রূঢ়তা নেই। সেখানে প্রকৃতি অনেক স্নেহময়ী।

চৈত্র অবধি রাঢ়ের আকাশে শঙ্খচিল উড়েছে। দিনভর করুণ স্বরে কেঁদে বেড়িয়েছে ওরা। মানুষের জন্য, পৃথিবীর প্রতিটি পশুপ্রাণী, বৃক্ষলতার জন্য আকাশের কাছে জল ভিক্ষা করেছে। এখন গনগনে আকাশের বুকে চিলেরাও ওড়ে না। উড়তে পারে না। বিষ্টুপুর শহরের কাছে, কোচবিড়াইয়ের পাড়ে ঝাঁকড়া কুসুমগাছের তলায় ধর্মরাজের পূজা চলছে সাড়ম্বরে। পূজা চলছে রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র। বৃষ্টির প্রার্থনায় রাঢ়ের মানুষ মোরগ বলি দিচ্ছে শয়ে শয়ে। উষ্ণ তাজা রক্ত রাঢ়ের টাঁড় মাটিতে পড়বার আগেই শুকিয়ে কালচে হয়ে যাচ্ছে।

রাঢ়ের মানুষ ধুঁকছে। আর্তনাদ তুলেছে। মরণ আর্তনাদ।

পুবের দেশে নাকি বৃষ্টি হয়েছে সামান্য। চাষের কাজ কিছু কিছু নাকি চলছে। কাজের আশায় আদিবাসী মজুর কামিনের দল কাতারে কাতারে পাড়ি দিচ্ছে নাবালের দিকে। প্রতিদিন। নাবাল মজুর নাবাল চল হে..../নাবাল ছাড়া বাঁচা দায়/রাঢ় পুইড়ছে, টাঁড় পুইড়ছে/খরার চোটে পরাণ যায় হে....। হুগলি আর বর্ধমান যাওয়ার পীচ রাস্তাগুলোর দু'ধারে দিনভর শয়ে শয়ে মজুর-কামিন বোঁচকা-বুচকি লটপহর নিয়ে তীর্থের কাকের মতো ক্ষণ গুনছে বাসের আশায়। চূড়া অবধি ঠাস বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে একের পর এক বাস। তবুও বাসস্ট্যাণ্ডগুলোতে মজুরদের ভিড় যেন কমে না।

বৈদ্যার রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরের সামনের প্রশস্ত নাটমণ্ডপে আড্ডা-মজলিশ লেগে থাকে বারোমাস। দুনিয়ার হেন প্রসঙ্গ নেই যা নিয়ে রগড় বাধে না সেখানে। উনপঞ্চাশের বন্যা, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ এবং ঐ সময়কালে চলতে থাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলিকে স্মৃতি থেকে উগরে দেয় মুরুব্বিরা, উনিশশো চার-পাঁচ নাগাদ হরিণমুড়িতে পুল তৈরি হল, পাঁচের দশকে বাস চলল সোনামুখী থেকে বিষ্টুপুর অবধি মোরাম রাস্তায়। দ্বারকেশ্বরে ফেয়ার-ওয়েদার ব্রীজ হল। বিষ্টুপুরের সমুদয় গোয়ালা ব্রাহ্মণ হওয়ার বাসনায় যজ্ঞ করে পৈতে পরল, মণমণ ঘি পুড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল আকাশে....। টকি বসল জয়রামপুরের ডাঙায়। সে এক অব্বাক কাণ্ড। পর্দার ওপর ছবিগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়, গান গায়, কথা কয়, কাঁদে হাসে, যুদ্ধ করে....। ডাঙা জুড়ে শীতের মরসুমে বিশাল তিরপলের তাঁবু। একের পর এক পৌরাণিক পালা চলছে। চারপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে চলেছে টকি দেখতে। আর ফিরে এসে, দু'চোখ আকাশে তুলে গল্প করছে, হা দ্যাখ, ঠাকুর-দ্যাবতা মাইনষের পারা কথা বইলছে গ'। দেইখ্যে এল্যম জয়রামপুরের ডাঙায়। মা-কালী হাঁটাচলা কইচ্ছে মাইনষের পারা। সিংহবাহিনী অসুর ·নিধন কচ্ছে। আর, পাকার থাম ফাঁটাই রার হইয়েঁ আইল্যাক নৃসিংহ অবতার। হিরণ্যকশিপুকে আঁচড়াই-কামড়াই...। শুনে তাক লেগে যায় মানুষজনের। টকি দেখতে যাওয়ার ধুম পড়ে যায়। তিনআনার টিকিটে মেঝের ওপর খড়ের আসন। আটআনায়

বেঞ্চি। খড়ের আসনই বারো আনা। সিংহগড়ের বুড়াবাবু, তখনও অবধি অতখানি অথর্ব হননি। একদিন গিয়েছিলেন টকি দেখতে। গরুর গাড়িতে চড়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে গিয়েছিল বসবার চেয়ার, কুঁজোর জল, হাত পাখা। সারাক্ষণ পেছনটিতে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছিল পাগল শিকারির বউ, সারো। অধর ঝারমুনিয়া সুযোগমতো ঢুকে পড়েছিল টকি কোম্পানীতে। গেট কিপারের অ্যাসিস্টেন্ট। গেট-কিপার টিকিট চেক করছে, সেই ফাঁকে যাতে উটকো লোক টিকিট বিহনে ঢুকে পড়তে না পারে সেটা দেখাই ছিল ওর কাজ। অধর চালু আদমি, এক আনা নগদ আদায় করে নিত সকালে। তারপর গেট কিপারের চোখ এড়িয়ে প্রতি শো'তে চার-পাঁচ জনকে ঢুকিয়ে দিত তিনআনার গেট দিয়ে। এতে করে মাইনে বাদেও কিছু বাড়তি পয়সা আসত ওর। বুদ্ধিটা ওকে কেউ শেখায় নি। মগজ খাটিয়ে বের করেছে সে নিজেই। বৈদ্যার পঞ্চু ধল্ল, বেশ কয়েকবার অধরের সঙ্গে সাঁট করে টকি দেখে এসেছে এক আনার বিনিময়ে। সেই গল্প করতে করতে হেসে লুটিয়ে পড়ে সে। পঞ্চু ধল্ল এসব ব্যাপারে পাটোয়ার ব্যক্তি। যেখানে সূঁচ অবধি সেঁধাতে পারে না, সেখানে সে ফাল হয়ে সেঁধিয়ে যায় অক্লেশে। রাধালগরের ডাঙায় যখন টিকিট কেটে যাত্রা হল, কোলকাতার বীনাপাণি অপেরা, টিকিট কেটে যাত্রা এ তল্লাটে সেই প্রথম, পঞ্চু ধল্ল একবেলার মধ্যে গাঁজা-টাজা খাইয়ে হাত করে ফেলে পালার নায়িকার পার্ট কবা ছোকরাটাকে। এমনিতে তার নাম জনার্দন না গোবর্ধন কী যেন, অপেরা দলে তার পোশাকি নাম কুসুমরানী। 'নল-দময়ন্তী' পালায় সে দময়ন্তী, 'পার্থ সারথি' পালায় দ্রৌপদী, 'পুরুষোত্তম' পালায় সে মেঘনাদগৃহিনী প্রমীলা। পঞ্চু ধল্ল তাকে এমনই বশ করে ফেলল, টিকিট বিহনে ঘেরা-আসরের বাইরে যখন শয়ে শয়ে লোক খাড়া হয়ে শুধু কান দিয়ে পালাগান শুনছে, পঞ্চু তখন আসরের এক্কেবারে সামনে, সুরপার্টির ঠিক পেছনে বসে মজাসে পালাগান শুনল টিকিট ছাড়াই। এখনও সেই প্রসঙ্গ কেউ তুললে, তাব ফোকলা মুখে ফুটে ওঠে দেমাকি হাসি। গলা খাটো করে গুহ্য কথা শোনায় একান্তজনদের, গাঁজা-ফাজা লয়, আসলে মেয়া সাজত বটে পালাগানের আসরে, কিন্তু সে শালার ছিল মেয়ার ওপর ভারি টান। এক লম্বরের মাগিবাজ। তো, বেবস্থা কইরে দিল্যাম ঠিকঠাক। রাধালগর বাউরিপাড়ার একটা মেয়াকে জোগাড় কইর‍্যে দিতেই ছোকরা এক রাইতেই কাৎ। পঞ্চু ধল্ল এতদিন বাদে সেই গল্প বলতে বলতে দাঁতহীন মাড়ি নাচাতে থাকে। অতঃপর শুরু হয় দেশ-গাঁয়ের হরেক এলাকার পালাগান নিয়ে অজস্র স্মৃতি রোমন্থন। বিশু ধল্ল, এ যুগের ছোকরা, খবর দেয়, কোলকাতার অপেরা দলে নাকি ইদানীং মেয়া ঢুকেছে অনেক। মেয়াদের পার্ট কচ্ছে মেয়ারাই। উয়াদ্যার কয়, ওরিজিন্যাল-ফিমিল। শুনে পঞ্চু ধল্লর দাঁতহীন মাড়ি অলবলায়। শিথিল জিভখানা দিয়ে জল চোয়ায়। তো, আনো হে, সে অপেরা। দেখি, ক্যামন ওরিজিনাল-ফিমিল। দেখে, মরি।

বৈদ্যার নাটমণ্ডপে এসব রস-ভিয়েনের গল্প কমে আসছে ইদানীং। মানুষ ভয় পেয়ে গেছে। আগামী ভয়াল দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে সিঁটিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ইদানীং দিনরাত কেবল খরার প্রসঙ্গ নিযে কথা, আকাশে ডোমচিলদের সমবেত কান্না শুনতে শুনতে ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া।

ঐ সব নিয়েই আলোচনা চলে দিনভর। মুরুব্বিরা ফোলা ফোলা চোখের পাতনি কুঁচকে

আকাশের দিকে তাকায়। আকাশের ভাবগতিক ঠাহর করবার চেষ্টা করে। গাঢ় আশঙ্কায় কালো হয়ে আসে পোড় খাওয়া মুখগুলি। রোদ্দুরের রঙ চেনার চেষ্টা চালায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, অতবড় দানার বাঁধ, সিটাই শুঁকাই গেল্যাক। এ বচ্ছর যে কী হব্যেক। বাস্তবিক, দানার বাঁধ যে শুকিয়ে যাবে এমনটা কল্পনাও করেনি বৈদ্যার মানুষ। দানার বাঁধ তো মানুষে কাটে নি, দত্যিদানারাই কেটেছে। সে বাঁধের জল কখনো শুকোয়নি মানুষের স্মৃতিকালের মধ্যে। দু'অক্ষর পড়ালিখা রয়েছে যাদের পেটে, তারা অন্য ব্যাখ্যা দেয়। বহু আগে দানা বলে একটা উপজাতি নাকি বানিয়েছিল এই বাঁধ। অসুরের শক্তি ছিল ওদের শরীরে। মাটির বুক ফেড়ে পাতাল অবধি নেমেছিল ওরা। এমন দীঘি কখনো শুকায়। তা বাদে, ধরা যাক কুমোর পুকুরের কথাটা। কী সে দীঘি, কত বিশাল, টলটল করে কাকচক্ষু কালো জল। সে দীঘির মহিমা কত। কতই না গল্পগাথা তাকে নিয়ে। কোন দূরান্তের মানুষ নতুন বউ নিয়ে দীঘির ধার বরাবর যাচ্ছিল। দীঘির পাড়ে পৌঁছে তিয়াস পায় বউয়ের। দু'দণ্ড জিরিয়ে বউ নামে জল খেতে। জল খাবে কি, সরসর করে নেমে যেতে থাকে জলের তলায়। বউকে বাঁচাতে বর নামে জলে। সেও বেমালুম তলিয়ে যায়। সে যে পাতাল-ফোঁড় দীঘি হে। পাতালের জলও শুকাঁই গেল্যাক।

বুদ্ধদেব ক'দিন ধরে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারা এলাকায়। হাল হদিশ নিচ্ছিল। তাকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। খরার ভাবগতিক কেমন, জানাতে হবে।

মুরুব্বিরা পুরোনো দিনের গল্প জুড়েছেন। দেশব্যাপী সুবর্ষণের গল্প। তখন দুপুরটি গড়াতে না গড়াতে আকাশ জুড়ে পাকা জামের মতো কালো মেঘ। বিকাল না হতেই যেন শত শত ঢাকের বাদ্যি দিগন্তে। মুহুর্মুহু গুরুলে উঠছে মেঘ। বিজলি চমকাচ্ছে ঝলাক ঝলাক। দু'দণ্ড না যেতেই শুরু হল চড়াচড় চড়াচড়, মুষল ধারে বর্ষণ। চালতাফুলি জলের ফোঁটাগুলো, কাবুর, কুবুর.... আওয়াজ তুলেছে দানার বাঁধের জলে। প্রবল বৃষ্টির চোটে দশ দিক ঝাপসা হয়ে যায়। পচা পাঁকের মতো নিকষ হয়ে যায় বিশ্বভুবন। বর্ষণ চলতেই থাকে। দিনভর রাতভর মুষলধারে বর্ষণ। যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। দানার বাঁধ, বৈদ্যার বাঁধ উপচে যায়, হরিণমুড়ির বুক দিয়ে ক্রোধে ফুঁসে ওঠা খরিশ সাপের মতো তেড়ে ছুটে চলে জল। রাতারাতি পুকুর, বাঁধ, খুলিয়া-খোবরে থই থই করে জল। বৃষ্টির প্রবল আওয়াজ, মেঘে মেঘে অবিরাম, কড়াক্‌কড় দাঁত কিড়িমিড়ি, আকাশের বুকে শয়ে শয়ে ঢাকের বাদ্যি, শুনতে শুনতে নিশুত রাতে ঘুম আসে না চোখে, ভয়ে তাড়াসে চোখের দু'পাতনি এক করে না রাঢ়ের মানুষ। বৈদ্যার জঙ্গলে, শুকুরবাঁধের পাড়ের সারবন্দী তালগাছে কড়াক্কড় বাজ পড়ে। সোঁ-সোঁ হাওয়া বয়। ঝাপুড়ঝুপা গাছগুলো পাখনা ঝাপটায়, যেন শয়ে শয়ে শাগনা কোনও কারণে ভয় পেয়ে ওড়াউড়ি শুরু করেছে পাগলের পারা। একরাতে চরাচর ভেসে যায়, ভেসে যায়..। একখানা তপ্ত এনামেলের কড়াই মাথায় নিয়ে আকণ্ঠ তেষ্টায় ছাতিফাটা মানুষগুলো হ্যাংলার মতো শুনতে থাকে সে সব গল্প। আকণ্ঠ পান করতে থাকে আগের দিনের বরষার কাহিনী। শুনতে শুনতে যেন আশ মেটে না কিছুতেই। মুরুব্বির দল মাথার ওপরের এনামেলের কড়াইখানাকে কোঁচকানো চোখে নিরীখ করতে থাকে, আগাশে সে

মেঘ কুথা? মেঘের সেই পাকা তালের পারা রঙ কুথা! সেই রাতভর মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ কুথা! এ যুগের সবকিছুই বড় পাতলা। বড় নীরক্ত ফ্যাকাসে। গাছে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই, ক্ষেতে শস্য নাই, গাইয়ের বাঁটে দুধ নাই, আকাশে মেঘ নাই, মেঘে জল নাই ....। মেঘের সেই আগের দিনের গর্জন কুথা? যে গর্জনে ভয় পেয়ে কাছিমের মুখ থেকে শিকার খসে পড়ে। এ যুগটাই হইল্যাক দোঁ-আশলা। যেন আলোচালের ডাঙার আউশ ধান। অর্ধেক আগড়া অর্ধেক ধান।

গাঁয়ের মুখে ঢুকতেই বিশাল ডিহি। বুদ্ধদেব থমকে দাঁড়ায়। ডিহিখানা কী বিশাল হে! নিজের বস্তুকে কেউ প্রশংসা করলে মনখানা বেশ খুশ হয়। বুকের মধ্যে ফুটন্ত দুধের পারা উথলে ওঠে গুমোর। বৈঢ্যার মানুষ বলে ওঠে, এ কি ডিহি দেখছেন আইজ্ঞা? এ তো মাত্তর চার আনা। বাকি বারো আনায় তো মাইন্ষের ঘরদোর। শশধর ধল্লের বাপ পঞ্চু ধল্ল ব্যাখ্যা করে গাঁয়ের ইতিহাস। আকারে বিশাল বড় বলে ডিহিটাকে বলত বড়ডিহি বা বড়ডিহা। বড়ডিহা মানুষের মুখে মুখে বঢ়ডিহা এবং অবশেষে বৈঢ্যা। আগে তো কোনও জনবসতিই ছিল না ওখানে। ধু-ধু করত কালচে পাথরের আদিগান্ত ডিহি। রোদে পুড়ত, বর্ষায় ভিজত, শীতে কাঁপত। কী করে হইল্যাক তেবে এমন থানে জনবসতি? সে এক বিত্তান্ত বটে। বহুকাল আগে খাতড়ার রাজবংশের কোনও আত্মীয় তাঁর বংশের বিগ্রহ গোপীনাথ জীউকে গলায় বেঁধে এসে পৌঁছেছিলেন এই খাঁ খাঁ ডিহিতে। তখন এই পুরো এলাকা জুড়ে গহীন জঙ্গল। যেদিকে দু'চোখ যায়....! তো, ওঁদের পদবি ছিল ধবলদেব। গোপীনাথ জীউকে নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে থাকেন ঐ নির্জন ডিহিতে। ধীরে ধীরে ধবলদেও বংশ বাড়তে থাকে সেখানে। ধবলদেও থেকে কালক্রমে ধল্ল। এখন বৈঢ্যা গাঁয়ের অর্ধেক পরিবার ধল্ল। বাকি অর্ধেক? সে আর এক ইতিহাস। বহুকাল আগে জটাধর গোস্বামী নামে এক ধর্মাত্মা মানুষ ছিলেন এই গাঁয়ে। তিনিও এসেছিলেন বাইরে থেকে। সঙ্গে এনেছিলেন রাধাবল্লভের বিগ্রহ। রাধাবল্লভের পূজার্চ্চনাতেই তাঁর কেটে যেত সময়। মৃত্যুর আগে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন রাধাবল্লভের মন্দিরের সামনের শ্যাওড়া গাছের তলায় সমাধি দেওয়া হয়। এবং রোজ যেন তাঁকে রাধাবল্লভের প্রসাদ দেওয়া হয় শ্যাওড়া গাছের তলায়। অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে, সবাই তাঁকে ডাকত মহাপুরুষ। এখনও রাতে-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আশেপাশের মানুষজন তাঁর খড়মের আওয়াজ শুনতে পায়। ঐ মহাপুরুষের বংশই গোস্বামী-বংশ। তারাই বৈঢ্যার বাকি অর্ধেক। গাঁয়ের মাঝ বরাবর যে জলকুলি, তার ডানদিকের ঘরগুলো সব গোস্বামীদের, বাঁ দিকেরগুলো ধল্লদের। তবে কি সিংহগড়ের গোমস্তাকুল, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, তার বাপ যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী, কৃষ্ণদাসের ছেলে রতিকান্ত গোস্বামী, এরাও সেই ধর্মাত্মার বংশধর? বুদ্ধদেবের এমন প্রশ্নে বৈঢ্যার মানুষ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। বলে, একই সাগরে জনম লিলেও শাঁখ আর গুগলি কি এক, মশয়? এক গাছের ফল হইলেও সবগুলি সমান ডাঁসা, সমান সারবান হয় না। এক-একটা ভুয়া ফলও হয় বটে। এক মায়ের পেটে জনম লিয়ে রাবণে-বিভীষণে কত ফারাক! উয়ারা সব পাটোয়ার ব্যক্তি। কুলাঙ্গার।

অর্জুন গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু ঝরে পড়েছে তলায়। শুকনো শিরীষ ফলেরা ঝনঝন আওয়াজ তুলেছে ডালে ডালে। কুসুমগাছের কচি পাতাগুলো ঝলসে যাচ্ছে রোদ্দুরে। আকাশের বৃষ্টির ওপর যে আর পুরোপুরি ভরসা করা চলবে না, নদী-খালে বাঁধ দিয়ে সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে, বুদ্ধদেব এমন কথা বোঝাবার চেষ্টা করতেই মুখ কালো করে তাকায় মুরুব্বির দল। পঞ্চু ধল্লর মুখখানি কাঁচা, তেতো হেসে বলে, ভাল কথা শুনালেন আপনি! আকাশ না দিলে ফের বসমত্তার বুক ভিজবেক? একি দু'কাঠা চারকাঠা মাটি নাকি যে সেচের জলে ফলানো যাবেক! বলে মায়ের মাই চুষে প্যাট ভইর্‌ল্যাক নাই, বাপের উট্যা চুইষ্‌লে ভইর্‌ব্যাক? বুদ্ধদেব তাও বলে চলে। মানুষগুলোর বুকে প্রত্যয় জাগানোর উদ্দেশ্যে নানাবিধ তথ্য হাজির করে। কংসাবতীতে ড্যাম বানিয়ে যে জল ধরে রাখা হচ্ছে বর্ষায়, সেই জলে পুরুলিয়া আর বাঁকুড়ার বেশ কয়েকটা থানা সেচের জল পেতে শুরু করেছে। বিশ্বাস না হয়, চলে যাও খাতড়া, রানীবাঁধ এলাকায়। দেখে এস, কেমন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ক্যানেল কাটা চলছে.....। এদিকে, ডিভিসিও ছাড়তে শুরু করেছে জল। শুরু হয়েছে ক্যানেল কাটার কাজ। বিশ্বাস না হয় সোনামুখী এলাকায় গিয়ে দেখে এস। চলে যাও বর্ধমানে।

মানুষগুলো অবিশ্বাসী চোখে তাকায়। আকাশের জল ছাড়া ফের চাষবাস হয় এ দুনিয়ায়! এই বাবুটা যে কী সব আচানক কথা কয়!

বৈদ্যার বাঁধের পাড়ে এসে দাঁড়ায় সবাই।

সামনে বিস্তীর্ণ ডাঙা। তার পেছনে বৈদ্যার জঙ্গল। জঙ্গলটা চুয়ামসিনার জঙ্গলের সঙ্গে মিশেছে। ডাঙাটা জঙ্গলের দিক থেকে ঢালু। ফি-বর্ষায় জঙ্গলের তাবৎ জলের ঢল বয়ে যায় এই ডাঙা দিয়ে এবং তার ফলেই তৈরি হয় সারা ডাঙা জুড়ে অসংখ্য খুলিয়া-খোবর, সরুসরু, আঁকাবাঁকা অসংখ্য ছোট-বড় নালা। ফি-বছর জঙ্গলের ঢল বেয়ে প্রচুর পরিমাণে জল বয়ে আসে ঐ নালাগুলো দিয়ে। কতক জমা হয় খুলিয়া-খোবরে, কতক এদিক ওদিকে ছুটে যায়, নষ্ট হয়। গোকুল ধল্লরা বুদ্ধদেবকে বোঝায়, ডাঙাখানি সামান্য গভীর করে কাটিয়ে, যে রাস্তাটার ওপর ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটাকেই বেশ বাঁধের মতো করে বানিয়ে নিলেই এক বিশাল জলাধার হয়ে যাবে। তিন মরসুম বৃষ্টি না হলেও সে জলাধারের জল শুকোবে না।

গোকুল ধল্ল এমন অনুপুঙ্খ বোঝাল, বুদ্ধদেব আগাম দেখতে পায় জলে থই থই করতে থাকা জলাধারটিকে। এবং দেখতে দেখতে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে, এই জলাধার সে বানাবেই। তার কোনই সন্দেহ নেই, বাঁধটা সম্পূর্ণ হলে যে বিপুল পরিমাণে জল সঞ্চিত হবে, তাতে করে বৈদ্যা, অর্জুনপুর, লায়েকবাঁধ মিলে অন্তত পাঁচশো বিঘে জমিন সেচের জল পাবে। চারপাশের অন্তত গোটা দশেক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ গ্রীষ্মে পানীয় জল পাবে প্রকট প্রয়োজনের মুহূর্তে। নিদেন, চান করতে পারবে, গরু-বাছুর জল খাবে।

নিজের প্রতিজ্ঞার কথাটা প্রকাশ করে বুদ্ধদেব। বলে, সামনের মরসুমে এমন দিনে আমি এই ডাঙা টলটলে জলে ভরে দেব।

'লাইর্‌বেন।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথাটা উচ্চারণ করে গোকুল ধল্ল। বুদ্ধদেব তাকায়। তার চোখে বিস্ময়। বলে, কেন?

'ক্যানে, সিট্যা জেইনে লাভ নাই আইজ্ঞা। তেবে জেইনে লিন, সাতমণ তেলও পুড়বেক নাই, রাধাও লাইচ্‌বেক নাই।'

কথাগুলো ধাঁধাঁর মত শোনায় বুদ্ধদেবের কানে। তবুও প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলে, জানো না তো, এ বছর গাঁ-গঞ্জে মাটি কাটবার জন্য কত্তো টাকা দিচ্ছে সরকার।

'টাকার কথা বলি নাই আইজ্ঞা।' গোকুল ধল্ল অটল, 'ই'বাঁধ কাটা হবেক নাই অন্য কারণে।'

'কি কারণ?'

আশে পাশে পঞ্চু ধল্ল, তার ছেলে শশধর ধল্লরা উপস্থিত ছিল। এরা সবাই হরবল্লভের অনুগত। গোকুল তৎক্ষণাৎ তাই কথাটা ভাঙ্গেনা। পরে, সামান্য তফাতে গিয়ে খুব নিচু গলায় বলে, হব্যেক নাই, কারণ এ বাঁধের ধারেপাশে সিংহবাবুদের এক কাঠাও চাষের জমিন নাই। যেদিকে ভাইপো খাড়া নাই, সেদিকে হরির লুটের বাতাসা পৌঁছায়, আইজ্ঞা?

১২. বোড়ে দিয়ে কিস্তির চাল

নির্দিষ্ট দিনে সরকারি জীপ গোঁ-গোঁ শব্দ করে এগিয়ে আসতে থাকে কাজিপুকুরের দিকে।

বড়ামতলায় বকুল গাছের ঘন ছায়া। তার তলায় ফের খাটানো হয়েছে কারুকার্য করা সামিয়ানা। সামিয়ানার তলায় চারখানি চেয়ার পাতা। সামনে একখানা টেবিল। টেবিলের ওপর সুতোর ফুল আঁকা সাদা চাদর। তার ওপরে একটা রুপোর ফুলদানিতে কৃষ্ণচূড়া ফুলের থোকা। ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে। জ্বলছে। চেয়ার-টেবিলগুলো এসেছে পাথরবেটিয়ার ঝাড়েশ্বর নায়কের বাড়ি থেকে। টেবিলের ঢাকনা, ফুলদানি, ধূপদানি ইত্যাদি হরবল্লভ পাঠিয়ে দিয়েছেন রতিকান্তকে দিয়ে।

গাঁয়ের বাইরে বকুলপাতার গেট। পাথরবেটিয়া থেকে ঝাড়েশ্বর নায়কের বড় মেয়ে পাঁচির নেতৃত্বে এক কিশোরী বাহিনী এসেছে শাঁখ নিয়ে। বকুলতলায় ওরা তৈরি। বকুল ফুল দিয়ে মোটা মোটা মালা বানানো হয়েছে চারটি। আজ বিডিও সাহেবের সঙ্গে ওঁর স্ত্রীও আসছেন। কাজেই, হরবল্লভবাবুর সঙ্গে অরুন্ধতীকেও আসতে হয়েছে সৌজন্যের খাতিরে।

বড়ামতলা থেকে সামান্য তফাতে চট টাঙিয়ে পাকশাল বানানো হয়েছে। রান্নার ঠাকুর এসেছে পাথরবেটিয়া থেকে। গাওয়া ঘি-এর মনমাতানো গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে দুপুরের বাতাসে। তৈরি হচ্ছে বিডিও সাহেবদের জন্য জলখাবার। গরম লুচি, সুজির হালুয়া, আলুর দম। বিষ্টুপুর থেকে কলাকাঁদ আর নিখুঁতি এসেছে আজ সকালেই।

হরবল্লভ সস্ত্রীক এসে গিয়েছেন আড়াইপহরটাক বেলায়। তাঁর গরুর গাড়ি মউল গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছে। পাহাড়ের মতো বলদ দুটো গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে একমনে জাবর কাটছে। আজ আবার তাদের শিং-এ সপসপে করে তেল মাখানো হয়েছে। গলায় পরানো হয়েছে লাল-নীল পুঁতিসহ ঘুঙুরের মালা। হরবল্লভের গায়ে সিল্কের দামি পাঞ্জাবি, চিকন

ধুতি, চকচকে পাম্প শু, মাথায় গান্ধী টুপি। রাজদ্বারে হরবল্লভের এই পোষাক। এখনও অবশ্যি জায়গাটা রাজদ্বার হয়নি, বিডিও সাহেব পৌঁছে গেলেই কাজিপুকুর বড়ামতলা রাজদ্বারের মর্যাদা পেয়ে যাবে। অরুন্ধতীর পরণে তসর রঙের বালুচরী। সারা অঙ্গে নতুন ছাঁদের গহনা।

হরবল্লভকে ভারি চঞ্চল লাগছিল। অস্থির। ব্যবস্থাপনায় কোনও ত্রুটি রইল কিনা দেখবার জন্য চারপাশে ঘনঘন চোখ চারাচ্ছিলেন তিনি। সহসা তাঁর খেয়াল হয়, ত্রুটি থেকে গিয়েছে। মারাত্মক ত্রুটি। রতিকান্তকে হাঁক দেন হরবল্লভ। বলেন, জলদি যা সিংহগড়ে, বৈঠকখানায় যে বাপুজী আর নেহেরুজীর ফটো দুটো টাঙানো আছে, লিয়ে আয়। রতিকান্ত সাইকেলে চড়ে পাঁই পাঁই ছোটে।

কিন্তু গ্রামসেবক বাবু এখনও অবধি এল নাই ক্যানে? হরবল্লভের এটিও একটি বিরাট ত্রুটি বলে মনে হয়। গ্রামসেবক তুমি, এলাকায় ব্লক অফিসের একমাত্র সরকারি প্রতিনিধি, বিডিও সাহেবের সরকারি কর্মসূচীতে তুমি অনুপস্থিত থাক কোন্ সাহসে। হরবল্লভ একে তাকে শুধোন। কেউই বুদ্ধদেবের হাল-হদিশ জানাতে পারে না। পতিত বাউরি বলে, আজ কি, তিনি তো গেল দু'দিনও মু'টি দেখান নাই। আশ্চর্য। ছোকরা কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে! বদলি না হলে কি তার সাধ পূরণ হচ্ছে নাই। হরবল্লভ মনে মনে স্থির করেন, আজ বিডিও সাহেবের কাছে তার অনুপস্থিতির বিষয়টি তুলে ছোকরার বদলির হুকুমের ভিত্তিপ্রস্তরটি স্বহস্তে স্থাপন করবেন। এ এমনই এক সুযোগ, যা কাজে না লাগানোটা বোকামি।

বহুদিনের অযত্নে ফটো দুটির গায়ে পুরু ধুলো জমেছে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফটো দুটোকে রাখা হল দুটো চেয়ারে। এতক্ষণে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। হরবল্লভ এতক্ষণে পায়ে পায়ে হাঁটা দিলেন পাকশালের দিকে।

বড়ামতলার চারপাশে আজ পুরো কাজিপুকুর গাঁখানি ভেঙে পড়েছে। পাথরবেটিয়া থেকেও এসেছে বহু মানুষ। তাদের চোখে রাজ্যের কৌতূহল। ঝাড়েশ্বর নায়ক অনেকক্ষণ ধরে ভিড়টা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। সরে যাচ্ছিলও। কিন্তু খানিক বাদে লোকগুলো আবার জমে যাচ্ছিল সামিয়ানার কাছাকাছি। বাধ্য হয়ে হরবল্লভকেই বার-দুই জমিদারি গলায় ধমক দিতে হয। হরবল্লভ একবার ধমকে উঠতেই উপস্থিত চৌকিদারদের তেজ আর দাপট বেড়ে যায়। হাতের কালো লাঠি উঁচিয়ে ধরে ওরা তাড়িয়ে নিয়ে যায় উদোম মানুষের জমায়েতকে। ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে। অভিরাম চৌকিদার, গণেশ চৌকিদার — এরা সব খাঁকি পোষাক পরেছে আজ। ধুতির ওপর খাঁকি জামা। মাথায় ঘন নীল পাগড়ি। কোমরে পেতলের চাকতি বসানো পেটি।

পাগল শিকারি হরবল্লভদের গাড়িখানা চালিয়ে এনেছে। মউল গাছের তলায় বলদসহ গাড়িটিকে থাপনা করে সে মিশে গিয়েছে জনতার ভিড়ে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন এলাকায় বাবুভায়াদের এমনিতরো পার্বন লেগে যায়। হরবল্লভের গাড়োয়ান হিসেবে সে থাকে এসবের প্রত্যক্ষদর্শী। চুয়ামসিনায় ফিরে গিয়ে সুকুমারদের বিতাং করে বলে সব।

জনতার ভিড় থেকে সরে গিয়ে পাগল শিকারি দাঁড়ায় শ্যাওড়া গাছটার তলায়। ততক্ষণে

বিডিও সাহেবের জীপ ঢুকে পড়েছে কাজিপুকুর গাঁয়ে। হরবল্লভ লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান, পিছু পিছু ঝাড়েশ্বর নায়ক এবং রতিকান্ত গোস্বামীর মতো ভদ্দরজনেরা। পোঁ-পোঁ করে বেজে ওঠে শাঁখগুলো। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এসে দাঁড়ায় জলপাই রঙের জীপ। প্রায় সকাল থেকে কাজিপুকুরের একপাল ছেলে-ছোকরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁতিগেড়িয়ার মুখটাতে। জীপের পেছন পেছন ধুলো খেতে খেতে সগৌরবে ফিরে আসে তারা।

বিডিও সাহেব সস্ত্রীক নামেন জীপ থেকে। হরবল্লভ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। সবাই এসে দাঁড়ান সামিয়ানার তলায়। সেখানে এতক্ষণ বসেছিলেন অরুন্ধতী। অতখানি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো তাঁর আভিজাত্যের সঙ্গে মানায় না। পুরুষদের তাও মানিয়ে যায়। কিন্তু মহিলা হয়ে..। সামিয়ানার তলাতেই বিডিও সাহেবদের অভ্যর্থনা জানান অরুন্ধতী। হরবল্লভের সঙ্গে বিডিও সাহেবের সামান্য বাক্য বিনিময় হয়, কিন্তু অতগুলি শাঁখের উৎকট পোঁ-পাঁ আওয়াজে শোনা যায় না সেগুলো। ওঁরা চেয়ারে বসা মাত্রই তিনজন চৌকিদার পাখা হাতে পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সাঁই সাঁই পাখা চালাতে থাকে।

একেবারে মাঝের চেয়ারে বসেন বিডিও সাহেব। বাঁদিকে সাহেবের স্ত্রী। তাঁর পাশে অরুন্ধতী। হরবল্লভ বসেন বিডিও সাহেবের ডানদিকের চেয়ারে। বিডিও সাহেবের স্ত্রী বেশ মোটাসোটা স্থূলাঙ্গী মহিলা। বেশ গিন্নি গিন্নি ভাব রয়েছে মুখে। অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর তসর রঙের বালুচরীর একপ্রান্ত হাতে তুলে নিয়ে আলতো দেখেন এবং তারিফ করেন। অরুন্ধতীর শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের গহনার সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে খোঁজখবর নেন। ঝাড়েশ্বর নায়কের ছোট মেয়ে উর্মিলা ঝলমলে ফ্রক পরে তৈরি ছিল। হরবল্লভের ইঙ্গিতে সে বকুল ফুলের মালা চারটি একে একে পরিয়ে দেয় চারজনের গলায়। আরও দু'খানা মালা থাকলে ভাল হত। ফটো দুটোর গলায় দেওয়া যেত। কিন্তু বাড়তি মালা আর নেই। হিসেব করেই গাঁথা হয়েছিল চারখানি মালা। বাপুজী এবং চাচাজী সেই হিসেবের মধ্যে ছিলেন না। হরবল্লভই শেষ মুহূর্তে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন আজকের সভায়। যাগগে, কী আর করা যাবে! এতক্ষণে বুঝি হরবল্লভের খেয়াল হয়, সামনেটা একেবারেই খাঁ-খাঁ। উদোম মানুষগুলো চৌকিদারদের তাড়া খেয়ে দূরে শ্যাওড়াগাছের তলায় গিজগিজ করছে। ভুলভুল চোখে তাকিয়ে রয়েছে বকুলতলার দিকে। হরবল্লভ ইঙ্গিতে ওদের ডাকেন। নিমেষের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসে উদোম মানুষের দল। সামনে পাতা শতরঞ্চির পেছনে শক্ত জমির ওপর চাপটি খেয়ে বসে যায়। শতরঞ্চির ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ঝাড়েশ্বর নায়ক ও রতিকান্ত গোস্বামীর মতো ভদ্দরজনেরা। কাজিপুকুরের ষোলআনার মাতব্বর হিসেবে পতিত বাউরিও পেয়ে যায় শতরঞ্চিতে বসবার অধিকার।

একে একে ডাবের জল আসে। প্লেটে প্লেটে আসে জলখাবার। রুপোর গেলাসে জল। সাহেবরা খেতে শুরু করেন। সামনে বসে বসে এক গাঁ মানুষ মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য। খেয়েদেয়ে সামান্য জিরোবারপর বিডিও সাহেব চলেন সদলবলে নিমগাছ পরিদর্শনে। পাশে পাশে ছাতা ধরে ধরে হাঁটে চৌকিদারের দল। পিছু পিছু চলে পুরো কাজিপুকুর গাঁ। বুড়ো নিমের তলাটা ঝোপঝাড় কেটে সাফ-সুতরো করে রাখা হয়েছিল

আগেই। বিডিও সাহেব সপারিষদ এসে দাঁড়ান গাছের তলায়। কোটর দিয়ে অবিরাম ধারায় চুইয়ে পড়ছে রস। গেঁজে ওঠা ফেনা জমে রয়েছে গুঁড়ির আশেপাশে। লাখে-লাখে কাঠ পিঁপড়া চাক বেঁধে রস খাচ্ছে দিনরাত। তাদের ব্যূহ ভেদ করে গাছের গুঁড়ি অবধি পৌঁছুনো দুষ্কর। বিডিও সাহেব ভুরু কুচকে দেখতে থাকেন গাছটাকে, কোটরটাকে, পিঁপড়েগুলোকে। গোয়েন্দাসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। বলেন, এ গাছের রস মিঠা কইতে চান আপনারা? ইজ ইট বিলিভেবুল। বিডিও সাহেবের প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ রুপোর গেলাস নিয়ে এগিয়ে যায় ঝাড়েশ্বর নায়ক। কোটরের মুখে গ্লাস ধরে খানিকটে রস নিয়ে ফিরে আসে। বিডিও সাহেব প্রথমটায় সামান্য ইতস্তত করেন। তারপর গেলাসখানি মাথার ওপর তুলে সামান্য রস ঢেলে নেন মুখে। মুখের মধ্যে অলবলিয়ে ঘুরে বেড়ায় জিভ। মুখমণ্ডলে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে একটু একটু করে। পরিষদবর্গ এবং সারা কাজিপুকুর গাঁ নির্নিমেষ তাকিয়েছিল বিডিও সাহেবের মুখের দিকে। ওঁর মহার্ঘ প্রতিক্রিয়াটুকুকে চিনতে চাইছিল। একটু একটু করে বেশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে বিডিও সাহেবের মুখমণ্ডল। এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় তরল মাখনের মতো জমতে থাকে। বলেন, স্ট্রেঞ্জ! এ তো মিঠাই লাগ্‌সে হে! কী কাণ্ড—!

একে একে অভ্যাগতদের সবাই চাখতে থাকে রস। সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত। মুখের মধ্যেকার মিষ্টি স্বাদটুকু মুছে যাওয়ার আগেই বিডিও সাহেবের স্ত্রী দু'হাত জড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করেন গাছটাকে।

পরিদর্শন শেষ। বকুলতলার উদ্দেশ্যে ফিরে চলেন বিডিও সাহেব। কাজিপুকুরের প্রত্যেকটি মানুষের মুখে সিদ্ধিলাভের তৃপ্তি। যাক, এত কষ্ট, ত্যাগ, তিতিক্ষার অবসান হল। সার্থক হল সারা গ্রামের মানুষের এতখানি পরিশ্রম।

বকুলতলায় ফিরে গিয়ে আবার যে যার চেয়ারে আসীন হন সবাই। রতিকান্ত চেঁচিয়ে বলতে থাকে, বইসে পড় সবাই। এবার মিটিন্ হব্যেক। সত্যি, সরকারি কর্মসূচীতে এসেছেন বিডিও সাহেব, এই সুযোগে একটু আধটু 'মিটিন্' না হলে চলে? সামান্য বক্তৃতা-টক্তৃতা না হলে কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে লাগবে ব্যাপারটা। বিশেষ করে, পাকশাল থেকে খবর এসেছে রান্নার সামান্য দেরি আছে।

হরবল্লভের বক্তৃতা দিয়েই মিটিন্ শুরু হয়। পরম শ্রদ্ধাষ্পদ অবিনাশ ভৌমিক সাহেব অর্থাৎ এই তল্লাটের সকলের আজন্ম পরিচিত বিডিও সাহেব যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও যে তিনি এজন্য সময় করতে পেরেছেন, কাজিপুকুর গ্রাম তথা সারা লায়েকবাঁধ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তিনি সে জন্য বিডিও সাহেব এবং তদীয় পত্নীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারপর, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও চাচা জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে দুশো বছরের বিদেশী শাসন থেকে যে দেশকে মুক্ত করা গিয়েছে সে জন্য তিনি জাতীয় কংগ্রেস তথা মহাত্মাগান্ধী ও চাচা নেহেরুকে একপ্রস্থ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। নিজের কথাটা একেবারে বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখে, 'বন্ধুগণ, অনেক পরিশ্রমে, অনেক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আমরা আপনাদের স্বাধীনতা

এনে দিয়েছি, এবং নিজেদের আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি,' বলে সেই ত্রুটিটুকু শুধরে নেন। সবশেষে জনগণকে একটু 'আপ' করবার চিরাচরিত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে, জনগণই যে দেশের ভবিষ্যত, জাতির আশা-ভরসা এবং দুশো বছর ধরে বিদেশীরা যে দেশকে শোষণ করে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়ে গেছে, সেই দেশকে পুনরায় গড়ে তোলার, ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলার যে কর্মযজ্ঞ জাতীয় কংগ্রেস হাতে নিয়েছে, তাতে আপামর জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন প্রার্থনা করে বক্তৃতা শেষ করেন। হরবল্লভ বক্তৃতা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল হাততালি পড়ে এবং রতিকান্তর নেতৃত্বে জনতা স্বাধীন ভারত, জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় পতোকা, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, বিডিও সাহেব এবং হরবল্লভের জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

বিডিও সাহেব তাঁর বক্তৃতায় এসবের ধারে কাছে দিয়েও হাঁটেন না। হরবল্লভ এবং কাজিপুকুরের মানুষেব আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি চলে যান অন্য প্রসঙ্গে। আজকের এই পরিদর্শন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মসূচী, সেটাই উপস্থিত জনতাকে বোঝাতে থাকেন তিনি। ফিরিয়া গিয়া এ গ্রামের খবর এস-ডি-ও সাহেবরে দিমু, ডিম-এম-রে দিমু। এক্সপার্ট টিম পাঠানোর ল্যাইগ্যা গভর্নমেন্টকে লিখুম। কাজিপুকুরের নাম সারা দেশে ছরাইয়া দিমু। এবং সবশেষে কাজিপুকুরের মানুষের জন্য এটুকু না করলে তাঁর 'অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাইব না' বলে বেশ আবেগমথিত গলায় বক্তৃতা শেষ করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের খ্যাঁটটা ভালই হল। মাংসের হাড়খানা চুষতে চুষতে বিডিও সাহেব মন্তব্য করেন, আমার মনে হয়, এ গ্রামের তলায় সেকারিনের খনি রইসে। যদি আমার অনুমান সত্যি হয়, তবে কাজিপুকুরের কপাল খুইল্যা গেল গা।

সুযোগ বুঝে হরবল্লভ বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেন।

—আপনার নতুন গ্রামসেবককে কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি আজ?

—না তো। বিডিও সাহেব সহসা অতি মাত্রায় গম্ভীর হয়ে যান।

—তবে সে আজ বড় এল নাই এখানে?

—হুম। বলেই বিডিও সাহেব মাংসের হাড়খানা সজোরে চুষতে থাকেন।

হরবল্লভ থামেন না, গ্রামসেবক সে, বিডিও সাহেব এলাকায় এসেছেন, উপস্থিত থাকাটা উয়ার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

—হুম। বিডিও সাহেবের মুখখানা ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। ধীরে ধীরে হাড়খানা চিবিয়ে গুঁড়োগুলো পাতের একধারে ফেলেন, দুইখান পাখনা গজাইসে।

—কিন্তু এসব ব্যাপারকে তো বেশি আস্কারা দেওয়া উচিত নয়। এমনিতেই তো সর্বত্র ডিসিপ্লিন ভেঙে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের সেই বাধ্যবাধকতা, আনুগত্য—।

—উয়ার এ্যাবসেন্স নোট কইর‍্যা নিসি গা। কগ্‌নিজেন্স অলরেডি নিয়া নিসি। হরবল্লভকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে একেবারে সরকারি বয়ানে শেষ কথাটা বলেন বিডিও সাহেব, দা ম্যাটার ইজ সিরিয়াস্‌লি ভিউড্ এ্যাণ্ড উইল বি ডেল্‌ট উইথ প্রপার্‌লি।

সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও পাগল শিকারি বুঝতে পারে, নতুন গ্রামসেবক বাবুর বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম বোড়ের চাল সম্পূর্ণ হল এতক্ষণে।

১৩. কুন্তীর একান্ত বোঝাপড়া

কুন্তী দ্বারকেশ্বরের দু'পাড়ের ধু-ধু চরগুলিকে দেখে নি। দহটিকেও নয়। কারণ, সে রয়েছে গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে। পোক্ত গাড়ির নরম বিছানায়, বাহারি ছইয়ের ঘেরাটোপে। কনকপ্রভা দহর পাড়ে যেখানটায় বসেছিলেন সেখান থেকে কুন্তী দৃশ্যমান নয়। সে তার সারা শরীর লুকিয়ে রেখেছে গাড়ির ছইয়ের মধ্যে। কনকপ্রভার মতো সেও বোধ করি অপেক্ষা করছে, কখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। দিনের আলোয় চুয়ামসিনায় পা রাখতে তারও অপরিসীম লজ্জা। এখনও শরীরখানা খুবই দুর্বল কুন্তীর। শরীরখানা মাঝে মাঝেই গুলোয়। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে সে। চোখের কোলে কালি জমেছে। মাথার চুল উসকো-খুসকো। কেমন যেন গুম মেরে গিয়েছে মেয়েটা। কথাবার্তা নিতান্তই কম বলে। সারাক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে থাকে। কনকপ্রভা বুঝতে পারেন, কুন্তীর বুকের মধ্যে অবিরাম ঝড় বইছে। অথচ, এমনটা যে ঘটবে, কনকপ্রভা স্বপ্নেও ভাবেননি তা।

বুদ্ধদেব যখন কনকপ্রভার গড়ে আসত, কুন্তীর সারা মুখ ধোওয়া শিউলিফুলের মতো কমনীয় আভায় ভরে যেত। আবার পল্টু হাজরা রাজদূত হাঁকিয়ে এলে চোখের মণি-জোড়া চকচকিয়ে উঠত। বুদ্ধদেবের সামনে শান্ত কমনীয় হয়ে উঠত মেয়েটা, আবার পল্টুর সামনে উচ্ছল, বাঁধনছেঁড়া। কনকপ্রভা বুঝে উঠতে পারতেন না, মেয়েটা ঠিক কাকে ভালবাসে। যখন ষোল পেরোল কুন্তী, কনকপ্রভা ওর বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করলেন। বারকয় ঠারে-ঠোরে জানবার চেষ্টা করলেন, কাকে প্রকৃতপক্ষে চায় কুন্তী। বারবার এড়িয়ে গেছে কুন্তী। অথবা এমনই ভাসাভাসা জবাব দিয়েছে, কনকপ্রভা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এখন কনকপ্রভার মনে হয়, কুন্তীও বুঝি এ প্রশ্নের সঠিক জবাব জানত না। নিজের মনটাকে কোনকালেই ঠিকঠিক চেনে না বুঝি কুন্তী। ফলে, বুদ্ধদেবও ওকে দুলিয়েছে। পল্টুও। তবে, ইদানীং কনকপ্রভার মনে হচ্ছিল, পল্টুর দিকেই বেশি ঝুঁকছে কুন্তী। ওর মোটর-বাইকের পেছনে বসে ঘুরে বেড়াতেই বুঝি ওর অধিক আনন্দ। কনকপ্রভারও পল্টুকেই মনে মনে বেশি পছন্দ হয়েছিল। তরতাজা তরুণ যুবক। সর্বদাই পেশী টানটান। এক ধরনের পুরুষালি ব্যাপার রয়েছে ছোকরার মধ্যে। বিত্তবান বাপের ছেলে। এরই মধ্যে কাজেকর্মে মেতে গিয়েছে। কন্ট্রাক্টরিটা নাকি ভালই জমিয়েছে। না জমালেই বা কি! বাপের যা রয়েছে, তিনপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবে। তার ওপর কামেশ্বর হাজরা আর সিদ্ধেশ্বর হাজরা এ জেলার প্রতিপত্তিশালী মানুষ। এমন পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে মন্দ কি? বুদ্ধদেবও ভাল ছেলে। ওদের বাড়ির অবস্থাও নাকি খুবই ভাল। কিন্তু ছেলেটা কেমন যেন আবেগ-সর্বস্ব। পাগলাটে। উচ্চাকাঙ্খা বলে কিছুই নেই। সারাজীবন হয়ত বা গ্রামসেবকের চাকরি করেই কাটিয়ে দেবে। এমন ছেলের পৈত্রিক সম্পত্তি থাকলেও কুন্তীর কোন্ কাজে লাগবে তা! ঐ সম্পত্তি ভোগ করতে চাইলে কুন্তীকে তো বুদ্ধদেবের কাঁথি-লাগোয়া ঐ গাঁয়ের বাড়িতেই গিয়ে থাকতে হবে। সবদিক থেকে বিচার করে, বুদ্ধদেবকে কুন্তীর মতো সুন্দরী, উচ্ছল আর জেদী মেয়ের সঙ্গে মানানসই বলে মনে হয়নি কনকপ্রভার। মনে মনে পল্টুকেই তিনি পছন্দ করেছিলেন। কুন্তীর মনখানাও পল্টুর দিকেই পুরোপুরি ঘোরাবার চেষ্টা করে গেছেন কৌশলে।

মাঝে মাঝে নিজেই অবাক মানতেন কনকপ্রভা। পল্টুরা ব্রাহ্মণ নয়। কুন্তীর সঙ্গে ওর বিয়ে হলে সে হবে অসবর্ণ বিবাহ। আশ্চর্য, ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে হয়ে, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের বউ হয়েও অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়েতে মনে মনে কোনও আপত্তিই ছিল না তাঁর। বিষয়টা নিয়ে নিজেও অনেক ভেবেছেন কনকপ্রভা। তিনি নিজে খড়্গপুর শহরের মেয়ে। এখন শহরাঞ্চলে অসবর্ণ বিবাহ আকছারই হচ্ছে। তবে সিংহগড়ের মতো গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারগুলি এখনও তেমনটা ভাবতেই পারে না। এমনিতে বনেদিয়ানা আর রক্ষণশীলতার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা কনকপ্রভার মনে তিলতিল জমেছে অনেকদিন ধরে। রক্ষণশীল একটি পরিবারেই তার পুরো জীবনটা দম আটকে মরে গেল। মহলজুড়ে খানাপিনা, জলসার আসর বসিয়ে সেই বনেদিয়ানা আর রক্ষণশীলতার গালে ঠাসঠাস থাপ্পড় কষিয়েই চলেছেন কনকপ্রভা। পল্টু হাজরারা পয়সাওয়ালা, কিন্তু জমিদার ওরা কখনই ছিল না। জমিদারী রক্তে এক ধরনের অভিশাপ থাকে। বাড়িতে রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঐ অভিশপ্ত রক্তই ওদের নারী-শিকারে ছুটিয়ে বেড়ায়। কাজেই, জাতে না মিললেও পল্টুতে যদি সুখী হয় কুন্তী, সেটাই কনকপ্রভার কাছে বেশী কাম্য।

ইদানীং মাঝে মাঝেই পল্টুর সঙ্গে বেরিয়ে যেত কুন্তী। ওর মোটর-বাইকের পেছনে চড়ে আকছার হারিয়ে যেত সে। সারা তল্লাট জুড়ে সোরগোল উঠেছিল ঐ নিয়ে। কুৎসা রটছিল কুন্তীকে নিয়ে। কনকপ্রভা কান দেননি সে সব কথায়। কনকপ্রভা জানতেন, পল্টুর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কুন্তীর বিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ঝড় উঠবে সারা এলাকা জুড়ে। ভালই হয় ওরা যদি রেজিষ্ট্রি মতে বিয়েটা সেরে ফেলে। অনেক কথা উঠবে তাতেও। কিন্তু পাঁচজনের পাঁচ কথাকে অগ্রাহ্য করবার অভ্যেস ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে কনকপ্রভার মধ্যে। সার কথা এই যে, কুন্তী সুখী হলেই হল।

কনকপ্রভা লক্ষ করেছেন, কুন্তী যতই মেশামেশি করছে পল্টুর সঙ্গে, বুদ্ধদেব ততই বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। ইদানীং আর পড়াতেও আসত না। দু'একবার দীপমালার মাধ্যমে কথাটা পেড়েওছে। কিন্তু কনকপ্রভা মিষ্টি হেসে এড়িয়ে গিয়েছেন। একদিন নিজেই খুব তেড়েফুঁড়ে এসেছিল। সরাসরি কনকপ্রভাকে বলেছিল, কুন্তীর ঘোরাফেরার কোনও খবর রাখেন আপনি?

কনকপ্রভা না বোঝার ভাণ করেছিলেন, 'কুন্তী? কী করেছে সে?'

'পল্টু হাজরার মোটর-বাইকের পেছনে বসে সারা বিষ্ণুপুর শহর চষে বেড়াচ্ছে। আপনি জানেন না?'

কনকপ্রভা মুহূর্তকাল নীরব থেকেছিলেন। তারপর মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, 'তো কী হয়েছে, বাবা? পল্টু তো খারাপ ছেলে নয়।' বুদ্ধদেব আর কথা বাড়ায়নি। তার চোখমুখ ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছিল। খুবই অপমানিত বোধ করলেই মানুষের চোখমুখ এমন হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল সেদিন। ওর কথা ভেবে কনকপ্রভার খুবই খারাপ লেগেছিল। কিন্তু তাও তিনি বুদ্ধদেবকে একটিও সান্ত্বনার কথা বলেননি সেদিন।

একদিন বিষ্ণুপুরে গিয়ে সন্ধেবেলায় আর ফিরল না কুন্তী। কনকপ্রভা কিছুই ভাবেননি তাই নিয়ে। ইদানীং মাঝে মাঝে দীপমালার বাসায় রাত কাটাত কুন্তী। সকাল বেলায় পল্টুই ওকে পৌঁছে দিয়ে যেত।

কিন্তু পরের দিন সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, বিকেল হল, সন্ধে ...., কুন্তী ফিরল না। সেই প্রথম কুন্তীকে নিয়ে কনকপ্রভার মনে দুর্ভাবনা জমেছিল। সারারাত ভাল ঘুম হল না। পরের দিন সকালে নিকুঞ্জপতি যখন বিষ্ণুপুর রওনা দেবার জন্য তৈরি, এমনি সময়ে দীপমালা ঢুকলেন কনকপ্রভার গড়ে। অন্য কাজে এসেছিলেন তিনি। মাঝে মধ্যেই আসেন। কনকপ্রভার কথা শুনে দীপমালা তো অবাক। কুন্তী বাস্তবিক মাসখানেকের মধ্যে তাঁর বাসায় যায় নি। কনকপ্রভার মনের মধ্যে তখন কু গাইতে শুরু করেছে। সাবেক মায়ের মন জেগে উঠছে ভেতর থেকে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই মনে হচ্ছে তখন। দীপমালাও কিছু আঁচ করছিলেন নিশ্চয়ই। বললেন, বুদ্ধদেব কোথায়?

'জানি না তো।' ভয়েভয়ে জবাব দেন কনকপ্রভা।

'এক্ষুনি কাউকে পাঠান তো অনাথদার বাড়িতে।'

চপল লোহার ফিরে এসে খবর দিল, বুদ্ধদেব গেল পরশু থেকে চুয়ামসিনায় নেই। বলে গেছে, বাড়ি যাচ্ছে।

কনকপ্রভা ততক্ষণে উতলা হয়ে উঠেছেন। দীপমালাই ওঁকে শান্ত করেন। দু'জনে শলা-পরামর্শ করে রওনা দেন বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে। সঙ্গে কাউকেই নেন না কনকপ্রভা। দীপমালাই বারণ করেন।

কনকপ্রভার গরুর গাড়ি সোজা গিয়ে থামে ওমপ্রকাশ আগরওয়ালার ময়রাপুকুরের বাসায়। এমন পরিস্থিতিতে পল্টুই শক্ত হয়ে পাশে দাঁড়াবার মতো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। দীপমালা লোকজন দিয়ে পল্টুর সন্ধান করতে থাকেন। পল্টু বাড়িতে ছিল না। কোথায় বেরিয়েছে কেউই তেমন করে বলতে পারল না। কনকপ্রভার মনে যৎপরোনাস্তি সাহস জুগিয়ে দীপমালা নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলেন সেদিন। এবং বিকেল নাগাদ কনকপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রাসমঞ্চের কাছাকাছি একটা বাড়ির দোতলায়।

কুন্তী এবং পল্টুকে সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল।

শুধু সেবারেই নয়, কুন্তী যে গত ক'মাস ধরে বেশ কয়েকবার পল্টুর সঙ্গে সহবাস করেছে, এমনটা যখন জানতে পারলেন কনকপ্রভা, একেবারেই ভেঙে পড়লেন তিনি। এবং তার দিনকয় বাদেই কুন্তীর সারা শরীরে মা হওয়ার লক্ষণগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠতে লাগল। সে রাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন কনকপ্রভা। কিন্তু কুন্তীর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। মা যে শুধু শুধু কেন কাঁদছে সেটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না তার। কনকপ্রভাও মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছিলেন না সেটা। দীপমালার পরামর্শে একদিন কথাটা বলেই ফেলেন কুন্তীকে। শোনা মাত্রই কুন্তীর মধ্যে সহসা দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়।

পুনরায় একা একা বিষ্ণুপুর গেলেন কনকপ্রভা। পল্টুকে খুঁজে বের করে একান্তে কথা বললেন। পল্টুর মধ্যে তখন এক ধরনের বেপরোয়া ভাব।

কনকপ্রভা সরাসরি শুধোন, 'তুমি কুন্তীকে বিয়ে করবে তো?'

পল্টু খুব বেহায়া গোছের হাসে। বলে, 'আমাকে কেন, বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলুন। ছেইল্যা-পুইলার বিয়া ত বাবা-মাই ঠিক করে।'

পল্টুর মুখের দিকে তাকিয়েই সেদিন কনকপ্রভা বুঝে ফেলেছিলেন, তাঁর একমাত্র সন্তানের কপালটি পুড়েছে।

তার পরের দিনগুলো ছিল কনকপ্রভার পক্ষে সত্যি সত্যিই দুঃস্বপ্নের দিন। কেমন করে যে তিনি শতচক্ষুর কৌতূহল এড়িয়ে কুন্তীকে নিয়ে খড়্গপুরে চলে গিয়েছিলেন, কেমন করে করে সেখানে সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে কুন্তীর পেটের সন্তানকে নষ্ট করিয়েছেন, চার মাসের অক্লান্ত শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলেছেন ওকে, সেই দিনগুলোকে স্মরণ করলে আজও কনকপ্রভার সারা শরীর অসাড় হয়ে আসে। কুন্তী তারপরও মাস তিনেক ছিল মামার বাড়িতে। সেখানে ও পড়াশুনো করছে, এমন কথাই রটনা করেছিলেন কনকপ্রভা। তবুও ওঁর ধারণা, চুয়ামসিনার অনেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছে। আর, এ ধরনের মুখোরোচক কথা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ-মাছি তৎপর হয়ে ওঠে।

আজ এতদিন বাদে কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরছেন কনকপ্রভা। সারা পথ সাহসে বুক বেঁধেছেন। মানুষের বাঁকা নজর, চেরা মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করবার তালিম নিয়েছেন মনে মনে। কুন্তীকেও পাখিপড়া পড়িয়েছেন ক'দিন ধরে। কুন্তী জবাব দেয়নি। তার মুখের ভাষা যেন কোন্ মন্ত্রবলে হারিয়ে গিয়েছে। তার চোখের তারায়ও কোনও ভাষা ফোটেনা ইদানীং। কনকপ্রভার কোনও সান্ত্বনাই কাজ করেনি ওর মনে। কনকপ্রভা মনে মনে প্রমাদ গোনেন। মেয়ের সাম্প্রতিক মতিগতি তাঁকে চিন্তায় ফেলে দেয়। আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো মেয়েটা আচমকা বাস্তবের শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে কতখানি আহত হয়েছে, কতখানি রক্তক্ষরণ ঘটেছে বুকের মধ্যে সেটাই নির্ণয় করবার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যান কনকপ্রভা। কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসতে বলেছিল দাদারা। কনকপ্রভা অনেক ভেবেচিন্তে আপাতত স্থগিত রেখেছেন সেটা। আগে মেয়েটা পুরোপুরি সুস্থ হোক, দেহে এবং মনে। তারপর না হয় বেড়িয়ে আসা যাবে কোথাও। এই অবস্থায় মেয়েটাকে নিয়ে একলা কোথাও যাওয়া, বড় ভয় করে কনকপ্রভার।

ধীর পায়ে গাড়ির কাছে ফিরে আসেন কনকপ্রভা। কুন্তী উঠে বসেছে। অস্তগামী সূর্যের লাল চাকতিখানার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে ও। কনকপ্রভার মনে হয়, তাকিয়ে রয়েছে বটে, তবে সূর্যটাকে দেখছে না কুন্তী। কিছুই দেখছে না সে। সম্ভবত এই মুহূর্তে সে বুকের অতল গহ্বরে পৌঁছে গিয়ে কারোর সঙ্গে একান্ত কোনও বোঝাপড়ায় রত।

খুব সন্তর্পণে গাড়িতে চড়ে বসেন কনকপ্রভা। কুন্তীকে টেনে নেন কোলে। গাড়ি চলতে শুরু করে। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চোখ বোঁজে কুন্তী। সম্ভবত পৃথিবীর বুকে আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে সে নিজেকে মুড়ে নিতে চায় তার স্বরচিত অন্ধকারের মোড়কে। দুনিয়ার বুক থেকে শেষ আলোটুকু মুছে যাওয়ার আগেই আলো প্রবেশের সব দরজাই স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দেয়।

১৪. ফণা তোলে বাঁশমুগরা সাপ

হাটের মধ্যে ঘুরছিল অগ্নি। একা একা। দেখলে মনে হবে, কাউকে খুঁজছে।

চুয়ামসিনায় কিছুদিন যাবৎ হাট বসেছে। রোববার, বেস্পতিবার। বছর খানেকও হয়নি,

ইতিমধ্যেই জমজমাট। লোখেশোলের ডাঙা, যার একপ্রান্তে হাইস্কুল, অন্যপ্রান্তে গোটা পাঁচ-ছয় মউল গাছকে কেন্দ্র করে মাঝারি মাপের হাট। চারপাশের গাঁয়ের মানুষজনই খদ্দের।

অগ্নি এসেছিল খানিক শাকপাতা নিয়ে। গুটিকয় বকফুল। গোটা চারেক মুরগির ডিম। বিক্রি হয়ে গেছে সাঁঝপ্রহরে। বাড়ি ফিরবে এবার। হাটের পূব প্রান্তে, যেদিকে চপ-ফুলারির দোকান গোটাকয়, সামান্য মিঠাইও রাখে, জিলাবি, গুড়ের গজা, নারকোলের নাড়ু, চিনির কদমা - এইসব, অগ্নি ঐ এলাকায় হাঁটাহাঁটি করছিল। সামান্য কিছু জিলাবি কিম্বা গজা কেনার ইচ্ছে। গোরাচাঁদ এসেছে স্কুল থেকে। গরমের ছুটি পড়েছে ওদের। ঐ কারণেই মিষ্টির দোকানের আশেপাশে হাঁটাহাঁটি। নইলে নিজের জন্য আর কবে মিষ্টি কেনে অগ্নি। তিলক বাউরি ফি-হাটে পাঁপড় ভাজে। বিষ্টুপুর বাজার থেকে পাঁপড় কিনে আনে। তেল কিনে নেয় রাসবিহারীর দোকান থেকে। বাড়ির থেকে কড়াই, ছানতা আর বাঁশের ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে চলে আসে হাটে। চপ-ফুলারির দোকানের আশেপাশে, খোলা ডাঙার ওপর তিনখানা মাকড়া পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে নেয়। চারপাশ থেকে শুকনো কাঠকুটো জুটিয়ে নেয়। গরমাগরম ভেজে দেয় পাঁপড়, কড়াই থেকে তুলতে না তুলতেই উধাও। অগ্নি দেখল, তিলকের কড়াইতে টগবগিয়ে ভাসছে হলুদ রঙের পাঁপড়। চারপাশে ভিড় জমেছে মূলত বাচ্চাদের। কিনছে, আর কুড়মুড়িয়ে খাচ্ছে। পাঁপড় ভাজতে থাকা দেখতে খুব ভাল লাগে অগ্নির। খুব মজাদার ব্যাপার সেটা। যখন কাঁচা পাঁপড় কড়াইতে ছাড়ে, কতই না ছোট, তেলের মধ্যে এক ডুব মেরে যখন ভেসে ওঠে, কতই না বড়। বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ মুরারি। প্রায় ফি-হাটেই বিকিকিনির পর তিলকের উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ পাঁপড় ভাজবার দৃশ্যখানি অপলক দেখে অগ্নি। দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। আজ তিলকের দোকানের সামনে বেজায় ভিড়। অগ্নি দূর থেকে দেখেই অন্য দিকে ঘুরে যায়। ভিড়টা একটু কমুক, তারপর ফের আসবে।

গোরাচাঁদ এ ক'মাসে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। গায়ে বেশ জৌলুষ এসেছে। চামড়ার রঙে চেকনাই। সেই রুখাশুখা শরীর আর নেই। এখন সকাল হলেই সে বাবু-ঘরের ছেলেপিলেদের মতো দাওয়ায় তালাই পেতে বইপত্তর নিয়ে পড়তে বসে যায়। বেশ ভাবগম্ভীর মুখ করে দুলে দুলে চেঁচিয়ে পড়তে থাকে : কে বলে তুমায় বন্ধু অস্‌পিশ্য, অশুচি/শুচিতা ফিরিছে সদা তুমার পিছনে/তুমি আছ গিহবাসে, তাই আছে রুচি/ নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে....। প্রায় পুরো সকালটাই দুলতে দুলতে পড়তে থাকে গোরাচাঁদ। অগ্নি সারা সকাল গেরস্থালি কাজ কামের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে বারবার দেখে দেয় সে দৃশ্য। দেখতে দেখতে যেন আশ মেটে না তার। এক ধরনের গুমোর তৈরি হয় মনে। পড়তি দুপুরে কুঠরির মধ্যে তালাই পেতে মা-ব্যাটাতে শুয়ে থাকে। গুনগুনিয়ে কথা চলে দু'জনার। গোরাচাঁদ তার বোর্ডিং-এর জীবনযাত্রা বিতাং করে বলে। সে বর্ণনাতে সামান্য খুঁত থাকে না। শুনতে শুনতে বুঁদ হয়ে যায় অগ্নি। গোরাচাঁদ কোনও কারণে থামলেই তৎক্ষণাৎ উসকাতে থাকে, বল্, থামল্যি যে? গোরাচাঁদ আবার শুরু করে।

গোরাচাঁদ ঘরে ফেরায় অনেক কাজ বেড়েছে অগ্নির। বনবাদাড় ঢুঁড়ে আনে ঘি-করলা, বন-কুঁদরি।। শালকাঁকির ডাঙার মাঝ বরাবর ঝকঝকে বালির ওপর ফুটেছে রাশি রাশি বালি-

ছাতু, যেন কেউ বেভ্ভুলে ছড়িয়ে দিয়েছে এক ঝুড়ি খই, অগ্নি খুঁটে খুঁটে তুলতে থাকে সারা সকাল। ছাতু তুলতে তুলতে বুঁদ হয়ে যায়। সন্ধে বেলায় টক-আমানি দিয়ে কুঁড়ো মাখিয়ে কুঁড়োজালিতে ভরে দিয়ে পেতে রেখে আসে ডোবার হাঁটু জলে। সকালে কুঁড়ো জালি তুললেই ঝাঁক বেঁধে বসে থাকে ডাগর চিংড়িমাছ। এসব পরিপাটি করে রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় গোরাকে। আসকা পিঠে বড়ই ভালবাসে গোরা। অগ্নি জোগাড়যন্ত্র করছে। বানাবে একদিন। তিলককেও ডাকবে। এই সব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অগ্নি তার মনের একটা পুরোনো কৌতূহল মিটিয়ে নিতে চায়। বড় ইচ্ছে করে তার, গল্পগাছার মুহূর্তে একদিন গোরাকে সরাসরি শুধোবে, কেন সে ঐ দিন বোর্ডিং ঘরের একপ্রান্তে অগ্নিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে বসল, তিলক কাকা, খো-ব ভাল? কেন? কী উদ্দেশ্য ছিল ওটা বলবার? কী চায় সে মনে মনে? এ ক'দিনে বেশ কয়েকবার নিজেকে প্রস্তুত করেছে সে। কেমন করে শুধোবে কথাটা, গুছিয়ে নিয়েছে মনে মনে। কিন্তু ঠিক মুহূর্তে পিছু হটেছে। কথাগুলো ঠোঁটের দুয়োর অবধি এসেও থমকে দাঁড়িয়েছে। সহসা রাজ্যের সঙ্কোচ, কুণ্ঠা যেন গ্রাস করেছে ওকে। প্রশ্নটা শেষ অবধি অনুচ্চারিত থেকে গেছে।

আরও একটা কথা বলবার জন্য হাঁকুপাঁকু করেছে মন। গজেন এসেছিল। এই খবরটা গোরাকে দিতে চেয়েও কিছুতেই দিতে পারল না অগ্নি। তার ভয় করল। হ্যাংলা ছেলেটা আবার না বাপ-বাপ বলে পাহাল পাড়তে শুরু করে। অগ্নি তো জানেই, সেই ছেলেবেলা থেকে বাপের জন্য এক ধরনের হাহাকার থেকে গেছে গোরাচাঁদের মনে। সেটা এখনও অবধি বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে'রয়েছে কিনা কে জানে!

হাটের একদিকে মউল গাছের তলায় বসেছে মোরগ লড়াইয়ের জমজমাট আসর। আগে শীতকালে মোরগ লড়াইয়ের আসর বসত গাঁয়ে-ঘরে। হাট বসবার পর থেকে ফি-হাটবারে বসে যায় মউল তলায় আসর। চারপাশে গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে দাঁড়িয়েছে শতাধিক মানুষ। হৈ-হল্লার ধরন দেখে বোঝা যায় খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দু'ষাঁড়ায়। অগ্নি এগোয় না। মাঠের একেবারে পশ্চিম ধারে সায়েরবাঁধের পাড়ে আশথ গাছের তলায় পচাই আর দেশি মদের হাট বসেছে। আশেপাশে ছোলা ভাজা আর চানাচুর নিয়ে বসেছে দু'এক জনা। মাছি ভনভনিয়ে উড়ছে। মাটির মালসায় পচাই খাচ্ছে জনা কয়। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে ওরা। জনা কয়েক বুঁদ হয়ে শুয়ে রয়েছে খোলা মাঠে। উৎকট গন্ধে ভরে গিয়েছে চারপাশের বাতাস। অগ্নি ওদিকেও যায় না। তার বদলে, তার বরং যেতে ইচ্ছে করে উই-টিকরার দিকে। টিকরার পাশটিতে গুণিন বসেছে তাবিচ-কবচ-মাদুলি সাজিয়ে। হিংজুড়ির গুণিন। নাম জানে না অগ্নি। তবে ফি-হাটে আসে লোকটা। ঐ এক থানে বসে। সামনে, চট বিছিয়ে, তার ওপর সাজিয়ে রাখে হরেক জাতের তাবিচ-কবচ-মাদুলি, জড়িবুটি, নখ-দাঁত, ধনেশ পাখির হাড় ...। হাত দেখে ভবিষ্যত ব্যাখ্যা করে গুণিন। কবচ-মাদুলি দেয়। সর্বক্ষণ তার চারপাশে বেজায় ভিড়। ফি-হাটে ঐ জায়গাটা বড় টানে অগ্নিকে। ভারি ইচ্ছে করে, নিজের হাতখানা একবার গুনিয়ে নেয়। কী আছে তার ভবিষ্যে। কী লিখে রেখেছেন বিধাতা। জানতে ভারি লোভ হয়। ফি-হাটবারেই গুণিন ওকে টানে। পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হয় উই টিকরার পাশে। বারংবার ইচ্ছে করে গুণিনের সামনে গিয়ে ঝুপ করে বসে

পড়ে। হাতখানি এগিয়ে দেয়। প্রতিবারেই শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। আচমকা এক ধরনের ভয়, তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। কে জানে, কী না কী বলে বসে গুণিন! এমন সে কথা, হয়ত অগ্নির পক্ষে সহ্য করাই দায় হবে। পায়ে পায়ে পিছু হটে সে। একটু একটু করে একেবারে তিলকের পাঁপড় ভাজার পাশটিতে গিয়ে পৌঁছে যায়।

বেছে বেছে খানিকটে গুড়ের গজা কেনে অগ্নি। শাড়ির আঁচলের খুঁটে ভাল করে বেঁধে নেয়। তিলকের পাঁপড় দোকানে এসে দেখে ভিড়টা পাতলা হয়েছে।

—একটা পাঁপড় দে তো রে তিলক। গোরার তরে লিয়ে যাব।

উনুনের ফুঁ দিতে দিতে হাঁফিয়ে উঠেছে তিলক। চোখে ধোঁয়া লেগেছে। জল ঝরছে। ঐ অবস্থায় তাকায় অগ্নির দিকে। তাকাবার কালে ধোঁয়ার চোটে ছোট হয়ে আসে দু'চোখ। দেখে মায়া জাগে অগ্নির মনে। বলে, বাতুয়া রুগীর সিনান, আর ব্যাটা ছেইলার উনান, - দুটাই দিগ্‌দারির কথা। লে, সর দেখি, সর। তেড়ে-মেড়ে এগিয়ে যায় অগ্নি। চোঙা কেড়ে নেয় তিলকের হাত থেকে। জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকে। হুতহুতিয়ে জ্বলে ওঠে আগুন। অগ্নি দেমাকি চোখে তাকায় তিলকের দিকে। তিলক থির পলকে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করে অগ্নির দেমাক।

সহসা অগ্নি বায়না ধরে, আমি পাঁপড় ভাজব।

—একদম ঝামেলা করিস নাই। তিলক ক্ষেপে যায়, তুই আমার বেবসাটা চৌপট কইরে দিবি। আমার বলে খইদ্দার বাইড়ছে।

মুখ হাঁড়ি করে উঠে দাঁড়ায় অগ্নি। তিলককে একটা কপট মুখ ঝামটা দেবার তাল করছিল, তার আগেই, সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই, মুখখানা কালো হয়ে যায়। আচমকা সামনে উই-টিকরার কাছাকাছি, সাপ দেখে অগ্নি। এক বিশাল বাঁশমুগরা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সুমুখে। অগ্নির দিকে থির পলকে তাকিয়ে রয়েছে সাপটা। ভিড়ের ভেতর থেকে তার চোখদুটি টিকিয়ার পারা জ্বলছে!

গজেন।

আশথ তলার তাড়িখানার দিক থেকে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল নিজের খেয়ালে। আচমকা তিলকের পাশে অগ্নিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।

গজেন এখানে কী করে এল? অগ্নি ভেবে দিকদিশা পায় না। সেদিন অগ্নির রণচণ্ডী মূর্তির সামনে থতমত খেয়ে তো চলে গেল লোকটা। আবার কবে ফিরে এল? তবে কি গজেন যায় নি? চুয়ামসিনা কিংবা আশেপাশেরই কোনও গাঁয়েই কি ডেরা পেতেছে সে? সারা শরীর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে অগ্নির। এক ঝটকায় তুলে নেয় বাজারের থলিখানা। তারপর আচমকা দৌড়তে থাকে বাউরিপাড়ার দিকে।

তিলক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে দ্রুত অপসৃয়মান অগ্নির দিকে। অগ্নি তখন বায়ু বেগে ছুটছে।

১৫. জাতির জনকের জন্মদিন

ভারত যখন স্বাধীন হল, সেই মুহূর্তে সারা ভারতে মোট ৫৬৫ জন রাজা, মহারাজা, নবাব ছিলেন। তাঁরা ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড এবং এক-চতুর্থাংশ মানুষকে শাসন ও

শোষণ করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের গড়ে এগারোটা উপাধি, গড়ে প্রায় ছ'জন মহিষী এবং অগুনতি নর্তকী, রক্ষিতা ও উপপত্নী ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই গড়ে তেরটি সন্তান, ন'টি হাতি, তিনটি ব্যক্তিগত রেল-কামরা, তিনটি রোলস্‌রয়েস গাড়ি ছিল। এবং তাঁরা প্রত্যেকে সারা জীবনে গড়ে তেইশটি বাঘ মেরেছিলেন....।

অনাথবন্ধু থামলেন। শালকাঁকির ডাঙার একপ্রান্তে কুচলা গাছের ছায়ায় বসেছেন ওঁরা। সুকুমার আর পরীক্ষিত বাউরি বসে বসে পুরোনো দিনের গল্প শুনছিল অনাথবন্ধুর কাছে। অনাথবন্ধু যখন গল্প শোনান, মনে হয়, ঘটনাগুলি, চরিত্রগুলো, তাদের যাবতীয়পটভূমি সহকারে হাজির হয় চোখের সুমুখে।

ওদিকে, ডাঙার অপর প্রান্তে 'মিতালি সংঘ'র সামনের মাঠে সেই মুহূর্তে মহা কলরব।

কলরব তুলেছে ক্লাবের ছেলেরা।

প্রভঞ্জনের নেতৃত্বে ডাঙার মধ্যিখানে বিশাল মণ্ডপ বাঁধা চলছে। ময়ূরকণ্ঠী লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে সবকিছু দেখভাল করছে প্রভঞ্জন।

বাউরি আর সাঁওতাল পাড়ার জনাকতক ছোকরা খুঁটি পুঁতে মণ্ডপের ফ্রেম বাঁধছে। ত্রিপল ডাঁই করে রাখা হয়েছে পাশে। গতকাল গরুরগাড়ি বোঝাই করে ত্রিপল আনা হয়েছে ব্লক থেকে। এমনিতে এসব ত্রিপল বেরোয় না গোডাউন থেকে। বর্ষায় যাদের বাড়িঘর ভেঙেছে তারা বারংবার ধরনা দিয়েও একটি ত্রিপল পায়নি। কিন্তু এ হল আলাদা উপলক্ষ্য। জাতির জনকের জন্মদিন পালন করবে 'মিতালি সংঘ'র ছেলেরা। হরবল্লভ ঐ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, তস্য পুত্র প্রভঞ্জন সেক্রেটারি। আর, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বয়ং বিডিও সাহেব। কাজেই, রিলিফ ক্লার্ককে হুকুম দিয়ে প্রভঞ্জনের দিকে তাকান তিনি, কারেও দিই না এসব ভালুয়েব্‌ল আর্টিকেল। তোমাগো ক্লাবের কাজে-কম্মে প্লিজড্ হইসি, তারই লগে দিলাম। সাবধানে হ্যান্ডেল কইরো।

সকাল থেকে বুদ্ধদেবকে থাকতে হয়েছে এদের সঙ্গে। বিডিও সাহেবের হুকুম। কি? না, তুমি হইলা গ্রামসেবক। গ্রামের সামাজিক কাজকর্মে তোমার ইনভলভ্‌মেন্ট চাই। বিপদবাবু ব্লকের সমাজ শিক্ষা অফিসার, এস-ই-ও, তাঁর এতক্ষণে এসে পড়বার কথা। তিনি এলেই প্রোগ্রামটা ফাইনাল করা হবে।

বুদ্ধদেবের দৃষ্টি মণ্ডপের প্রতি ছিল না। সারা তল্লাটে বুভুক্ষু মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। আশ্বিনের প্রবল অন্নাভাব তাদের শরীরের শেষ রসটুকু নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর উপবাসের দিনে গুটিকয় সচ্ছল সুখী মানুষের সম্ভোগ চলছে জাতির জনকের জন্মদিন পালনের নামে। আজকের কর্মসূচী বুদ্ধদেব মোটামুটি জানে। গান-বাজনা, আবৃত্তি-নাটক, এবং অনুষ্ঠানের শেষে সিংহগড়ে কনুই-ডোবানো ভোজ। অথচ যাদের নিয়ে গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল, আদিগন্ত সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে তাদের কোটরের পাতালে মণিজোড়া স্থির, ভাষাহীন।

কাজকর্মের পাশাপাশি থাকতে থাকতে এক সময় বুদ্ধদেব দেখতে পায়, ডাঙার অপর প্রান্তে কুচলা গাছের তলায় বসে রয়েছেন অনাথবন্ধু, সুকুমার আর পরীক্ষিত বাউরি। বুদ্ধদেব পায়ে পায়ে চলে আসে ওদের কাছে।

এই 'মিতালি সংঘ'র আইডিয়াটা বেরিয়েছে বিপদবাবুর মাথা থেকে। একদিন সিংহগড়ে মাছের মুড়ো ভাঙতে ভাঙতে তিনিই জুগিয়েছিলেন বুদ্ধিখানা।

—একটা ক্লাব গড়ুন গাঁয়ে।

— ক্লাব?

—হ্যাঁ। তরুণদের জোট বাঁধবার জায়গা। কাজ করবার জায়গা। প্রভঞ্জনটা করে কি? সারাক্ষণ তো রাধানগরে নয়তো বিষ্টুপুরে আড্ডা মারতে দেখি। প্রায় অভিভাবকতুল্য গাম্ভীর্য সহকারে প্রভঞ্জন সম্পর্কে এবংবিধ আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন বিপদবাবু, যা অন্য কেউ করলে সইত না সিংহগড়ের সিংহতনয়টি। কিন্তু বিপদবাবু যে শুভানুধ্যায়ী। বকবেনই তো। বাপ ছেলেকে বকে না? বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান বিপদবাবু। গলাটা সামান্য খাটো করে বলেন, সামনে ঘোর বিপদ। মানুষকে বিভ্রান্ত করবার লোকের অভাব নেই। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়। চতুর্দিকে দিশেহারা হয়ে দৌড়ুতে লেগেছে। এই দৌড়ুনোটা রোধ করা দরকার। নইলে মহা বিপদ।

সত্যি, হরবল্লভকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, চারপাশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সিংহগড়ের চারপাশে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা একটু একটু করে কমছে। জমিদারী একটা নিগড় ছিল। বেশ শক্তপোক্ত নিগড়। জমিদারী নেই। ওদিকে, মানুষের চোখ ফোটাবার মানুষ বেড়েছে ঢের। এখন নিগড় বলতে কেবল ঋন-দাদন, মহাজনী-তেজারতি, অর্থবল, আর সেই সুবাদে রয়েছে এখনও অবধি, 'ষোলআনা' নামক সর্বশক্তিমান ভূতটি, যা হরবল্লভের হাতে পুতুলের মত নাচে। এখনও অবধি 'ষোল আনা' বেশ বড়সড় নিগড়। মানুষকে ডুবোতে ভাসাতে এর জুড়ি নেই। সব মিলিয়ে এখনও অবধি সব ঠিকঠাকই চলছে। চাকাটা ঘুরছে। কিন্তু হরবল্লভ দিব্যচক্ষে দেখতে পান এই ঘোরাটা আসল নয়। বনবন করে ঘুরতে থাকা চাকাটি, ঘোরানো বন্ধ করবার পরেও যেমন থামতে সময় নেয়, তেমনটাই ঘটছে হরবল্লভদের ক্ষেত্রেও। জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার শাসন-ক্ষমতা আইনত চলে গিয়েছিল হরবল্লভদের হাত থেকে। দেশের মানুষ আর তাদের প্রজা রইল না। কিন্তু তাও যে সবকিছু প্রায় অটুট রয়েছে আজ অবধি, সেটা ঐ ঘোরানো বন্ধ করবার পরও চাকার শেষ কয়েক পাক ঘুরে যাওয়ার মতোই। ঘুরতে, ঘুরতে, ঘুরতে, এক সময় থেমে যাবে চাকাটা। যাবেই। 'ষোলআনা'তেও হরবল্লভদের ষোলআনা প্রতিপত্তি থাকবে না চিরকাল। তার আগেই একটা বিকল্প শক্তিকেন্দ্র চাই হরবল্লভদের। শক্তি ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচা সম্ভব নয়। নিরাপদও নয়। প্রজন্ম ধরে বাঘের পিঠে চড়ে রয়েছেন হরবল্লভরা। বহুৎ জুলুম করেছেন বাঘটার ওপর। এখন, অবস্থার ফেরে, পিঠ থেকে নেমে পড়লেই, সে খাবে। নামা চলবে না, কাজেই, কিছুতেই। যে কোনও পন্থায়, যে কোনও মূল্যে, যতদিন সম্ভব চড়ে থাকতে হবে বাঘটার পিঠে। এমনই সব ভাবনা-চিন্তার মুহূর্তে বিপদবাবুই দিয়েছিলেন বুদ্ধিটা।

—এখন হল তরুণদের যুগ। তরুণরাই আগামী দিনের শক্তি। তরুণদের জোটখানাকে স্বপক্ষে ধরে রাখতে পারলে—। প্রভঞ্জন একটা ক্লাব গড়ুক। তাতে চুয়ামসিনা এবং চারপাশের পাড়াগুলোর তাবৎ ছোকরা ভর্তি হোক। সরকারও তাই চায়।

— সরকার চায় কেন?

— এই কারণেই যে আপনারা আগামীকাল যেটা ভাববেন, আপনাদের ওপরওয়ালারা গত পরশুই সেটা ভেবে ফেলেছেন।

পরামর্শটা বেশ মনঃপুত হয়েছিল হরবল্লভের। সেই সুবাদে চুয়ামসিনার ধুতমা ডাঙায় গড়ে উঠেছিল 'সর্বসাধারণের' জন্য 'ক্লাপ ঘর'। বাউরি-বাগদি পাড়ার মানুষ বলত 'ইলাপঘর'। খড়-বাঁশ জুগিয়েছেন হরবল্লভ। অন্ত্যজ পরিবারের সন্তানেরা গায়ে-গতরে শ্রম দিয়েছে। সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ট্রানজিস্টার রেডিও, ক্যারাম বোর্ড, হ্যাজাক লাইট, ফুটবল, ভলিবল, নেট, শতরঞ্চি...। রাত পাহারার জন্য টর্চলাইট, বল্লম...। বিপদবাবুর সৌজন্যেই মিলেছে এসব। চুয়ামসিনার সাবেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'যোলআনা'র পাশাপাশি আর এক নতুন ভূতের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ভূতটা এখন হরবল্লভের ইঙ্গিতে প্রভঞ্জনের হাতে নাচে। ভূতটার পোশাকি নাম 'মিতালি সংঘ'। ওরা এখন রবীন্দ্রজয়ন্তী করে, স্বাধীনতা দিবসের প্রভাত ফেরি, জাতির জনকের জন্মদিন উদ্‌যাপন, ফুটবল ম্যাচ, চোরের বিচার, নাইট স্কুল, সরকারি দুধ বিতরণ...., আর চার পাশের কাউকে টাইট দেবার দরকার হলে হরবল্লভের ইঙ্গিতে প্রভঞ্জনের নেতৃত্বে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে যুবক বাহিনী। হরবল্লভ ঠোঁট উল্‌টে বলেন, ক্লাবের ছগ্‌রারা কচ্ছে, আমার কি বইল্‌বার আছে!

আজ মল্লিকা আসবে। বুদ্ধদেব ভাবে। সে গ্রামসেবিকা। গ্রামাঞ্চলের এই ধরনের অনুষ্ঠানে সামিল হওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিকেল নাগাদ বিডিও সাহেবের জীপে চড়েই আসবে ওরা তিনজন। মল্লিকা, আর এক গ্রামসেবিকা শেফালি এবং মুখ্য গ্রামসেবিকা রেণুদি। কুন্তীকে নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছে দু'জনের মধ্যে। কুন্তীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বেশ কিছু গালগল্প কারা যেন রটিয়ে দিয়েছে। ব্লক অফিস অবধি পৌঁছে গিয়েছে সেটা। মল্লিকার কানেও গিয়েছে। এমনিতে খুব চাপা মেয়ে মল্লিকা। মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝা কঠিন। বুদ্ধদেবের সন্দেহ হয়, আপাত শান্ত মেয়েটির মনের গভীরে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব জানে, মুখ ফুটে সেটা কিছুতেই প্রকাশ করবে না মল্লিকা।

সুকুমার বলে, তবে যে বলা হয়, পুরা ভারত ছিল ব্রিটিশের অধীনে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নাকি সূর্য অস্ত যায় না? এতগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল এই আমাদের দেশে?

—ছিল। অনাদি ডাক্তার চোখ বোঁজেন। ডুব মারেন। ব্রিটিশের অনুগত স্বাধীন রাজ্য ছিল ওগুলো। রাজস্ব দিত ব্রিটিশকে। তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল, বিচার-ব্যবস্থা ছিল। অসংখ্য দাসদাসী, ভৃত্যকুল, চোখ ধাঁধানো প্রাসাদ, আর ছিল সোনাদানা, হীরে মুক্তোর পাহাড়। যে যার রাজ্যের নিজস্ব আইন ছিল এবং রাজার ইচ্ছেই হল সেই আইন। নিজেদের রাজ্যের প্রজাকুলকে সদাসর্বদা শাসন শোষণ করত এরাই। সেখানে ব্রিটিশের উপস্থিতি ছিল খানিকটা প্রতীকী। নিয়মিত রাজস্ব দিলে, আর ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেই, ব্যস। বৃটিশ ভাইসরয়রা কোনও রাজার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পারতপক্ষে নাক গলাত না। গলাটা সামান্য খাটো করেন অনাথ ডাক্তার, স্বাধীনতার মুহূর্তে, এই ভারতবর্ষে দুটো ভারত ছিল। একটা

ইংরেজের ভারত, অন্যটা রাজা-রাজড়াদের ভারত। ইংরেজের ভারতটা স্বাধীন হলেও, রাজারাজড়াদের ভারতটা অত সহজে স্বাধীন হয়নি।

—কেন? তাঁরা কি আপত্তি করেছিলেন?

—করবে না? তাদের সাজানো বাগিচাটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল যে। বিশাল বিশাল প্রাসাদে শত শত দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকত ওরা, হীরে-মুক্তো জহরতে মুড়ে রাখত শরীর, নিজস্ব জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত, মুরগীর পেটে মুরগী ঢুকিয়ে খাঁটি গাওয়া ঘিতে ভেজে ভেতরেরটা নিজেরা খেতো, বাইরেরটা খেত অনুগত জনেরা। আর, যখন ইচ্ছে প্রজাদের ওপর যত খুশি কর চাপাত, করতে পারত ইচ্ছে মতো নিপীড়ন। তাদের রাজত্বে সাধারণ মানুষ জানোয়ারের চেয়েও খারাপ জীবন কাটাত। এই যে, চুয়ামসিনার সিংহবাবুরা, তোমরা তো দ্যাখোনি, যারা দেখেছে, তারা জানে, কত রকম জুলুম না করত প্রজাদের ওপর। কত ধরনের করই না চাপাত। জমিব জন্য খাজনা তো ছিলই, তার পরেও সিংহগড়ে পূজা-আচ্চা হবে, সে জন্য কর। ছেলে পড়তে যাবে, তার জন্য কর। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে, তার জন্য কর। বাবুরা তীর্থে যাবেন, সেজন্য কর। আর, সেই সব কর আদায়ের কত নিষ্ঠুর, হিংস্র পদ্ধাত! কতটুকুই বা জমিদারি ছিল এদের, তাতেই এই। আর সেইসব রাজা-রাজড়ারা, কত বড় বড় রাজ্য ছিল ওদের। হায়দ্রাবাদের নিজাম কিংবা কাশ্মীরের মহারাজার রাজ্যখানির আকার ছিল পশ্চিম ইউরোপের আয়তনের সমান। খানাপিনা, রাজকীয় খেলাধুলো, শিকার-মৃগয়া, প্রাসাদ নির্মাণ, ব্যক্তিগত হারেম আর নাচঘরটিকে সুন্দরী রমনী আর জৌলুষ দিয়ে সাজানো ছাড়া আর কোনও কাজই ছিল না ওদের। ইংরেজরা যখন এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইল, যখন সারা দেশটাকে নিয়ে একটা প্রজাতন্ত্র বানানোর প্রস্তাব এল, এই সব আরাম-বিলাসে ডুবে থাকা রাজামহারাজাদের বুক কেঁপে উঠেছিল আশঙ্কায়। ওরা সবাই একজোট হয়ে বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিল, একটা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সারা দেশে। বহু আশা দিয়ে, প্রলোভন দিয়ে, ওদের শেষ অবধি রাজি করালেন কংগ্রেসী নেতারা, অনেক লোভনীয় শর্তের বিনিময়ে, তাও তো সারা দেশটাকে তিন টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা করা গেল না। কাশ্মীরের অর্ধেকটা না ছেড়েও উপায় রইল না। স্বাধীনতার ঐ সময়টাকে তোমরা কোন্ চোখে দেখেছ জানি না, কিন্তু আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছিল দুঃখে। আজীবনকাল নিজের কথা না ভেবে যে লড়াই চালিয়ে গেলাম আমরা, তার এমন করুণ পরিণতি হবে ভাবিইনি। অনাথ ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন বহুকষ্টে। আসলে তখন আমাদের এসব মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না। নেতারা যে কোনও মূল্যে স্বরাজ চাইছিল।

—জানি। সুকুমার পাশ থেকে বলে ওঠে, আসলে, তখন বাঘ পেইয়ে গেছে রক্তের স্বাদ।

—কি রকম?

—আংশিক স্বায়ত্ত শাসনের সুবাদে নেতারা বুঝে গিছেন, রাজা হবার কত সুখ।

—তার চেয়েও বড় কথা, অনাথ ডাক্তার বলেন, দেশী পুঁজি তখন সাবালক হতে চায়।

ব্রিটিশ থাকতে এদেশী পুঁজিপতিরা পাত্তা পাচ্ছিল না। তখন ব্রিটিশ পুঁজি রমরমিয়ে খাটছিল এদেশে। এদেশের কাঁচামাল জলের দামে নিয়ে গিয়ে ইংলন্ডের কারখানাগুলো রমরমিয়ে চলছিল। ওদের দেশের বেকার সমস্যা ঘুচছিল। আবার, তৈরি মালে ভরে যাচ্ছিল এ দেশের বাজার। ব্রিটেন দিনদিন ফুলছিল। ভারতের দেশীয় পুঁজি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না কিছুতেই। দেশীয় পুঁজিপতিরা প্রমাদ গুনছিল অনেকদিন যাবৎ। ওরা বলল, তাড়াও তবে শালাদের। ওরা না যাওয়া অবধি আমাদের পুঁজি কুঁকড়ে থাকবে। সব দেশেরই পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয় থাকে একদল বুদ্ধিজীবী। প্রয়োজনে, মালিকের অঙ্গুলিহেলনে তারা নেমে পড়ে আসরে। এ দেশের পুঁজিপতিদেরও একদল পোষা বুদ্ধিজীবী ছিল। তারাই দেশময় হল্লা তুলেছিল, বিদেশীদের তাড়াও। দেশের মানুষ ভেবে নিয়েছিল, বুঝি সত্যিসত্যিই স্বাধীনতা চাইছে এরা। হাজারে হাজারে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার আন্দোলনে। নিজেদের সুখ, আরাম, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে বাজি রেখেছিল ওরা, স্বাধীনতার সেই লড়াইতে। ম্যাঞ্চেস্টারের দাপটে যখন দেশীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা নাস্তানাবুদ, তখনই ওদের বুদ্ধিজীবীরা কলবর তুলেছে, বিদেশী বস্ত্র বর্জন কর। বিদেশী নুন যখন এদেশীয় লবন ব্যবসায়ীদের বিপাকে ফেলেছে, হাতের মুঠোয় বন্দী বুদ্ধিজীবীরা শুরু করে দিল লবন আন্দোলন। স্বাধীনতার লড়াই নয়, দেশীয় পুঁজিকে নিরাপদ করবার লড়াই ছিল ওটা, দেশের মানুষ ওটাকে স্বাধীনতার লড়াই ভেবে ফেলেছিল। স্বাধীনতা নয়, ওটা আসলে ছিল বিদেশী পুঁজির বদলে দেশীয় পুঁজির অভিষেক পর্ব। মাঝখান থেকে লাখো মানুষের জীবন খোয়ার হয়ে গেল।

মাঝে মাঝেই এমন সব কথা বলেন অনাথ ডাক্তার। বুদ্ধদেবের মনে হয়, এই স্বাধীনতায় তিনি মোটেই খুশি নন। এর ভেতরকার ফাঁকিটা তিনি ধরে ফেলেছেন। যদিও তেমন উপলব্ধি তাঁর মধ্যে এসেছে অনেক দেরিতে, যখন আর নতুন করে শুরু করবার সময় নেই।

বুদ্ধদেব বলে, আমরা যারা সেই সময়টাকে ততখানি দেখিনি, বুঝিনি, আমাদের মনে হয়, দেশটাকে তিনটুকরো করবার বদলে স্বাধীনতা মেনে নেওয়া মোটেই উচিত হয়নি নেতাদের। জিন্না সাহেবের আবদার মেনে নেওয়া ঘোরতর অন্যায় হয়েছে।

—জিন্না সাহেবের কী দোষ? জিন্না সাহেবের কিছুই করবার ছিল না। অনাথবন্ধু সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তবে আর এতক্ষণ বললাম কি তোমাদের? দেশি পুঁজির মালিকেরা যখন বুঝে ফেলেছে যে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওদের পুঁজি গোহারান হেরে যাচ্ছে, তখনই না ওরা ব্রিটিশকে তাড়াতে চাইল। দখল করতে চাইল এদেশের বিশাল বাজারটাকে। মুসলিম পুঁজিপতিরা তখন থেকেই আশঙ্কায় ছিল। ব্রিটিশরা এদেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন এদেশি পুঁজির কব্জায় এসে যাবে পুরো দেশখানা, তখন হিন্দু পুঁজির কাছে মুসলিম পুঁজি গোহারান হেরে যাবে। এটা ওদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আর তখন থেকেই ওরা নিজেদের পুঁজি খেলাবার পৃথক ভূখণ্ড খুঁজছিল। যেখানে হিন্দু পুঁজির সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতা থাকবে না, নিজেদের পুঁজি খেলাবার জন্য একটা একান্ত নিজস্ব বাজার একচেটিয়াভাবে এসে যাবে ওদের কব্জায়। হিন্দু পুঁজি যেমন আসরে নামাল গান্ধী-

নেহেরুকে, মুসলিম পুঁজিও তেমনি জিন্নাকে। পুঁজিপতিরা চিরকালই বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগিয়ে এসেছে নিজেদের স্বার্থে। ফলে দাঙ্গা বাধল দেশ জুড়ে। দুই শ্রেণীর পুঁজিপতির নিজস্ব সাম্রাজ্য দখলের লড়াইতে মারা পড়ল দুই সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ। রক্তের নদী বইল চতুর্দিকে। হাজার হাজার মানুষ ঘর হারাল, সর্বস্ব হারাল। এত কিছুর বিনিময়ে কেনা হল দুটি সম্প্রদায়ের শোষণভূমি। তার গালভরা নাম দেওয়া হল স্বাধীনতা।

বলতে বলতে খুব ক্লান্ত মনে হয় অনাথবন্ধুকে। দৃষ্টিখানাকে লক্ষ্যহীন পাঠিয়ে দেন দূর আকাশে।

বুদ্ধদেব নিষ্পলক তাকিয়েছিল অনাথবন্ধুর দিকে। বেদনার সঙ্গে বিস্ময় মাখামাখি। বলে, শুধু নিজেদের পুঁজিকে নিরাপদ করতে দেশব্যাপী দাঙ্গা বাঁধিয়ে এমন রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল ওরা।

একটুকরো বিষণ্ণ হাসি খেলে যায় অনাথবন্ধুর ঠোঁটের কোণায়। বলেন, এটাকে সামান্য ব্যাপার বলে মনে হল তোমার? আশ্চর্য। সারা পৃথিবী জুড়ে এত এত দেশ যে ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাতে বন্দী ছিল এতকাল, বন্দী রয়েছে আজও, বন্দী থাকবে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরম্, এর পেছনে কারণটা কী? জান?

বুদ্ধদেব নিঃশব্দে মাথা দোলায়।

--দুটো। দুটো মাত্তর কারণ। বন্দী দেশের তাবৎ ঐশ্বর্য লুণ্ঠন, আর যুগযুগ ধরে কাঁচামালের সংগ্রহভূমি এবং পাকা মালের বাজার বানিয়ে প্রভুদেশের পুঁজিকে যৎপরোনাস্তি খেলানো। পুঁজি খেলানোকে সামান্য মনে করো তুমি। এর জন্য আরও অনেকদিন ধরে অনেক বেশি রক্ত বহাতে রাজি ওরা।

অনাথবন্ধুর কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি স্থির পলকে তাকিয়ে থাকেন সামনের ডাঙার দিকে, সেখানে 'মিতালি সংঘে'র সামনে প্রভঞ্জনের নেতৃত্বে স্টেজ বানাচ্ছে ক্লাবের ছেলেরা। বাউরি, বাগদি আর শিকারিপাড়ার কিছু ছোকরাও নিরুপায় হয়ে যোগ দিয়েছে ওদেব সঙ্গে। পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো ওরাই করছে। প্রভঞ্জনরা শুধু খবরদারি।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অনাথবন্ধু বলে ওঠেন, এই যে আজ, যে মানুষটার জন্মদিন পালন করছে এরা, জানে কি, কী কারণে মানুষটাকে মরতে হল?

—জানি। বুদ্ধদেব বলে ওঠে, তিনি জেদ ধরেছিলেন, দেশভাগ করতে দেবেন না, হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে থাকবে, তাতেই হিন্দুদের কট্টর সংস্থা আর-এস-এস'এর গোঁসা হল ওঁর ওপর।

—ওপর ওপর ব্যাপারটা তাই। কিন্তু গভীরে আরও গূঢ় কারণ। জহরলাল ছিলেন দেশি পুঁজির পেয়ারের লোক। তিনি দেশে ভারি শিল্প গড়তে চাইছিলেন, তাতে পুঁজিপতিদেরই লাভ। তিনি বিদেশি পুঁজিকেও নিরাপত্তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গোপনে। অন্য দিকে গান্ধীজী ছিলেন গ্রামীণ কুটির-শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে। তাতে দেশি পুঁজির বিকাশে বাধা পড়ত।

—কিন্তু তিনি তো দেশি পুঁজিপতিদের খুবই সমর্থন পেয়ে এসেছেন চিরকাল।

—পেয়েছেনই তো। ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য যতদিন যতখানি সমর্থনের প্রয়োজন ছিল, ওরা দিয়েছে। যখন বুঝেছে, আর ওঁকে প্রয়োজন নেই, বরং উনি থাকলে দেশীয় পুঁজির সমূহ বিপদ, তখনই ওরা সরিয়ে দিল ওঁকে। জহরলালের মতো নেতারাও শেষের দিকে খুবই অস্বস্তিবোধ করছিল ওঁকে নিয়ে। যখন, যেন তেন প্রকারেণ গদিতে বসতে ওরা উদগ্রীব, তখনই এমন সব উল্টোপাল্টা বায়না ধরলেন উনি, এমন জেদ ধরে বসে রইলেন! গান্ধীজীকে সরিয়ে দেওয়ায় দেশীয় নেতা এবং পুঁজিপতি উভয় তরফেরই সুবিধে হয়ে গেল, যাকে বলে, গলার কাঁটা নেমে গেল। আর-এস-এস তো উপলক্ষ্য। পুঁজিপতিরা তাদের স্বার্থ পূরণে বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংস্থা, রাজনৈতিক নেতা কাউকেই ব্যবহার করতে পিছপা হয় না। দ্বিধা করে না দেশব্যাপী রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে। ৪৬'এর দাঙ্গা তো পুরোপুরি দেখনি তোমরা। শুধু নিজেদের পুঁজিকে নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামুক্ত করতে দু'সম্প্রদায়ের পুঁজিপতিরা হাজার হাজার মানুষকে লড়িয়ে দিয়েছিল রাতারাতি। কাতারে কাতারে মানুষের কলিজা নিংড়ে খুন করেছিল। হাজার হাজার পরিবার তলিয়ে গিয়েছে। কত সম্পন্ন পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গিয়েছে। নোয়াখালির দাঙ্গার কথা তোমরা হয়ত শুনে থাকবে।

—শুনেছি। গান্ধীজী গিয়ে থামিয়েছিলেন।

—কী ক্ষমতা ছিল গান্ধীর যে তিনি ঐ সর্বনাশা আগুনকে নিভিয়ে দেন। আর, শুধু তো নোয়াখালিই নয়, শুধু তো বাংলাদেশেই নয়, সারা দেশজুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল আগুন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব কোথায় নয়? তার লেলিহান শিখায় কত পরিবার যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কে তার হিসেব রেখেছে! তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাঞ্জাব আর বাংলার। দেশটাকে তিন টুকরো করবার পরে অবশেষে নিভল সেই আগুন। দেশীয় পুঁজিপতিদের বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হল।

দাঙ্গা যে কী ভয়াবহ বস্তু সে সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ ধারণাই নেই ওদের। না বুদ্ধদেবের, না সুকুমারের। অনাথবন্ধু বলেন, আমি দেখেছি। ছেচল্লিশে, আমি তখন সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছি, অমনি লাগল দেশ জুড়ে প্রলয় দাঙ্গা। তখন ঐ আগুন নেভাতে দিন-রাত এক হয়ে গেছে আমাদের। মানুষের প্রতি কতখানি ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস যে পুরে দেওয়া যায় মানুষের বুকে, চিরকাল পাশাপাশি বাস করা মানুষগুলো যে কেমন রাতারাতি বদলে যায়, খুলে ফেলে আজীবন পরে থাকা সভ্যতা ভব্যতার পোশাকখানি, জন্তুর মতো নগ্ন হয়ে পড়ে তাদের তিলতিল চর্চিত সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতিবোধ, প্রাচীন গাছের বাকলের মতো খসে খসে পড়ে যাবতীয় মানবিক বোধগুলি, মানুষগুলোকে উন্মাদ, একেবারে উন্মাদ করে দেওয়া হয়, বাঁকুড়ার মতো জেলায় বসে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না তা। বাঁকুড়ায় তো ছেচল্লিশের দাঙ্গা হয়নি।

—তেমন নয়, তবে একেবারেই যে হয়নি তা নয়। কিছু কিছু জায়গায় হয়েছিল। সুকুমার বলে, আমরা তখন ছোট। পার্টিতে ঢুকিনি। তবে, পরীক্ষিতদা ভুক্তভোগী। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে মরতে বসেছিল একদিন।

অনাথবন্ধু পরিপূর্ণ চোখে তাকান পরীক্ষিত বাউরির দিকে। বলেন, সত্যি নাকি পরীক্ষিতদা?

পরীক্ষিত বাউরি ইদানীং মুখে কুলুপ এঁটেছে। পুরোনো দিনের কথা শুনতে চাইলে আরও একখানা তালা লাগিয়ে দেয় মুখে। সারা মুখ হয়ে ওঠে মেঘলা আকাশের মতো ঘোলাটে। অনাথবন্ধুর প্রশ্নে সে এক ঝলক তাকায়। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে দেয় মাটির দিকে। বিড়বিড়িয়ে বলে, বাদ দ্যান সিসব কথা।

—বাদ দেব কেন? সেসব দিনের কথা তো বেশি করে বলা উচিত এদের। এদের শোনা দরকার, বোঝা দরকার। এমনিতেই তো দরকারী কথাগুলোকে ভুলিয়ে দেবার হরেক ফন্দী আঁটা চলছে এদেশে। যারা জীবন দিল, তারা হারিয়ে যাচ্ছে দিনদিন। যারা নবাবী করছে গদীতে বসে, তারাই নাকি বড় ত্যাগী! যারা কোনদিন দেশের জন্য কুটোটি দু'টুকরো করেনি, তারা আজ বিরাট বিরাট দেশপ্রেমিক। বলতে বলতে অনাথবন্ধুর দৃষ্টি চলে যায় ডাঙা ভেদ করে 'মিতালি সংঘ'র দিকে। সেখানে এতক্ষণে উদয় হয়েছেন হরবল্লভ সিংহবাবু। হাত নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছেন ছোকরাদের।

সুকুমার মুচকি হেসে বলে, কেন? ফ্রিডম ফাইটারদের জন্য সরকায়ের কতকত কর্মসূচী। আপনি জানেন তো।

—শুনেছি। অনাথবন্ধু সহসা বেজায় গম্ভীর হয়ে যান, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লিস্ট তৈরি করা চলছে। দিল্লীতে পাঠানো হবে সেই লিস্ট। তারপর নাকি কপাল খুলে যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। মুড়ি-মুড়কির মতো সার্টিফিকেট বিলোনো চলছে।

—আপনি নেন নি?

—আমি? ধক করে জ্বলে ওঠে অনাথবন্ধুর চোখ দুটি।—সার্টিফিকেট কে দিচ্ছে জানো?

— জানি বৈকি। এম - এল - এ, সিদ্ধেশ্বর হাজরার দাদা কামেশ্বর হাজরা।

—কামেশ্বর হাজরা কোনদিন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে কিনা জানো?

—করেনি?

—কোনদিন জেল-হাজত তো দূরের কথা, একবারের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা শুধিয়ো তো।

—সে কি! সে তবে কেমন করে দিচ্ছে পাইকারি হারে ফ্রিডম-ফাইটারদের সার্টিফিকেট? কারা ফ্রিডম ফাইটার, সে জানতে পারছে কী করে?

—জানবার দরকার আছে কিছু? গনগনে হয়ে ওঠে অনাথবন্ধুর সারা মুখমণ্ডল, অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম যেন চরাচরম্ ...। অনাথবন্ধু ইদানীং ক্ষেপে গেলে শ্লেষে-ব্যঙ্গে ভেঙে পড়েন। শ্লেষ-ব্যঙ্গ মানুষের অন্তর্গত রোষের আগুনকে অনেকখানি শুষে নিতে পারে। অনাথবন্ধু শ্লেষ-ব্যঙ্গের অম্লমধুর উপমা দিয়ে ভেতরের প্রবল ভাঙচুরকে আড়াল করবার প্রবল প্রয়াস চালিযে যান। বলেন, গোলাকার রূপোর চাকতি সারা বিশ্ব চরাচরকে শাসন করছে যে। তার কাছে মানুষের চিরকালীন দাসত্ব।

—কিন্তু, টাকা নিয়ে ভুল লোককে সার্টিফিকেট দিয়ে পরে ধরা পড়ে গেলে, তখন?

—আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর এক চেলাকে। সে এখনও আমাকে কিঞ্চিৎ মানে, গোনে। তো, যা বলল, শুনে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ!

—কী বলল?

—বলল, সার্টিফিকেটে নাকি কামেশ্বর নিজে সই করে না। কাউকে দিয়ে নাকি ভুয়ো সই করায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে। সে কামেশ্বর হাজরার নাম সই করে চলেছে শয়ে শয়ে সার্টিফিকেটে। ফলে, কোনদিন জালিয়াতি ধরা পড়লেও কামেশ্বর হাজরাকে ধরা যাবে না। সে অবলীলাক্রমে বলে দেবে, এমন সার্টিফিকেট আমি দিই নাই। বলতে বলতে সহসা দপদপিয়ে ওঠে অনাথবন্ধুর চোখ দুটো। বলেন, বাদ দাও, বাদ দাও দেখি ওসব। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে ভাল লাগে না। তার চেয়ে পরীক্ষিতদার কথাই বরং শুনি। বাঁকুড়ার দাঙ্গার গল্প। কিন্তু অনাথবন্ধু জানেন, সুযোগ পেলেই সুকুমার আবার নুন ছেটাবে কাটা ঘায়ে। কারণ, এই উপায়ে সে জাগাতে চায় অনাথবন্ধুকে।

বিকেল না হতেই মাঠের মধ্যে বেজে ওঠে মাইক। চটুল গানের সুর মাতিয়ে দেয় আকাশ। অনেকক্ষণ থেকেই উলঙ্গ বাচ্চাদের ভিড় একটু একটু করে জমছিল চারপাশের পাড়াগুলোর থেকে। ওদের ভয়েই মঞ্চের সামনে শতরঞ্চি পাততে পারছিল না ক্লাবের ছেলেরা। পাতলেই পলকের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে বসে পড়বে ওরাই। ভদ্রবাড়ির লোকজন তখন বসবে কোথায়! দু'চার বার ধমক দিয়ে ওদের দূরে সরাবার চেষ্টা করেছে প্রভঞ্জন। কিন্তু বাচ্চাগুলো বেজায় নেই-আঁকড়া। ধমক খেয়ে সরে যায়, আবার ভিড় করে আসে পর মুহূর্তেই। শীর্ণ উদোম শরীর নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে নির্লজ্জের মতো। মাইকের আওয়াজে বয়স্ক মানুষজনও আসতে থাকে পাড়া ঝেঁটিয়ে। আজ এখানে 'ফান্‌সান্‌' হবেক। লাচ-গান হবেক। কাপড় বিলি হবেক। বিডো সাহেব আসবেন।

মঞ্চের পেছনে বসে শাড়ি-ধুতি বিতরণের একখানা তালিকা বানাচ্ছিলেন হরবল্লভ। সাকুল্যে আটখানা শাড়ি-ধুতি, খান দশেক জামা ও ফ্রক। ব্লকের রিলিফ দপ্তর থেকেই পাওয়া গেছে। তালিকার চোদ্দ আনাই হরবল্লভের মুনিশ-মাইন্দার, রক্ষিতরা। রতন শিকারি, ইন্দ্র বাগদি, বামুন মাসি, গদা বাউরি, — এদেরই পরিবারের লোকজন, কাচ্চা-বাচ্চা এগুলোর প্রাপক। বুদ্ধদেব জানত, তালিকাখানি এমনই হবে। এতে করে সরকারের বদান্যতাও দেখান হল, জাতির জনকের মান রক্ষাও হল, আর বর্ষচুক্তি অনুযায়ী যে কাপড়-চোপড় মুনিশ-মাইন্দারদের দেবার কথা, তারও সিংহভাগ দেওয়া হয়ে রইল। পরবর্তীকালে রতন শিকারিরা কাপড়-চোপড়ের প্রশ্ন তুললে লাল চোখে বলে দেওয়া যাবে, কাপড়? সেদিন ফান্‌সানের দিনে তবে কী পেলি তুয়ারা?

দিনান্তের লাল সূর্যটা যখন চুয়ামসিনার লালডিহির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ডুবছিল, ঠিক তখনই বিডিও সাহেবের জলপাই রঙের জীপখানা গর্জন তুলে এসে দাঁড়ায় 'মিতালি সংঘ'র সামনে। হরবল্লভ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যান। ছোকরার দল ছুটে আসে চারপাশ থেকে। ভোঁ-ভোঁ শব্দে শাঁখ বাজতে থাকে সমানে। উদোম মানুষজনকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিডিও সাহেবের জন্য পথ বানিয়ে দেয় প্রভঞ্জন এবং তার বাহিনী।

মঞ্চে বসেন বিডিও সাহেব। বসেন হরবল্লভসহ ভদ্রসজ্জনেরা। সামনের শতরঞ্চিতে 'ভদ্র' বাড়ির লোকজনেরা। ইস্কুল থেকে বেঞ্চি বয়ে এনে সাজিয়ে দিয়েছে দু'পাশে।

সম্মানীয় বয়স্করা বসেন। বাউরি-বাগদি-সাঁওতাল পাড়ার লোকজন এক্কেবারে পেছনে ন্যাড়া ডাঙার ওপর চাপটি খেয়ে বসে যায়। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে পেছনে।

ঘিয়ে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, গলায় সোনার চেন দুলিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিল প্রভঞ্জন। তারই ঘোষণা মত বিডিও সাহেবকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে হরবল্লভের মেয়ে উমা। দ্বিতীয় সুদৃশ্য মালাখানি দুলল হরবল্লভের গলায়। নিয়ম মতো কামদেব দত্ত, প্রমথ গাঙ্গুলি, ঝাড়েশ্বর নায়ক, মহাদেব কয়ালের মত গণ্যমান্যদের কপালেও জোটে একটি করে টগর ফুলের রোগাটে মালা। একখানা মোটাসোটা মালা ছিল কাঁসার রেকাবিতে। সেইটে হাতে তুলে নিয়ে বিডিও সাহেব এগিয়ে চললেন মঞ্চের একধারে। সেখানে কালো ফ্রেমে বাঁধানো, নীলরঙের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর তামাটে বর্ণের ছবি। চোখে গোল চাকতির চশমা, হাতে লাঠি, কোমরে ঘড়ি, হাঁটু অবধি কাপড়, খালি পা.....। মালা পরাবার আগে বিডিও সাহেবের সঙ্গে তাঁর চকিতের চোখাচোখি ঘটে যায়।

ছবির গলায় মালাখানি পরিয়ে দিতেই প্রভঞ্জনের দল চড়াচড় হাততালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে পাগল শিকারির দল ওদের কেঠো হাতের চাপড়ানিতে মুখর করে তোলে চুয়ামসিনার বাতাস। বেশ ভারিক্কি পা ফেলে ফেলে ফিরে আসেন বিডিও সাহেব। নিজস্ব চেয়ারে আসীন হন। এমনভাবে তাকান, যেন তাঁরই কোনও কৃতিত্বের কারণেই এই তুমুল হাততালি।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত গায় কুন্তী। কী গাব আমি কী শোনাব আজি আনন্দ ধামে ....। হরবল্লভের ছোট ছেলে দেবিদাস, বিষ্টুপুর হাইস্কুলে পড়ে, আবৃত্তি করল 'প্রশ্ন'। বেশ টেনে টেনে আবেগ সহকারে আবৃত্তি করল সে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ....। আবৃত্তি অন্তে বিডিও সাহেব তার পিঠে মৃদু হাত বুলিয়ে দেন। ভালো কইসো। বাঁইচিয়া থাকো। বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল কর।

আবৃত্তির পর সংবর্ধনা। চুয়ামসিনার নিবেদিতা মহিলা সমিতি বিডিও সাহেবকে সংবর্ধনা জানাবে। একে একে মঞ্চে উঠে আসেন অরুন্ধতী, উমা, কুন্তী ...। দামি শাড়ি আর গয়নায় সারা শরীর পরিপাটি করে মুড়েছে। বিডিও সাহেবকে পুষ্পস্তবক দিয়ে নমস্কার করেন অরুন্ধতী। একখানা রূপোর রেকাবিতে একখানা দামি শাল। রেকাবিখানা উমার হাতে। বিডিও সাহেব ফুলের স্তবকখানি দু'একবার নাকের সুমুখে ধরে রাখবার ফাঁকে চোরাচাহনিতে দেখে নেন মহার্ঘ সামগ্রীগুলিকে। মাখন মাখন হাসি ঝরে পড়ে মুখ থেকে।

জাতির জনকের কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন বিডিও সাহেব এবং হাইস্কুলের হেড মাস্টার মহাদেব কয়াল। বক্তৃতায় জাতির জনককে ছাপিয়ে বারংবার এসে যায় নেহেরু, অতুল্য ঘোষ আর হরবল্লভ সিংহবাবুর নাম। সব শেষে বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে সভার প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে নাটক। 'কর্ণার্জুন' পালা। অভিনয় করবে 'মিতালি সংঘ'র ছেলেরা।

মল্লিকা বসে ছিল বেঞ্চির এক কোণায়। বুদ্ধদেব লক্ষ করে, সারাটা সময় কুন্তীকে চোখে চোখে বেঁধে রাখতে চাইছে সে। গভীর দুটি চোখের মণি ভেদ করে বুঝি উঠে আসতে চাইছে এক অন্ধ আদিম ঈর্ষা।

১৬. গুড়ের ভাঁড় ও লোভী পিঁপড়ের গল্প

মাঝ রাস্তার ওপর একখানা গুড়ের ভাঁড় ভেঙে পড়ল। ধারেপাশে কোনও পিঁপড়ে ছিল না। একটুবাদে একটা পিঁপড়ে হন্তদন্ত হয়ে কী রাজকাজে যেতে গিয়ে আচমকা আশেপাশে গুড়ের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। একটু বাদে পেয়েও যায় গুড়ের সন্ধান। মনের আনন্দে খেতে থাকে গুড়। একটু বাদে দূর দিয়ে যেতে যেতে আরও একটা পিঁপড়ে দেখে, তার এক স্বজাতি-স্যাঙাৎ খুব মনোযোগ সহকারে কী যেন খেয়ে চলেছে। কৌতূহল বশে পায়ে পায়ে এসে, সেও পেয়ে গেল সাতরাজার ধন। এইভাবে, ধীরে ধীরে, তিন নম্বর, চার নম্বর, পাঁচ নম্বর পিঁপড়ের কাছে এবং অবশেষে এলাকার তাবৎ পিঁপড়ের কানে খবরটা পৌঁছে গেল যে, মাঝরাস্তায় একখানা গুড়ের ভাঁড় ভেঙে পড়েছে। তার কোনও ওয়ারিশ নেই। দেখতে দেখতে পিঁপড়ের দল জমতে লাগল গুড়ের চারপাশে। জমে উঠল গুড়ের ভোজ। গুড় খাওয়ার প্রতিযোগিতা। কে আগে খাবে, কে বেশি খাবে, তাই নিয়ে শুরু হল রগড়। দেখতে দেখতে দেশের তাবৎ পিঁপড়ে-কুল হাজির হল গুড়ের চারপাশে। হাজারে, হাজারে, লাখে-লাখে পিঁপড়ে। ততক্ষণে গুড়ের দখল নিয়ে ফেলেছে যারা, তারা ভুরু কুঁচকে তাকায়। পাশ ভিড়তে দেয় না। হ্যাংলা পিঁপড়ের দল চারপাশে নিরুপায় দর্শক হয়ে খাড়া থাকে। খিদেয় জ্বলে যায় তাদের পেট, কিন্তু উচ্ছিষ্টও জোটে না। ওদিকে, বেগতিক দেখে গুড়ের ভাঁড়ের দখলদার চতুর পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছে। গুড়ের দখল রাখতে সবকিছু করতে তৈরি তারা। তারপর একদিন ....।

সুকুমার আচার্য গল্প জুড়েছে পদম পুকুরের পাড়ে। শ্রোতা চুয়ামসিনা প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা। জহরলাল নেহেরু মারা গিয়েছেন। অকস্মাৎ মৃত্যু। কেউ কিছু বোঝার আগেই তিনি চলে গিয়েছেন ওপারে। সারা দেশ মুহ্যমান, জাতি মুহ্যমান। ইস্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে দুপুরে-দুপুরে। দেরি করে খবর পাওয়াতেই পুরো ছুটি দেওয়া যায় নি। আগামীকাল পুরো ছুটি। বাচ্চারা হৈ-হৈ করে ঘরে ফিরছিল। মাঝপথে আটকে গিয়েছে সুকুমারের গুড়ের ফাঁদে। সুকুমারকে বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। খুব বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পারে লোকটা।

পিঁপড়েদের গুড় খাওয়ার গল্পটা বেশ জমে উঠেছিল। হেনকালে অনাথবন্ধু এসে পড়ায় ছেদ পড়েছে গল্পে। অনাথবন্ধুকে খুব একটা রেয়াৎ না করে বাচ্চারা চেঁচিয়ে ওঠে একযোগে। তারপর? তারপর কী হইল্যাক?

সুকুমার ফের শুরু করে। বলে, পিঁপড়াদেরও তো, আমাদের মতো, বাবুভায়া পিঁপড়া, মুনিশ-কামিন পিঁপড়া, চোর পিঁপড়া, ডাকু পিঁপড়া, নেতা-পিঁপড়া, আমলা-পিঁপড়া, রয়েছে। তো, নেতা-পিঁপড়া আর আমলা-পিঁপড়া জোট বাঁধল প্রথমে। তাদের সঙ্গে জোট বাঁধল, পুলিশ-পিঁপড়া, ঠিকাদার-পিঁপড়া, ডিলার পিঁপড়া, বেওসায়ী পিঁপড়া ...। তারাই হয়ে উঠল, কালক্রমে গুড়ের জিম্মাদাব। নিজেদের দখলে ভাঁড়টিকে রাখে, মাঝে মধ্যে একটু একটু চাখে।

সুকুমার চোখ মটকে তাকায়, ভাঁড়খান্ কবে ভেইঙেছিল বল্ দেখি?

—কবে?

—উনিশ'শো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট।

এতক্ষণ বেশ গল্প শুনছিল, এবার কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় বাচ্চাদের। গল্পটা জমতে জমতে ছানা কেটে যায়। লিডার-কাকা কুত্থেকে পিঁপড়াদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবসকে ঢুকিয়ে দিল্যাক। হতাশ হয়ে বাচ্চারা শিলেট-বই নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সুকুমার শুধোয়. মুকুন্দ ইস্কুলে যায় রে?

—কুন মুকুন্দ?

—উই যে, পাগল শিকারীর ব্যাটা?

—উয়ার নাম ত মাকুন্দ। বাচ্চারা হো-হো করে হাসে। বলে, মাঝে-মইধ্যে। একদিন ইস্কুলে যায় তো দু'দিন গরু চরায়।

বাচ্চাগুলো চলে যাওয়ার পর সুকুমার তাকায় অনাথবন্ধুর দিকে। থমথম করছিল অনাথবন্ধুর মুখ। ফরসা মুখখানি জ্যৈষ্ঠের আমপাকানো রোদে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না অনাথবন্ধু।

সুকুমার শুধোয়, কী হইয়েঁছে, অনাথদা?

অনাথবন্ধু গুম মেরে থাকেন। বহুকষ্টে নিজেকে শান্ত করেন। বলেন, বহু লড়াই আন্দোলনের পর ব্রিটিশ একটা মরা গরু ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। ঐ গরুকে ঘিরে শুরু হয়েছে শিয়াল-শকুনের ভোজ।

সুকুমার অপেক্ষা করে। উপমা থেকে বাস্তবে পৌঁছাবেনই অনাথবন্ধু। সুকুমার ওঁকে সময় দেয়।

অনাথবন্ধু ঘটনাটা খুলে বলেন।

ইস্কুলের বাচ্চাদের জন্য বিদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ আসছে। এ অঞ্চলের সব ইস্কুলের জন্যই সে সব পাঠিয়েছে সরকার। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যত পেটি দুধ পেয়েছিলেন হরবল্লভ তার বারোআনাই বেচে দিয়ে এসেছেন বিষ্টুপুরে মারোয়াড়ির গুদোমে। বাকি যেটুকু এনেছিলেন সব মজুত রয়েছে সিংহগড়ে। এ-ও ইচ্ছেমতো খাচ্ছে। চা বানাচ্ছে বাইরের লোকেদের জন্য। গাঙ্গুলিরা পেয়েছে একপেটি। তাদের বাড়ির বাচ্চাগুলো রোজ কাগজে মুড়ে দুধ নিয়ে আসে ইস্কুলে। নিজেরা খায়, ইয়ারবন্ধুদের বিলোয়। কী জন্যে পাঠানো দুধ, কীসে খরচ হচ্ছে! অথচ লোখেশোল ইস্কুলের ছেলেদের জন্য অনাথবন্ধু এক পেটি দুধ চাইতেই হরবল্লভ সাফ বলে দিয়েছেন, দুধ নেই, সব বিলি হয়ে গিয়েছে।

অনাথবন্ধু রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। বলেন, দেশটাকে নিজের জমিদারির মতো ব্যবহার করছে এরা। বাঁদরের পিঠেভাগ শুরু হয়ে গিয়েছে।

সুকুমার মনোযোগ সহকারে শুনছিল। শুনতে শুনতে ঠোঁটের ডগায় ঈষৎ ভাঙচুর হয়। গলায় তীব্র শ্লেষ এনে বলে, এই মরা গরুটিকে হাসিল কইর্‌তে আপনিও তো জেল খেইটেছিলেন।

—না। সহসা চিৎকার করে ওঠেন অনাথবন্ধু, এর জন্য জেল খাটিনি আমরা। এর জন্য ব্রিটিশকে তাড়াইনি। কী লাভ হল বলতে পার? এদের সঙ্গে ব্রিটিশের তফাৎটা কোথায়? ওরাও চুষত, এরাও চুষছে।

—তফাৎ বড় একটা নাই বটে। সুকুমার বড় কষ্টে হাসি গোপন করে, একজন ল্যাংটো, আর অন্যজন কিছু পরেনি। একজন যদি হয় ল্যাংটেশ্বর তো অন্য জন উলঙ্গিনী।

অনাথবন্ধুর দু'চোখে অস্থির হতাশা নেমে আসে। বহুকষ্টে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলেন, দেশটাকে কিছু বেওসায়ী আর ধান্দাবাজ নেতার কাছে বেচে দিয়েছি আমরা।

ফুট কাটবার এমন সুবর্ণ সুযোগ সুকুমার হাত ছাড়া করে না কখনই। বলে, আজকের দিনে আপনার অতখানি বিষোদ্গার করা উচিত লয়, অনাথদা। হাজার হোক আজ আপনাদ্যার একলম্বরের নেতাটির দেহান্ত হয়েছে। তিনি ছিলেন আপনাদ্যার স্বপ্নের লেতা।

ক্ষণিকের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন অনাথবন্ধু। এক সময় আপন মনে বলতে থাকেন, হাঁ, তিনি চলে যাওয়ায় কিছু লোভী ব্যবসায়ী ফাঁসির থেকে বেঁচে গেল।

—মানে?

—তিনি একবার পণ করেছিলেন যে, দেশের মুনাফাখোর, লোভী ব্যবসায়ীদের কাছাকাছি ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মারবেন। তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ায় তাঁর সেই সাধ অপূর্ণই থেকে গেল।

সুকুমার হো-হো করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই মনের মধ্যে টের পায়, এই মানুষটি আগাগোড়া এক অন্য ডালের পাখি। সুকুমার অবাক হয়ে ভাবে, এমন মানুষ ওদের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটালেন কী করে?

হাসি থামিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে যায় সুকুমার। থমথমে গলায় বলে, আমি তো আপনার কথাগুলাই গল্পচ্ছলে বাচ্চাদের বুঝাচ্ছিল্যাম, অনাথদা। এ হইল্যাক ভাঙা একখান গুড়ের ভাঁড় লিয়ে ন্যাতা-পিঁপড়াদ্যার ভোজ।

ইদানীং অনাথবন্ধুর ঘুম আসে না রাতে। সারা রাত আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে যায়। পাখি-পাখাল ডাকে। সূর্য ওঠে। কেমন যেন মনে হয়, ধোঁকা খেয়ে গিয়েছেন সারাটাজীবন। ভুল পথে সারাটা জীবন হেঁটেছেন। হাঁটতে হাঁটতে খরচ করে ফেলেছেন মহার্ঘ দিনগুলি। যা ভেবেছিলেন, চেয়েছিলেন, তিলমাত্র করতলগত হয়নি। দুধের বদলে পিটালি গোলা পেয়ে সারা দেশ যখন মহোল্লাসে নাচছে, তখন অনাথবন্ধুর রাতগুলি কেন বিনিদ্র কেটে যায়। এতদিন বাদে কেনই বা এমন বিশ্বাস দিনদিন গাঢ়তর হচ্ছে যে একখানা ঝুটো মুক্তোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর গলায়।

স্বাধীনতা চেয়েছিলেন অনাথবন্ধু। আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন। চেয়েছিল এ দেশের কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু স্বাধীনতার বদলে যা পেল, তা শুধু পুঁজির বদল। আর কিছুই নয়। সেটা স্পষ্ট করে বোঝা গেল, যখন শুধু পতাকা ওঠা-নামা ছাড়া আর সব কিছুই ঠিকঠাক থেকে গেল। ব্রিটিশদের বানানো একটি আইনও বদলাল না, একটি ব্যবস্থাও বদলাল না, সবগুলি গদি রইল অটুট, ব্রিটিশদের পুলিশ, আমলা সবাই থেকে গেল বহাল তবিয়তে। মাঝের থেকে, ভারি শিল্পের বদলে দেশব্যাপী কুটির শিল্পের বিকাশের স্বপ্ন দেখে চলেছিলেন যে মানুষটি, ভারি শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে এমন আশঙ্কায় দেশীয় পুঁজিপতিরা সেই মানুষটিকে ক্ষতিকব স্থানে তড়িঘড়ি ছেঁটে ফেলল পিস্তলের একটি অব্যর্থ গুলিতে।

আজ, এতদিন বাদে, অনাথবন্ধুর মনে হয়, এগুলোই সত্যি। এই সবের জন্যই এতকিছু। সত্যিকারের স্বাধীনতা হলে সব কিছু নতুন করে শুরু করা হত। বিদেশী পাঞ্জার ওপর দেশী পাঞ্জার ছাপ দিলেই সেটা কিছু আনকোরা পাঞ্জা হয়ে যায় না। পুরোনো মদকে নতুন বোতলে ঢেলে বিক্রি করা এক কিসিমের ধোঁকা। কী আশ্চর্য, দেশের মাথায় চড়ানো হল সাধারণতন্ত্রের শিরোপা, সাধারণ মানুষই নাকি হবে দেশের নিয়ন্তা, অথচ পার্লামেন্ট ভরে গেল কেবল দেশীয় রাজারাজড়া, জমিদার আর ব্যবসায়ীতে। স্বাধীনতা চেয়েছিলেন অনাথবন্ধু, রাজাবদল তো চাননি।

অথচ, আজ আর এ নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই। হাতের তীর বেরিয়ে গেছে। ছুটিলে হাতের শর, না বোঝে আপন-পর। নিজেদের ছোঁড়া তীর নিজেদের বুকে অব্যর্থ গেঁথে গিয়েছে। শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ। এককালে সন্ত্রাসবাদীদের বিরোধিতা করেছেন অনাথবন্ধু। বিপ্লবের পথ বেয়ে এ দেশে স্বাধীনতা আসুক, অনেকের মতো তিনিও এটা চান নি। তখন মোহের ঘোরে ছিলেন তিনি। তাঁর মতো হাজার হাজর সৎ মানুষ সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছেন। নেতাজী, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং-এর রক্তদান ব্যর্থ হয়ে গেল। মাঝের থেকে, দেশী ও বিদেশী পুঁজির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। দেশীয় রাজন্যবর্গের মাথায় নতুন মুকুট পরানো হয়ে গেল। দেশের মানুষ বিগলিত হয়ে দেখল সেই দৃশ্য। বাদ্যি বাজল, বাজি পুড়ল দেশময়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানলই না, 'স্বাধীনতা' নামে যে শিশুটি জন্ম নিল মধ্যরাতে, সে এদেশের কোটি কোটি বসুদেব-দেবকীর রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণ নয়, সে হল আসলে দেশী ও বিদেশী পুঁজির গোপন প্রণয়ের জারজ সন্তান।

অথচ অনাথবন্ধুর এখন চোরের মায়ের অবস্থা। সইতেও পারছেন না, আবার ঐ নিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতেও পারছেন না। কোন্ লজ্জায় ছিঁচ-কাঁদুনি গাইবেন তিনি আজ। তিনিও তো আজীবনকাল ঐ প্রণয় পর্বের গোপিনীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আজ কোন লজ্জায় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবেন, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।

সুকুমারের দল সম্ভবত অনাথবন্ধুর মনের যাবতীয় বেদনার খোঁজ রাখে। সরাসরি অথবা ইঙ্গিতে তারা নিজেদের পার্টিতে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে অনাথবন্ধুকে। কিন্তু এক দুর্বার লজ্জা অনাথবন্ধুকে সে আহ্বানে সাড়া দিতে বাধা দিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। আজীবনকাল গান্ধী মহারাজের চেলাগিরি করে আজ যদি তিনি কম্যুনিস্টদের দলে ভিড়ে যান, লোকে বলবে কি! অথচ ইদানীং অনাথবন্ধুর বারবার মনে হয়, দেশের খেটে খাওয়া কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ ওদের দ্বারাই সম্ভব। এখনও কথাটা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন নি অনাথবন্ধু। তবে করে ফেলতে পারেন যে কোনও দিন। মনের মধ্যে বুঝি তারই প্রস্তুতি চলছে অজান্তে।

সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, শেষরাতে উঠে বসেন অনাথবন্ধু। দরজা খুলে বাইরে আসেন। সরাসরি চোখ রাখেন উঠোনের বুড়ো বকুল গাছটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান মূর্তিটিকে।

বকুল গাছটা সেই ছেলেবেলা থেকেই বড় প্রিয় অনাথবন্ধুর। তাঁর সেই কিশোর বয়সে, তখন কী ঠাসবুনোট ছিল গাছটা। তলায় কত গাঢ় ছায়া ছিল। আর, চোত-বোশেখে গাছ ঝেঁকে ফুল আসত। রাতভর টুপটাপ ঝরে পড়ত তলায়। আর, ভোর না হতেই গাছের তলা জুড়ে ঘিয়ে রঙের ফুল দিয়ে একখানি পুরো সুজনি-চাদর পাতা। গন্ধে মক্‌মকাচ্ছে গাছের তলার বাতাস। সুজনি-চাদরখানার ওপরে বসা বারণ, সারা পাড়ার বউ-ঝিরা কুড়িয়ে নিয়ে যায় ফুল। কিন্তু বেশ তফাতে বসলেও গন্ধে ম-ম। সেই গাছের প্রধান ডালখানাকে কেটে ফেলেছে সিংহবাবুরা। অনাথবন্ধু যখন স্বাধীনতার লড়াই সেরে ফিরলেন, তখন গাছটার জরাজীর্ণ অবস্থা। মূল ডালের ঠুঁটখানাতে পচন ধরেছে। একখানা কোটর মতো হয়েছে তার মাথায়। একখানা মাত্তর ডাল আকাশের দিকে সামান্য উঠে থেমে গিয়েছে। অনাথবন্ধু রোজ ঐ মোটা ডালের পচন ধরা অবশিষ্ট অংশটিকে পলকহীন চোখে দেখেন। পূর্ণ বয়স্ক ডালখানার জন্য গাছটা আকুলি-বিকুলি জানায় অনাথবন্ধুর কাছে। ঠাসবুনোট পাতাসহ সমগ্র গাছটির একখানা পূর্ণাঙ্গ ছবি, যেমনটি দেখেছিলেন সেই কৈশোরে, রোজ একবার এঁকে ফেলেন মনের ক্যানভাসে। এঁকে ফেলেন, ফের মুছে ফেলেন, ফের আঁকেন। এবং অবাক হয়ে অনুভব করেন, পুরো গাছখানা তাঁর বুকের মধ্যে কোথায় যেন রয়ে গেছে।

রাতের বেলায় ঐ ঠুঁটো ডালে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন ইদানীং। আবছা আঁধারে তার পূর্ণাবয়ব মূর্তিখানি ধরা পড়ে অনাথবন্ধুর চোখে। রোগাপানা মানুষটি, পা দু'খানি সরু সরু, সামান্য কুঁজো হয়ে ঝুঁকে রয়েছেন সামনের দিকে। ডান হাতে একখানা লাঠি। অনাথবন্ধু সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পান। এমন কি তাঁর গোল চাকতি-চশমা, মায় কোমরে ঝোলানো ঘড়িটি অবধি। তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কিঞ্চিৎ শিথিল। মনে হয়, বুঝি পড়ে যেতে যেতে টাল সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অনাথবন্ধুর আশঙ্কা হয়, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন মানুষটি। শেষ রাতে ইদানীং ঐ টানেই বিছানা ছাড়েন অনাথবন্ধু। বাইরে এসে দাওয়ায় বসেন এবং এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন বৃক্ষবাসী মানুষটিকে, যতক্ষণ না ভোরের আলো ফোটে। কারণ, ভোরের আলো ফুটলেই মানুষটি অদৃশ্য হয়ে যান। বাস্তবিক, দিনের আলোয় যা ঠুঁটো ডাল একখানি, রাতের আঁধারে তার ওপর কী করেই বা এসে স্থাপিত হন তিনি? হনই যদি, এমন টলটলায়মান পতনোন্মুখ হয়ে থাকেন কেন? দিনের আলোয় ঠুঁটা ডালের প্রতিটি বাঁক-ট্যাঁক, কুঁজ, কোটরকে এক রেখায় এনে নানা প্রকারে বিন্যাস করে দেখেছেন অনাথবন্ধু। কিছুতেই হাজির করতে পারেননি মূর্তিটিকে। অথচ, রাতটি হলেই মানুষটি তাঁর যাবতীয় মুদ্রা-ভঙ্গিমা সহকারে অনাথবন্ধুর উঠোনে এসে হাজির। আর, সেই টানে রোজ শেষরাতে অনাথবন্ধুর ঘুম ভেঙে যায়।

১৭. ছবি আঁকে পাগল শিকারি

বাবুদের জমিনে হাল চষছিল পাগল শিকারি। আষাঢ় মাসের শেষ। সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল অম্বুবাচীর দিনে। যে নাই জানে বার-তিথি/আষাঢ় মাসের সাত তারিখে অম্ববতী। শাস্ত্রের বচন। ঐ দিনে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। বৃষ্টি ঐদিন সেই কারণে হবেই। ঐদিনে রাঢ়ের বাবু-

ভায়ারা কাঁচা দুধ আম সহযোগে খান। সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল অম্ববতীর দিনে। আবার হল ক'দিন আগে। এখন তাই চুয়ামসিনার মাঠে মাঠে হাল চলছে সকালে, বিকালে।

হাল ঠেলছিল পাগল শিকারিসহ চোদ্দজন হালুয়া। সিংহবাবুদের জমিনে। হরিণমুড়ি খালের ধারে একচাকে আঠার বিঘা জমিন। সিংহবাবুরা হিংচিলেবু ধানের চাষ করেন এই জমিনে। হিংচিলেবু ধানে চিঁড়া হয় ভাল। সরু সরু, লম্বা লম্বা, সামান্য সুবাস। এই ধানের চিঁড়া খুবই পছন্দ করেন সিংহবাবুরা। সম্বৎসর অনেক চিঁড়াই লাগে সিংহগড়ে। সিংহবাহিনী, রাধাবল্লভের বাল্যভোগে চিঁড়া-দুধ-কলা-গুড়, কিংবা চিঁড়া দই-ফুলবাতাসা-মতিচুর। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব-পার্বন তো লেগেই থাকে সিংহগড়ে। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম-বাটুমদের বাড়িতে পাঠাতে হয় সিংহগড়ের চিঁড়া। নিজেরাও খান, বারোমাস তিরিশদিন। সে তুলনায় আঠার বিঘে জমিনের চিঁড়া এমন কিছু বেশি নয়।

একমনে হাল করছিল পাগল শিকারির দল। দ্বিতীয় চাষ চলছে। বৃষ্টি হয়েছে, মাটি তাই সামান্য নরম। ফালের ডগায় আঁতর কাটছে। ফাগুন-চৈতে যখন প্রথম-চাষ দেওয়া হয়, মাটি থাকে কুমারী, বৃষ্টি ঝরে না এক ফোঁটা। মাটি তখন বড়ই আনকোরা, জেদি। ফাল সেঁধাতেই দেয় না। তখন পাগল শিকারিদের জান বেরিয়ে যায় হাল চষতে। একে তো চৈত্রের অগ্নিবর্ষণ, বাতাস যেন ময়াল সাপের নিঃশ্বাস, আকাশ যেন উত্তপ্ত এনামেলের কড়াই, তার ওপর এই লোহার মতো কঠিন, জেদি, আনপড় আনকোরা মাটি। হালের বোঁটায় শরীরের তাবৎ ওজন এবং কব্জির যাবতীয় শক্তি একত্র করেও মাটির বুকে ফাল-সেঁধানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। সে এক নিদারুণ কষ্টের সময়। এখন, এই শেষ-আষাঢ়ে, কষ্টটা অতখানি নয়।

যোল চাষে তুলা/ তার অর্ধেক মূলা/ তার অর্ধেক ধান/ মিনা (বিনা) চাষে পান। — শাস্ত্রের বচন। অর্থাৎ কিনা তুলাচাষের জমিনে ষোলবার চাষ দিতে হয়। মূলা চাষের জমিনে আটবার। চার বার চাষ দিলেই ধান ভাল হয়। আর, পান চাষের জমিনে হালচাষ দিতে নাই। তো, ধানের জমিনে চার-চাষ দেওয়াই দস্তুর। প্রথম-চাষ উগাল, দ্বিতীয় চাষ সামাল, তৃতীয় চাষে পচানি-মারা এবং চতুর্থ চাষে কাদা করা। কাদা করেই রুইতে হয়। ইদানীং চার-চাষ আর দেয় না চাষীরা। তিন চাষেই রুয়ে দেয়। এক-চাষেই উগাল-সামাল। আর সিংহবাবুদের তো হাজার হাজার বিঘে জমিন। চার-চাষ মেরে তৈরি করতে গেলে কলির ভোর। পারলে দু'চাষ মেরেই বুনে দেয়। মেরে কেটে তিন চাষ। তার অধিক নয়। উগাল, পচানি এবং কাদা করা। এখন পচানি-মারা চলছে।

পাগল শিকারি হাল ঠেলতে ঠেলতে ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়। মধ্য আকাশে সূর্যটা বিষবাতি হয়ে জ্বলছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য হেললেই ওর ছুটি। হালুয়াদের ক্ষেত্রে সেটাই নিয়ম রাঢ়ভূমে। পাগল শিকারি আকাশে নিরীখ করে ঠাহর করবার চেষ্টা করে, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলল কিনা। জলদি জলদি নামো হে—। আর কতক্ষণ ঠায় বইস্যে থাইক্‌বে মাঝ-গগনে। পরাণ যে যায়। আর বেশি দেরি হইলে এই পরের জমিনে ছাতি ফাইট্যে মইর্‌ব। অন্তত লিজের ঘরে গিয়ে মইর্‌তে দাও। পরবাসে মরতে চায় না

কোনও প্রাণীই। অন্তত মরবার আগে প্রত্যেকেই স্ববাসভূমিতে ফিরতে চায়। পাগল শিকারিও ফিরতে চায় তার শিকারিপাড়ার ঝুপড়িতে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় পাগল শিকারির নজর চলে যায় একেবারে দক্ষিণ দিগন্তে। ছানাকাটা পাঁশুটে রঙের মেঘগুলো ভেসে চলেছে হাওয়ায়। দেখতে দেখতে পাগল শিকারি আচমকা ঐ মেঘের পালে আবিষ্কার করে ফেলে আর এক পাগল শিকারিকে। লম্বাটে সরু-সরু পা, দীর্ঘকায় খাঁচাসার শরীর, সামান্য ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। পাগল হাল থামিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকে দিগন্তের গায়ে ভাসতে থাকা পাগল শিকারির দিকে। এইভাবে পাগল শিকারি বাবুদের জমিনে চাষ করতে করতে চারপাশের যাবতীয় ক্যানভাসে অজস্র সম্ভব-অসম্ভব ছবি এঁকে চলে।

আসলে, পাগল শিকারি জানে না, সে নিজের জমিখানাই চষছে। সে জানে না, ওর নামে এই আঠার বিঘের চাকখানা রেখে দিয়েছেন সিংহবাবুরা। নিঃশব্দে পেছনের তারিখের চেক কেটে দিয়েছেন পাগল শিকারির নামে। পাগলের অজান্তে। জমিদারি-উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পরপরই ঘটেছে এসব। এই উপায়েই শয়ে শয়ে বিঘা জমিন সরকারে খাস হয়ে যাওয়ার থেকে বাঁচিয়েছেন সিংহবাবুরা। আর, জমিদারি আমলে, চেক কেটে খাজনা নিয়ে নিলেই তো চাষীর নামে বন্দোবস্ত হয়ে গেল জমিন। শুধু পাগল শিকারিই নয়, এই আঠার বিঘার চাকে যত হালুয়া হাল ঠেলছে, ওদের মধ্যে অন্তত অর্ধেকের নামে জমিন রেখেছেন সিংহবাবুরা। ওরা জানেই না। ওরা ফি-বছর সে সব জমিন উগলায়, সামলায়, পচানি মারে, কাদা করে, চারা রোয়, চটায়, বাঁশ দেয়, এবং কাটে। তারপর বাবুদের খামারে নিয়ে গিয়ে ঐ ধান সযত্নে ঝেড়েঝুড়ে গোলায় তুলে দেয়। এসব করে ওরা নিজেদের কর্তব্য হিসেবে। শ্রাবণ মাসে হাঁটুপ্রমাণ কাদায় দিনভর খাড়া থেকে ওদের দু'পায়ে শিকড় গজিয়ে যায়। সার-মাটি পেয়ে শনৈ শনৈ বাড়ে। একসময় বৃক্ষ, মহীরুহ হয়ে যায় ওরা। অন্যের জমিতে বেড়ে ওঠা গাছ। মাঝে মাঝে পাতলা ঘুমের মধ্যে পাগল শিকারি নিজের গাছ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

ফি-বছর 'এখ্যান' দিনে সিংহবাবুদের সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় পাগল শিকারি, পৌষে ধান ঝেড়ে, মেড়ে, গোলায় তুলে দেওয়া অবধি সে চুক্তির মেয়াদ। তারপর আবার ওরা তাকিয়ে বসে থাকে পরবর্তী 'এখ্যান' দিনটির জন্য। চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর, এখ্যান, সেখান, সাঁই, সুঁই/তার পরদিন আইস্‌বি তুই। মকর পরবের আগে পিছে এই সাতদিনই যা রাঢ়ভূমিতে বাউরি-বাগদি-শিকারীদের উৎসব। তারপর পুরো বছরখানা তো পড়ে রইল বাবুদের জন্য।

বছর বছর নতুন করে চুক্তি হয়, হিসেবপত্তর হয়, কিন্তু পাগল শিকারি ইদানীং আর উপস্থিত থাকে না হিসাব-নিকাশের থানে। প্রতাপলাল-হরবল্লভরা বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসে সেসব কর্ম একতরফা সাঙ্গ করেন 'এখ্যান' দিনে। পাগল শিকারির বাপ-ঠাকুদ্দারা হয়ত বা বসত গিয়ে বৈঠকখানার বাইরে, মোটা মোটা থামের গায়ে শরীরের যাবতীয় ভার ছেড়ে দিয়ে প্রতীক্ষা করত। পাগলরা আর যায় না। কারণ গিয়ে কোনও ফায়দা নেই।

এখন নতুন সিংহগড়ে মুনিশ-মাইন্দার, বাগাল-ভাতুয়া, চাকর-বাকর, লগদি-পাইক মিলে

ডজন খানেক। সকলের জন্য পৃথক পৃথক খাতা রয়েছে নতুন গোমস্তা রতিকান্তর হেফাজতে বৎসরান্তে সেই খাতা খুলে দেখা হয় পাগল শিকারিদের শিকল কতখানি শক্তপোক্ত হল

এই যেমন পাগল শিকারিরা, সিংহগড়ের তিনপুরুষের মাইন্দার। সিংহগড়ে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে পাগল। সে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা। পাগল শিকারি আজও ফুরসৎ পেলে সে সব কথা বিতাং করে শোনায়। সে কাহিনী শুনিয়ে ভারি সুখ পায় সে। কাহিনীটা সে শুনেছিল ঠাকুর্দা অভিরাম শিকারির মুখ থেকে। বাঁকাদহর চিতর গাঁ থেকে কোনও এককালে সিংহগড়ে এসেছিল অভিরাম শিকারি। গায়ে অসুরের বল ছিল তার। বলত, আমরা বটে জাতে সর্দার। শিকারি আমাদের উপাধি আইজ্ঞা। রাজদত্ত উপাধি

—রাজা তুয়াদ্যারকে উপাধি দিল্যাক? কিসের লেগে?

—সে এক বিত্তান্ত, মশয়।

সিংহগড়ে থাকাকালীন গল্পটা বহুবার বহুজনকেই শুনিয়েছে অভিরাম। এটা ছিল ওর এক প্রিয়তম প্রসঙ্গ।

বিষ্টুপুরেব রাজা আইছেন ধনশিমলার জঙ্গলে শিকার করতে। তখন এই চুয়ামসিনা বত্রিশভাগী, শালুকা, ধনশিমলার জঙ্গলগুলান লাগাতার ছিল। এদিকে মিশেছিল সোনামুখীর জঙ্গলে, ওদিকে জয়পুরের সেনাপতির জঙ্গলে। তো, রাজার সঙ্গে অগুনতি লোকলস্কর হাতিঘোড়া, পাইক পেয়াদা, অভিরামের ঠাকুর্দাও রয়েছে সাথে। ভাল্‌কি সর্দার। মানুষ তো নয়, একখান পরিপক্ক ভাল্‌কি বাঁশ।

ঘুরছেন সক্কলে বনের মধ্যে। শিকার টুঁড়ছেন। হেনকালে, আইজ্ঞা রাজার সুমুখে এক পেকাণ্ড হরিণ।

রাজা যত ছুটেন, হরিণ তত ছুটে। পিছে পিছে ছুটতে থাকে লোকজন।

খানিকবাদে লোকজন সব থইক্যে আলা। রাজাও হাঁপর টানছেন ছাতিতে। কেবল অভিরামের ঠাকুর্দা, ভাল্‌কি সর্দার, ছুটতে লাগল্যাক হরিণের পিছু পিছু। কাড়-বাঁশ ছুটাতে লাগল্যাক একের পর এক। ছুটন্ত অবস্থায় ঠিকঠাক লাগে না হরিণের গায়ে। ফলে হরিণও দৌড়ায়, ভাল্‌কি সর্দারও দৌড়ায়।

অকস্মাৎ সুমুখে পড়ল একটা মাঝারি জোড়। আন্দাজ পনের হাত মতো ওসার। তো বাবুমশয়রা, জানেন আপনেরা, বাঘ লাফাতে পারে চোদ্দ হাত, হরিণ পারে ষোল হাত সেই কারণে বাঘ সহসা হরিণের নাগাল পায় না।

জোড়টার পাড়ে পৌঁছেই শূন্যে লম্ফ দিল্যাক হরিণ। মুহূর্তে পারাই গেল্যাক জোড়। হায় হায় করে উঠল্যাক রাজাবাবু। হায় হায় রব তুলল্যাক লোকলস্কর। শিকার বেহাত। হায় হায়! হেনকালে ভাল্‌কি সর্দারও দিল্যাক লম্ফ। একলম্ফে পারাই গেল্যাক জোড়। কাঁড় বিঁধে হরিণকে মেরে কাঁধে বয়ে লিয়ে আইল্যাক রাজার পাশ।

রাজা জিগাল্যাক, তুই কে?

অভিরামের ঠাকুর্দা বলল্যাক, মুই আইজ্ঞা ভাল্‌কি সর্দার। হুজুরের ছি-চরণের দাস।

রাজা জিগাল্যাক, তুই পন্‌দেরো হাত জোড় লম্ফ দিতে পারলি ক্যামনে?

ভালুকি সর্দার দু'হাত জড়ো করে জবাব দেয়, আমরা সর্দার জাত ইট্যা পারি আইজ্ঞা।

রাজা খুশ হয়ে বলল্যাক, যাহ্, আজ থিক্যে তুয়ারা হলি শিকারি। আর কুনো শালা শিকারি লয়। তুয়ারাই শিকারি।

বাবুমশয়, সিই থিক্যে আমরা সর্দার-জাত হল্যম শিকারি। আর উই জোড়টার নাম হইল্যাক হরিণমুড়ি জোড়।

সে সব দিনের কথা বলতে বলতে অভিরাম শিকারির দু'চোখ জ্বলে ওঠে বাঘের মত। ভুরু জোড়া ঘন ঘন লম্ফ মেরে উঠে যায় কপালে।

অভিরাম শিকারি সেই গল্প জাঁক করে শুনিয়ে গেছে আজীবনকাল। মৃত্যুকালে ব্যাটা তুখোড় শিকারির ওপর দিয়ে গেছে সেই গল্প বলবার দায়িত্ব। তুখোড় শিকারির থেকে সে দায়িত্ব বর্তেছে পাগল শিকারির ওপর। গল্পটা ওকে নিরন্তর কামড়ায়। শুধু তো শিকারিই নয়, সাবেক সিংহগড়ে থাকাকালীন সে কাহিনী নিয়মিত শুনিয়ে গেছে কদম শিকারি, তার ব্যাটা রুদ্র শিকারি, তার ব্যাটা কালো শিকারি। সিংহগড়ের বাহিরে থেকে শুনিয়েছে মঙ্গল শিকারি, তার ব্যাটা কুস্বা শিকারি, তার ব্যাটা পবন শিকারি।

হরবল্লভরা সে গল্প শুনে ছেলেবেলায় হেসে কুটিপাটি। হাঁ রে পাগল, মানুষ কুনোদিনো ষোল হাত লম্ফ দিতে পারে? বাবুদের অমন অবিশ্বাসে, তাচ্ছিল্যে, বুকের মধ্যে বড়সড় ব্যথা পায় পাগল শিকারি। বলে, আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা পেরেছিল্যাক আইজ্ঞা। কথাটা জিগাবেন যে কুনো শিকারিকে। আশে পাশে যেসব শিকারি বসেছিল, তারা মাথা নেড়ে সায় দেয়। এ কাহিনী মিছা লয়।

ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম হাসি খেলে যায় হরবল্লভের। তুয়ার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তাহলে মানুষ ছিল নাই নির্ঘাৎ।

—তবে?

—ঐ যে, যে প্রাণীটি লম্ফ দিয়ে সাগর ডিঙাইছিল্যাক ত্রেতা যুগে—।

পাগল শিকারি সরলপানা হাসে। বাবুরা তাদের হনুমান বলবেন, বাঁদর বলবেন, শুয়ারের বাচ্চা বলবেন, এ আর বেশি কি। কিন্তু হক কথাটাকে মিছা বলে উড়াই দিতে চান, এতেই তার যত আক্ষেপ।

পাগল শিকারির বয়ান অনুসারে, অভিরাম শিকারি সিংহগড়ে ঢুকেছিল বাবুদের খাস লগদি হিসবে। বাবু অর্থে সুদর্শন সিংহবাবুর ঠাকুর্দা পরমেশ্বর সিংহবাবু। যখন দু'পেয়ে জানোয়ার মারতে বেরোতেন তিনি, পেছনে লাঠি কিংবা বল্লম নিয়ে মোতায়েন থাকত অভিরাম।

পরমেশ্বর সিংহবাবুর মা চিত্রলেখা তখন থুত্থুরে বুড়ি। শাঁখের মতো গায়ের রঙ। ঐ বয়েসেও সে কী রূপ! অভিরাম শিকারিকে ডেকে বলেছিলেন, অভিরাম, তুয়ার সাথে পরমেশ্বরের ফারাক যেদিন পাঁচ হাতের বেশি হব্যেক, সেদিনই তুয়ার শেষদিন। ছ্যাঁদা-পাথরের বিখ্যাত মহান্তি পরিবারের মেয়ে ছিলেন চিত্রলেখা। সারা অঙ্গে নীলকান্ত মণির মত তেজ আর দ্যুতি নিয়ে সর্বদাই বিরাজ করে গেছেন সিংহগড়ে। বিরাশি বছর বয়েসেও

জমিদারি দেখাশোনা করে গেছেন অন্দরমহল থেকে। পরমেশ্বর সিংহবাবুকেও সর্বসমক্ষে ধমক দিতেন। এমন অতুল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিত্রলেখা হুকুমটা জানিয়ে দিলেন অভিরামকে। অভিরাম উঠোনে দাঁড়িয়ে দৈববাণীর মত শুনেছিল সে হুকুম। তিরতিরিয়ে কাঁপছিল তার শরীর। ওখান থেকেই ভক্তিভরে প্রণাম করেছিল চিত্রলেখাকে। সাষ্টাঙ্গে। বলেছিল, তাই হব্যেক মা-জননী।

এইভাবে অভিরাম শিকারি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিল সিংহগড়ে। তার পুরো সংসারটাই পড়ে রইল মেটেপাতান গাঁয়ে। মাইনের পরিমাণ স্থির করতেন গোমস্তা যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী। কত খাটালি হল, কত আগাম দেওয়া হল, সবকিছুর পরিপাটি হিসেব রাখতেন তিনি। অভিরাম শিকারি শুধু খেটে গেছে। আর মাঝে মাঝে দাদনপাতি নেবার সময় টিপছাপ লাগিয়ে গেছে কিস্তিতে কিস্তিতে। অভিরাম শিকারি মরলে পর সে জায়গায় ভর্তি হয়েছিল ব্যাটা তুখোড় শিকারি। তখন দ্বারিকাপ্রসাদের আমল সিংহগড়ে। যজ্ঞেশ্বর গোস্বামীর ছেলে কৃষ্ণদাস তখন গোমস্তা। দ্বারিকাপ্রসাদের জীবদ্দশাতেই মালিক বদলেছিল তুখোড় শিকারির। দ্বারিকাপ্রসাদ যখন তাঁর দু'ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন পুরো তালুক, যখন ছোটছেলে প্রতাপলালের জন্য বানিয়ে দিলেন পৃথক গড়, তুখোড় শিকারি হুকুম মতো চলে এল প্রতাপলালের গড়ে।

তুখোড় শিকারি আর নেই। কিন্তু সে থাকাকালীন মাত্র বারো বছর বয়েসে পাগল শিকারি ঢুকেছিল প্রতাপলালের গড়ে। পেটভাতুয়ায় গরু বাগালির কাজে বহাল হয়েছিল সে। সেই থেকে আজ অবধি সিংহগড়ে।

তুখোড় শিকারি যখন মরল, পাগল শিকারির বয়েস তখন আঠার। কাজ-বাজ চুকে যাওয়ার পর, গোমস্তা গগন কুচলান একদিন পাগলকে সামনে বসিয়ে ওর বাপের হিসেবপত্তর কষল। সবকিছু কাটান-ছাঁটান দিয়ে দেখা গেল, দাদন নিরীখে যা খাটালি বাকি রেখে ওপারে চলে গিয়েছে তুখোড়, তার পরিমাণ হল বাইশবছর তিন মাস সাতাশ দিন। এবং উত্তরাধিকার তত্ত্ব মানতে হলে ঐ খাটালিটা পুরোপুরি বর্তাচ্ছে পাগল শিকারির ওপর।

—ইখন তো ধরতে হবেক যে তুয়ার খাটালিই বাকি রয়েছে ইটা। বটে কিনা? গগন কুচলান বিবেচক মানুষের মতো মুখ করে বলে।

ভারি ধাঁধায় পড়ে যায় পাগল শিকারি। তখন তার আঠার বছর বয়েস। অথচ সিংহগড়ে তার খাটালি বাকি রয়েছে বাইশ বচ্ছর। অর্থাৎ জন্মের চারবছর আগে থেকে সে বাঁধা পড়ে গেছে সিংহগড়ের শেকলে।

—বাপের ঋণ ছেইলা ছাড়া আর কে শোধ করবেক রে? ভাবনাটাকে উসকে দেয় গগন কুচলান।

পাগল শিকারি থির হয়ে ভাবতে থাকে। গগনের কথাগুলোকে মগজের মধ্যে খেলাতে থাকে নিঃশব্দে। একসময় শুধোয়, কত মাইনা পাব আমি?

ঠাণ্ডা চোখে তাকায় গগন কুচলান।

বলে, আগে বাপের বকেয়া খাটালিটা শোধ কর্। বাইশ বছর, তিনমাস, সাতাশ দিন। নিজের খাটালি শুরু হবেক যখন, তখন উঠবেক মাইনার কথা। তখন যা বাজার চলবেক, সিটাই পাবি। ইখন থিক্যে তার কি? মাইনার বেপারে তুয়াকে কি ঠকাব আমরা?

তার মানে, শুধু বাপের ঋণ শোধ করতেই পাগল শিকারিকে বেগার খেটে যেতে হবে বাইশ বচ্ছর। তখন কত বয়স হবে তার? চল্লিশের ওপর। অর্থাৎ তার জীবনের চল্লিশটা বছর নিজের অজান্তে বিক্রি হয়ে গিয়েছে সিংহগড়ে।

চল্লিশ বছর বয়েসেও সে কি মুক্তি পাবে এই শেকল থেকে? ততদিনে কি সিংহগড় আরও একখানা শক্তপোক্ত শেকল বানিয়ে ফেলবে না পাগলের জন্য। কে জানে।

প্রতাগলাল ছিলেন বিবেচক ব্যক্তি। দয়ার শরীর তাঁর। একেবারে মিনাশূন্যে খাটতে হয়নি পাগল শিকারিকে। মাঝে মাঝে দুঃসময়ের দিনে, হাতেপায়ে ধরে, কান্নাকাটি জুড়লে কিছু কিছু আগাম দিতেন। নিজের খাতে মাইনে বাবদ আগাম। বাইশ বছর বাদে যে মাইনের হকদার হবে পাগল শিকারি তার বাবদ আগাম নিতে শুরু করে সে কিস্তিতে কিস্তিতে। বাবুদের লালখাতায় টিপছাপ দিতে থাকে প্রতিবারেই। সে বোধ করি বুঝতেই পারে না, আজকের নেওয়া পাঁচটাকা কিংবা একশুলি ধান বাইশ বছর বাদে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে বেড়ে কততে দাঁড়াবে! এবং সেই টাকা শোধ করতে আরও কতপুরুষ খেটে যেতে হবে পাগলদের।

পাগল শিকারি তার বাপের খাটালি শোধ করবে এই বছর। এখন তার বয়েস পঁয়তাল্লিশ। বাইশ বছর খাটতে গিয়ে কিছু কিছু কামাই তো হয়েইছে শারীরিক কারণে। সেগুলো শোধ করতে গিয়ে খাটালির সময় বেড়ে গিয়েছে আরও পাঁচ বছর। আসছে বছর থেকে পাগলের নিজস্ব খাটালি শুরু হবে। জীয়ন্তে পুরো খাটালি খেটে যেতে পারবে না সে। কারণ, আগাম দাদন অনুসারে তার খাটালির পরিমাণ এখনই হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর। আরও পঁয়ত্রিশ বছর পাগল শিকারি কি বাঁচবে? বাঁচলেও কি আর খাটা-বাটার ক্ষমতা তখনও থাকবে তার শরীরে! যদি থাকেও, এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে খাটতে খাটতে ফের তো কিছু কিছু আগাম নিতেই হবে সংসারের হাজারটা গর্ত বোঁজানোর জন্য। সে বাবদ তো আবারও খাটালি প্রাপ্য হয়ে যাবে সিংহগড়ের। ইতিমধ্যে পাগলের ছেলে মাকুন্দ সিংহগড়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছে পেটভাতায়। তার জন্য কত লম্বা শেকল রেখে যেতে হচ্ছে পাগল শিকারিকে, ভগবানকে মালুম।

পাগল শিকারি বিয়ে করুক, সিংহগড় তা চায়নি মনে মনে। বিয়ে মানেই তো অমন সুঠাম স্বাস্থ্যখানি ধ্বসে ধুসে একাকার। আধ ঘণ্টা কাজ না করতেই আধহাত জিভ ঝুলিয়ে দম নেওয়া। তুয়াদ্যারকে এ ঘোড়ারোগে যে ক্যানে ধরে—। নতুন গোমস্তা রতিকান্ত ধমক লাগায়। লিজেরই চাল নাই, চুলা নাই, আর একটাকে পোঁদে বাঁধবি। খাবাবি কি? রতিকান্ত আড়ালে উসকে দেয় পাগলকে। সিংহগড়ে যে অতগুলান ডবকা ছুগ্‌রি রেখেছেন বাবুরা, কিসের লেগে? বুঝলি কিছো? পাগল যে বোঝে না এমন নয়। ওদের কাছেই তো সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নেয় অনেকেই।

তিরিশ বছর যখন পাগলের বইস, তখনই সে আচমকা পাত্রী নির্বাচন করে ফেলে। সিংহগড়েরই বাঁধা ঝি সে। পোশাকি নাম সুবাসী। ডাক নাম সারো। পাগল শিকারির কাণ্ড কারখানা দেখে হরবল্লভ তো রেগে কাঁই। বলে, উয়াকে যে বিয়া করবি তুই, উয়ার খাটালি যে বাকি রয়েছে অনেকদিন। তার কি হবেক?

পাগল শিকারি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, ক্যানে আইজ্ঞা, সুবাসী বিয়ার পরও বহাল থাইক্‌বেক আপনারই ইস্টেটে।

এমন কথায় গরম আগুনে কিঞ্চিৎ জল পড়ে। সুবাসীর সঙ্গে পাগল শিকারির বিয়ে হয়ে যায়। এবং বিয়ের পর দুজনেই খাটতে থাকে সিংহগড়ে। তখনও ছবি আঁকা ফুরোয় না পাগল শিকারির। সে এবার নতুন জাতের ছবি আঁকায় মন দেয়। আর, একে তাকে কেবল সুযোগ পেলেই শুধিয়ে বসে, বাবু, সুধন্য নামটার মানে কি বটে?

—ক্যানে? নামের মানে লিয়ে কি কইর্‌বি তুই?

—কিছো নাই কইর্‌ব। শুধু, জানত্যে ইচ্ছা হয়।

আগন্তুক মানুষটি থির পলকে তাকিয়ে থাকেন পাগল শিকারির দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন ওর মুখখানি। এক সময় ঠোঁট ফসকে অজান্তে বেরিয়ে আসে একটি মাত্র শব্দ. পা-গল।

১৮. 'ষোলআনা' নামক যাঁতাকল

গজেনের আর্জি অনুসারে যেদিন অগ্নিকে নিয়ে 'ষোলআনা'র জমায়েত বসল, সেদিন মাথার ওপর মুরুব্বি হিসেবে কেউ উপস্থিত থাকতে পারেনি। পরীক্ষিত বাউরি এ তল্লাটে ছিল না। নিশান বাউরি ছিল শয্যাশায়ী। বিছানাতেই বাহ্যি-প্রস্রাব অবস্থা তার। সুকুমার, হঠাৎ মুর্মু, বাঁশি বাউরি বিষ্টুপুর জেলে পচছিল। অগ্নির হয়ে কথা বলবার মতো দু'জন ছিল বাইরে অনাথবন্ধু আর তিলক বাউরি। অনাথবন্ধু কোন ক্রমেই বাউরিদের নিজস্ব 'ষোলআনায় হাজির থাকতে পারেন না। বাকি এক তিলক বাউরি। মুরুব্বিদের জমায়েতে সে নাবালক হিসেবেই গণ্য হচ্ছিল প্রথম থেকেই। বাপ, জেঠা, খুড়াদের ওপর গলা চড়িয়ে কিছু বলার অসুবিধে ছিল অনেক। আর গোরাচাঁদ. সে তো দুগ্ধপোষ্য বালক। তবুও সে হাজির ছিল ইস্কুলের ছুটি ছিল তার। সেই কারণে সে থাকতে পেরেছিল। 'ষোলআনা'র সদস্য হিসেবে নয়, হাজির ছিল, কারণ, বাপের-মায়ের এই ছাড়াছাড়ি-জীবনে, ব্যাটা হিসেবে তারও একটা বক্তব্য থেকে যায়। গোরাচাঁদকে হাজির রাখা হয়েছিল এটাই জানার জন্য যে, ব্যাটা হিসেবে সে কী চায়? ইতিমধ্যে গজেন বাউরি গোরাচাঁদকে একদিন রাস্তায় ধরেছিল। ফুসলিয়ে ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ফুলকুসমায়। আচমকা তিলকরা এসে পড়ায়, তড়িঘড়ি পিছলি কাটে।

গোরাচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে বড়াম তলায় যথাসময়ে পৌঁছেছিল অগ্নি। এবং দেখেছিল, বড়ামতলা টই-টম্বুর। দেখেছিল, গজেন বেশ জমিয়ে বসেছে। 'ষোলআনা'র মোড়ল সখা বাউরি এবং তার চেলা-চামুণ্ডাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই খুব দহরম-মহরম হয়ে গিয়েছে তার। পুরো বাউরিপাড়া জেনে গেছে তার অগাধ গুণের কথা। সে তাল গাছে চড়তে পারে অবলীলায়, মৌচাক ভাঙতে পারে, ঝাড়ফুঁক জানে, গরু লাচাতে পারে, মেয়া পটাতে পারে। বাউরিপাড়ার অনেকের সাথে এখন তার গলায় গলায়। আর, এখন তার মুরুব্বি জুটেছে। জব্বর মুরুব্বি। সিংহগড়ের ছোটবাবু প্রভঞ্জন সিংহবাবু। অগ্নি বুঝতে পারে সেটা। ভরত বাউরি, গোবর্ধন বাউরি, প্রবীণ মানুষগুলি, এককালে যারা পরীক্ষিত বাউরির একান্তজন ছিল, বসে রয়েছে পুতুলের মতো ম্রিয়মান। অগ্নি বুঝতে পারে, ইচ্ছে থাকলেও এরা আজ বড়

কটা সরব হতে পারবে না। একে তো পরীক্ষিত বাউরি নেই, তার সেই দাপটের দিনগুলিও ই, সুকুমারের প্রায় পুরো দলটাই জেলে পচছে, সুকুমারের পক্ষভুক্ত লোক হিসেবে এখন ড়ই কোণঠাসা অবস্থা ওদের। এবং ওদের তো বটেই, অগ্নিরও কোনও সন্দেহ নেই, াজকের 'ষোলআনা'র জমায়েতকে পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রভঞ্জনের দল। গজেনের দানীং বড়ই মাখামাখি ওদের সঙ্গে। অগ্নি এবং তার পরিবারের সঙ্গে গজেনকে লড়িয়ে তে চাইছে ওরা। অগ্নির মন বলে, ভেতরে এক ধরনের গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে প্রভঞ্জনের ; জেনকে সম্ভবত ছিপ বানাতে চাইছে প্রভঞ্জন। সেই বছরটাক আগে, ভর দুপুরে, প্রভঞ্জনের কলকে জিহ্বার সামনে পড়ে গিয়ে অগ্নি ওর গায়ে পেত্যাখানা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড় মেরেছিল। ন-সম্মানেব খাতিরে প্রভঞ্জনকে শেষ অবধি গিলে ফেলতে হয়েছিল ব্যাপারটা। প্রভঞ্জন দিনের অপমান ভোলেনি, অগ্নি মাঝে মাঝেই টেরপায় সেটা। প্রভঞ্জন সুযোগ খুঁজছে। দনীং সখা বাউরি ঘনঘন ক্লাবঘরে আনাগোনা করছে। অগ্নির সন্দেহ হয়, আজকের বিচাবেব য় কী হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে সখা বাউরি আগাম নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে।

সখা বাউরির আসল নাম ছিদাম বাউরি। কিন্তু সে ডাইন ধরবাব ওঝা, যাকে গ্রামের নুষ সখা কিম্বা জানগুরু বলে। ছিদাম বাউরি আজ বিশ-তিবিশ বছর সখাব কাজ করছে। সে ভূত ছাড়ায় না, সাপ ধরে না, সে শুধু খড়ি পেতে ডাইনের হাল-হদিশ বাতলে দেয়। সে ডাইন খোঁজার জানগুরু। সে হল সখা। কালক্রমে মুখে মুখে সখা বাউরি। সখা বাউরি যাবৎ অজস্র মেয়েকে ডাইন হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। তারই রায়ের ভিত্তিতে প্রাণ রিয়েছে রাঢ়ের বহু অসহায় রমণী। জরিমানা বাবদ 'ষোলআনা'কে সর্বস্ব দিয়েথুয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে কত মেয়ে। কত জনা ভিটে-মাটি ত্যাগ করেপালিয়েছে চিবকালের মতো। র-প্রবাসে ভিক্ষে অথবা দাসীবৃত্তি করে বেঁচে রয়েছে ওরা। এখন পুরো এলাকা জুড়ে সখা উরি ডাইন-কুলের যম। এখনও দূর-দূরান্ত থেকে অগুণতি মানুষ পাতা পড়াতে আসে ওর াছে। শাল পাতায় তেল মাখিয়ে ভাঁজ করে রাখে সখা বাউরি। খানিকবাদে ভাঁজ খুলেদেখতে ায় তেল-সপসপে শালপাতায় অজস্র আঁকিবুকি। ঐ আঁকিবুকি পড়েই ডাইনের খুঁটিনাটি লহদিশ বলে দেয় সে। নামটি জেনে ফেলা মাত্তর ভিনগাঁয়ের লোকজন দৌড়তে দৌড়তে রে যায় নিজেদের গাঁয়ে। যত জলদি সম্ভব ডাইনটির এক সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন য়, লচেৎ ঘোর সর্বনাশ কেউ রোধ কইর্‌তে লারবেক। সখা বাউরির এক কাঠাও চাযের মিন নেই। পাতা পড়া বাবদ কোনও পারিশ্রমিকও সে নেয় না, নিতে পারে না, কেন , এসব দৈব ক্ষমতা বেচতে নেই, বেচলেই সে ক্ষমতা লষ্ট হইয়েঁ যাবেক। কেবল পাতা ড়বার আগে মন্ত্র পড়ে পূজা করতে হয় বলে সেই বাবদ যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা, যার যা প্রাণে য, কোনও দাবি নেই সখার। কেন কি, মায়ের পূজায় ভক্তিটাই আসল, ভক্তিভরে যে া দেবে, মা কেবল সেটাই গ্রহণ করেন। দাবি করে যা আদায় করা হবে, সে ধন মাযেব াছ অবধি পৌঁছাবেক নাই, পৌঁছলেও মা সে ধন লিব্যাক নাই। আর, মা-ই যদি গ্রহণ রতে অসম্মত হন তো সখা বাউরি সে ধন লিয়ে করবেক কি? সে তো আর নিজের ন্য কিছু নেয় না। নিতে পারে না। তার গুরুর বারণ। বিদ্যাখান দেবার পর গুরু তাকে

কান কামড়ে বলে দিয়েছে, অরে ছিদাম, যে বিদ্যা তুয়াকে দিল্যম, যদি না বিকিস তো আজীবন রইল্যাক তুয়ার পাশ, যদি বিকিস তো কপ্পুরের পারা উইব্যে যাব্যেক। তখন তুই এক জড়িবুটিহীন মাদুলি। গলায় ঝুলবি, কাজ হব্যেক নাই। এক বিষহীন ঢোঁড়া সাপ। অবিরাম ছোবলাবি, বিষ চারাবেক নাই। তখন তুই ডাইন খুঁজবার নামে আগডুম-বাগডুম বকবি, ইয়ার নাম বইল্‌বি, উয়ার নাম বইল্‌বি, কিছো মাইনষের লতি-লাঞ্ছনা হবেক, আসল ডাইন মজাসে চালাই যাবেক উয়ার কাজকর্ম। তখন তুই একটি হ্যতিতে-খাওয়া কয়েৎ বেল। বাইর থিক্যে সব ঠিকঠাক, ভিতরটি ফাঁপা, ফোঁপরা। আসলে, সখা বাউরি এইসব সাত-সতের বলতে গিয়ে, উপমা-অলঙ্কার সহযোগে যার দিকে ইঙ্গিত করে সে হল দাপানজুড়ির সুফল শিকারি, যে কিনা আজ তিনদশক জুড়ে সখা হিসেবে সখা বাউরিব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইদানীং সুযোগ পেলে সুফলের ক্ষমতা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করে সখা বাউরি। বলে, ছাগল দিয়েই যদি হালচাষ করা যেইতো তো মানুষ আর বলদ কিন্‌থো নাই।

তো, সখা বাউরির এক কাঠাও জোত-জমিন না থাকলেও, সখাগিরি বাবদ একটা পয়সা না নিলেও, শালকাঁকি বাউরি পাড়ায় তারই আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে ভাল। সে যে কেবল বারোমাসই ভাত-মুড়িতে থাকে তাই নয় , অল্পস্বল্প মহাজনী-তেজারতিও করে। কী করে যে সে এটা পারে, সেটাই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

বৈঠকের শুরুতেই সখা বাউরি অগ্নিকে 'মা-টা' বলে ডেকে পরম স্নেহে পাশে এনে বসায়। সংসারের কুশল সংবাদ নেয়। নিশান বাউরির স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেয়। পরীক্ষিতেব তত্ত্বতালাশ নেয়। তারপব গজেনকে তার বক্তব্য পেশ করবার নির্দেশ দেয়। গজেনেব অভিযোগ একটাই, বউ তার ঘর করছে নাই। 'ষোলআনা' এর প্রতিবিধান করুক! বউকে সে ঘরে লিতে চায়।

সখা বাউরি অগ্নির দিকে সস্নেহে তাকায়। বলে, লিতে চাচ্ছে ত যাচ্ছু নাই ক্যানে রে মা? সোয়ামীর ঘর কইর্‌বি বলেই না তুয়াকে বিয়া দিয়েছে তুয়ার বাপ।

অগ্নি খর দৃষ্টিতে গজেনের দিকে তাকায়। তিলকের চোখে এক ঝলক চোখ রাখে। বলে, আমি উয়ার সাথ নাই যাব।

—ক্যানে? সখা বাউরির দু'চোখ কপালে উঠে যায়, ক্যানে যাবি নাই, সিট্যা ত শুনি। সোয়ামীর ঘর কববেক নাই সধবা মেয়া, ইট্যা ক্যামন কথা বটে?

অগ্নি মেঝের ওপর দৃষ্টিখানি পুঁতে দিয়েছিল নিঃশেষে। তা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে জমায়েতের সবকটি উৎসুক চোখ জোড়ায় জোড়ায় ওর ওপরই নিবদ্ধ। কেউ জবাব পাওয়ার আশায় তাকিয়ে রয়েছে, কেউ কেউ বা, যুবক অথবা বাপের বয়েসী, ঐ সুযোগে অগ্নির যুবতী শরীরখানার এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় তালেফাঁকে একটুখানি চরে বুলে নিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে যায় অগ্নি। সখা বাউরির কথার জবাব দিতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে আসে।

একটু একটু করে গরম হচ্ছিল সখা বাউরি। স্নেহ মাখানো নরম গলাখানি একটু একটু করে উবে যাচ্ছিল। যেমন রোদ্দুর পেয়ে উবে যায় ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির। তার

বদলে কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে উষ্মা জমছিল একটু একটু করে। অগ্নিকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখে গলায় সামান্য ঝাঁঝ মেশায় সে। বলে, কথার জবাব দিচ্ছু না যে বড়? অতগুলান মানুষ কাজকাম কামাই দিয়ে বুইস্যে রইয়েছে তুয়ার মুখ দেইখ্‌বার লেইগে? বল্। দোনিয়ার সব মেয়ামানুষ সোয়ামীর ঘর কইর্‌বার লেইগে আগলবাগল হয়, তুই ক্যানে বা চাচ্ছু নাই? ইয়ার হেতু কি? জবাব দে।

অগ্নি মুখখানি সামান্য তোলে। আড়চোখে দেখে নেয় গজেনের মুখ। খুব ব্যথিত, বিপর্যস্ত মুখখানি! কিন্তু এক ঝলক তাকিয়েই অগ্নির বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না, ঐ আপাত নিরীহ, ব্যথিত, বিপর্যস্ত মুখখানির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একখানি ধূর্ত মুখ। খরগোশকে ফাঁসে আটকাতে দেখে শিকারির মুখখানিতে যে চাপা উল্লাস ফোটে, সেই উল্লাস গজেনের মুখে চাপা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। পুরো 'ষোলআনা'কে মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়েই যে সে আজ অগ্নির মুখোমুখি হয়েছে, সেই উল্লাসখানি সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। অথচ সেই উল্লাসকে সে এমনই এক ধূর্ত বিষাদের মুখোশে ঢেকে নিয়েছে যে, 'ষোলআনা'র কারোর পক্ষেই তা আঁচ করা সম্ভব নয়। ওরা তো আর লোকটিকে চেনে না। অগ্নি চেনে। হাড়েহাড়ে চেনে।

দেখতে দেখতে অগ্নি জ্বলতে শুরু করে ভেতরে। সখা বাউরি তখনও নাগাড়ে শুধিয়েই চলেছে, অগ্নির সোয়ামীর ঘর করতে না চাওয়ার হেতু কি? কী গূহ্য রহস্য রইয়েছে ইয়ার পিছনে!

প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার অগ্নি এক সময় বাধ্য হয়ে মুখ খোলে। বলে, উ মাতাল। লম্ফট্। মেইর‍্যে মেইর‍্যে পিঠ ফাটাই দিয়েছে। পুয়াতি অবস্থায় আমাকে খেদাঁই দিয়েছে। আমি উয়ার পাশ ফির‍্যে নাই যাব।

সখা বাউরি ধৈর্য হারায় না। ধীরে ধীরে তার যুক্তিজালখানি বিছাতে থাকে। বলে, উট্যা কুনো কথা লয়। বাউরি সমাজে কে নাই মদ-হাঁড়িয়া খায়? আর, মরদ হইয়ে লিজের বউকে রাগের মাথায় টুকে আধে গুমসাবেক, এ আর কী অমন লৈতন কথা? ঝগড়াঝাঁটি, মারপিট, কুন ঘরে নাই হয়? ঘরে-সনসারে ঘটি-বাটিতে ঠুকাঠুকি লাগে। আর লম্ফট্ যে বলতেছু, কুনো পর্‌মাণ আছে তার?

— তা বলে পুয়াতি বউকে খেদাঁই দিব্যেক? এতক্ষণে মুখ খোলে তিলক বাউরি, ইট্যা কি উয়ার লেহ্য কাজ হইয়েঁছে।

—খেদাঁই দিবাটা অবিশ্যি ঘোরতর অলেহ্য হয়্যেঁছে গজেনের। সখা বাউরি দু'চোখ মুদে একটা গম্ভীর মুদ্রা রচনা করে মুখে, কিন্তু সিট্যাও বা কী অমন লৈতন কথা? কত ঘরেই বউকে খেদাঁই দেয়, আবার ঘরে লেয়, বউও আবার ঘব-সংসার করে। রামচন্দবও সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাইছিল্যাক, না কী?

—কিন্তু রামচন্দর ত দু'বার বিয়া করে নাই। তিলক পাল্টা যুক্তি উত্থাপন করে, গজেনদা ত ফের বিয়া কচ্ছে।

—উয়াতে কী অমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়্যেঁছে? দুটা বিয়া ত অনেকেই করে।

—বটে তো। পোঁ ধরে ভব বাউরি, উ যদি দুটা বউকে পাইল্‌ত্যে পারে, উয়ার যদি তেমন লগার তেজ থাকে তো, তুয়ার কী বইল্‌বার আছে?

—আমি সতীনের ঘর কইর্‌তে লাইর্‌ব। অগ্নি এতক্ষণে মুখ তোলে পুরোপুরি, আমার পষ্ট কথা।

—চুপ্‌ মার। সহসা বেজায় জ্বলে ওঠে সখা বাউরি, দুনিয়ার হাজার মেয়া সতীনের ঘর কচ্ছে। তুই কি সমাজের সব লীতি-লিয়মের বাইরে? গজেন যখন চাচ্ছে, তুয়াকে উয়ার ঘর কইর্‌তেই হব্যেক। লচেৎ 'ষোলআনা' তুয়ার বাদী হব্যেক। এর-তার সাথে লটর-পটর কইর্‌য়ে সমাজের মুখে কালি দিতে পারবি নাই তুই। বলতে বলতে সখা বাউরি এক ঝলক দেখে নেয় তিলককে।

অগ্নি বিপন্ন চোখে তাকায় 'ষোলআনা'র মানুষগুলোর দিকে। প্রাণপণে আশ্রয় খোঁজে। ভরত আর গোবর্ধনের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে। ভাবলেশহীন মুখ সব। ছিটেফোঁটাও আশ্বাস নেই সেখানে।

--আচ্ছা, আমি অন্য একটা কথা বইল্‌তে চাই। তিলক পুনরায় তর্ক জোড়ে, নিশান বাউরির ঘরকে তো সেই কবে সমাজচ্যুত কইবেছে 'ষোলআনা'। 'ষোলআনা' তেবে কুন অধিকারে বিচার করে উয়াদ্যার? উয়ারা তো 'ষোলআনা'র বাইরে।

—তুয়াকে আর উকালতি কইর্‌তে হব্যেক নাই। পাশ থেকে খেঁকিয়ে ওঠে ভব বাউরি, দু'দিনের ছগ্‌রা, বাপ-খুড়ার বইসি মানুষদ্যার সাথ উকিলের পাবা জেরা জুড়েছু!

—তুয়ার অত আঠা কিসের?

—অগ্নি উয়ার সোয়ামীর ঘরে চইলে গেলে তুয়ার বড়ই ক্ষতি, লয়?

—কী বইল্‌তে চাও তুমরা? তিলক সহসা ক্ষেপে ওঠে।

— কী বইল্‌তে চাই, সব্বাই বুঝ্যে লিয়েছে। পথে-ঘাটে, গাজনের মেলায়, কার আর কী দেইখ্‌তে বাকি আছে?

—পথে-ঘাটে, গাজনের মেলায় কী কইরেছি আমি?

—আ-হা! ন্যাকা! আস্‌কা খায়, ফোঁড় গুনে নাই! ডুব্যে ডুব্যে জল খাচ্ছু। কারও জাইন্‌থে বাকি নাই। দুনিযার মানুষ দেখ্যেছে তুয়াদ্যার লটরপটর।

ততক্ষণে রাগে ফুঁসতে লেগেছে তিলক বাউরি। ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে সে। পরিস্থিতিটা নিমেষের মধ্যে পরিমাপ করে নিতে পারে সখা বাউরি। দু'পক্ষকে চটজলদি থামিয়ে দেয়, চুপ মার, চুপ মার দেখি, কাইজ্যার জাগা লয় ইট্যা। পাকশালে আঢাকা ভাতের হাঁড়িটি থাইক্‌লে বহুৎ কুত্তা পেঁচ-প্যাদাড়ে থানা গাড়বেক। ভাতের হাঁড়িরও দোষ লয় সিট্যা, কুত্তারও লয়। ঘি-আগুন পাশাপাশি থাইক্‌লেই জ্বইল্‌বেক। সেই তরেই ত বিটিছেইলার বিয়া দেয় মা-বাপ, কেন কি, ঘি'টি যাতে যিখ্যেনে সিখ্যেনে জ্বইল্‌তে না পারে। ত অগ্নি, তুই কী বইল্‌ছু পষ্টাপষ্টি বল্‌ দেখি? গজেনের ঘর কইর্‌বি কি লয়?

অগ্নি মুহূর্তকাল চুপ থাকে। তারপর ধীর গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে জানায়, আমি সতীনের সাথ ঘর কইর্‌ত্যে লাইর্‌ব।

জমায়েত এবার তুমুল হল্লা জুড়ে দেয়। অগ্নির উদ্দেশ্যে গালিগালাজ চলতে থাকে অবিরাম। তার চরিত্র নিয়ে কটু-কাটব্য করতে থাকে বাপের তুল্য মানুষগুলি। অগ্নি নির্বাক বসে থাকে। মুখে সজোরে আঁচল চাপা দেয়। এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

গজেনই দু'হাত জোড় করে থামায় সবাইকে। বলে, শান্ত হোন আপনারা। আমার কথাটা শুনুন। অগ্নি যদি সতীনের ঘর নাই কইর্‌তে চায় তো, উয়ার তরে দুশরা সনসার কইর্‌ব আমি। জবান দিচ্ছি 'ষোলআনা'র সাইক্ষাতে।

সখা বাউরি এবার পরিপূর্ণ চোখে তাকায় অগ্নির দিকে। ভাবখানা যেন, আর তো তুয়াব আপত্তি করবার কুনো হেতু নাই।

মানুষের মধ্যে যে অন্ধপশুটি বাস করে, তার ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে ঢের প্রবল। সে অনেক আগাম বিপদের আঁচ পায়। অগ্নির ভেতরের সেই অন্ধ প্রবৃত্তি ততক্ষণে বিপদেব গন্ধ পেয়ে গেছে। যে কোনও শর্তে রাজি হয়ে অগ্নিকে কোনও গতিকে ফুলকুসমা অবধি নিয়ে যাওয়ার বাসনা গজেনের। তারপর সে বল্লাহীন হলে শালকাঁকির বাউরিপাড়ার লোক উয়ার ছিঁড়বেক! বল্লাহীন সে হবেই, নিজের শ্বশুরের উঠোনে দাঁড়িয়ে বউয়ের হাতের হাঁসুয়ার ঘা খেতে খেতে বেঁচে গেছে সে, এমন কটুভাষায় বাখান শুনতে হয়েছে তাকে, যা তাদের এলাকায় কোনও বউ তার মরদকে বললে তৎক্ষণাৎ উ শালীকে মেইরে, পুঁইতে ফেইল্‌থো মাটিতে। গজেন মনে মনে ফুঁসছে। সে কোনগতিকে একটিবারের তরে অগ্নিকে এই এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে চায়। ঝাঁ করে গজেনের মুখের ওপর দু'চোখ দিয়ে প্রখর আলো ফেলে অগ্নি। এবং নিঃসন্দেহ হয়, আপাত নিরীহ মুখখানির সামান্য তলায় একখানি অতি ধূর্ত, হিংস্র মুখ, যেন দ্বারকেশ্বরের দ। বাইরে থেকে বালিব সরা, পা দিলেই চোরা গহ্বর, মানুষ তলিয়ে যাবে পাতালে।

সখা বাউরি বলে, আর ত তুয়ার না কইর্‌বার কিছো নাই।

অগ্নি ছলছল চোখে সখা বাউরির দিকে তাকায়। বোঝাতে চায়, এখন তো বরং 'না' বলবার উপযুক্ত কারণ ঘটেছে। কারণ, গজেন সম্পর্কে যেটুকু সন্দেহ ছিল, পুরোপুরি ঘুচে গিয়েছে ওর শেষের কথাতেই ।অগ্নিকে নিয়ে পৃথক সংসার গড়তে এক কথায় রাজি গজেন। কী করে গড়বে? বিঘা দেড়েক ডাঙা জমিন তার। তাও মদ আর রাখ্‌নির পেছনে সেটুকুও উড়িয়ে দিল কিনা ভগমানকে মালুম। যদি নাও উড়িয়ে দেয়, জমিন তো মোটে দেড় বিঘা। তাই নিয়ে দুটো সংসার কী করে টানবে সে? দ্বিতীয় ঘরটি বানাবার মতো বাড়তি ভিটে কই ওর? কিনবে? অতই সোজা? একখানা ভিটেবাড়ি কাঠা দু'তিন জমিন হলেও দু'তিন শো টাকা। তার ওপর ঘর বানাবার খরচ। আলাদা বিছানাপত্তর, বাসনকোসন, হাঁড়ি-কুড়ি...., সোজা কথা? যে লোকটা একটা টাকা কোনও গতিকে হাতে পেলেই এক বোতল পচাই কিনে নিয়ে রাখনির বাড়ি দৌড়য়, সে কিনা আলাদা ভিটে কিনে, ঘর বানিয়ে অগ্নিকে নিয়ে দ্বিতীয় সংসার গড়বে! কিন্তু এত কথা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। এমনিতেই চিরকাল একটুখানি শান্ত, মুখচোরা সে। তার ওপর এই মুহূর্তে তার চারপাশে বিরুদ্ধ হাওয়া। অতগুলি রুষ্ট মানুষ অপেক্ষা করে রয়েছে তার মুখ থেকে বারেক 'হাঁ' শুনবার জন্য। উলটো সুরে

গাইতে শুরু করলেই তারা ফের বাখান জুড়ে দেবে। অগ্নি খুব বিপন্ন চোখে সখা বাউরির দিকে তাকায়।

অগ্নির নীরবতা দেখে ততক্ষণে চারপাশের মানুষজন আবিষ্কার করে ফেলেছে সেই নীরবতার মর্মার্থ। অগ্নি যে যেকোনও ছলনায় শালকাঁকিতে থেকে যাবে, তার যে দূরে যাওয়ার উপায় নেই, তার জন্য পৃথক একটি মৌচাক রচনার কাজ যে সম্পূর্ণ প্রায়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সবাই পুনরায় অভিশাপ বর্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে অগ্নির উদ্দেশ্যে। অগ্নি ভিজতে থাকে, পুড়তে থাকে, ঠোঁট দুটি থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে, চালতাফুলি মুখখানি কান্নার দমকে ফুলে উঠতে চায়। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে সে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। যাবে না, কিছুতেই গজেনের ফাঁসের মধ্যে মুণ্ডুখানি গলিয়ে দেবে না। ওখানে একটি বার গেলে আর শালকাঁকিতে বেঁচে ফিরতে হবে না অগ্নিকে।

সহসা অগ্নির ভাবনাগুলি বাঙময় হয়ে ওঠে ভরত বাউরির গলায়। খুবই নির্বিরোধী গলায় এইসব প্রশ্নই তোলে সে। বলে, আমাদ্যাব এক সনসার চালাতেই ভঁকভঁড় আবেস্তা, আর উ কিনা এক কথায় দুশরা সনসার গড়তে রাজি! সন্‌সার গড়া কি ছেইলেখেলা নাকি? অত সোজা?

—যে গড়বেক, সে যদি কবুল করে, জবান দেয়, তো আমাদ্যার কি, কাকা? খুবই ভক্তিভরে কথাগুলি নিবেদন করে ভব বাউরি তার বাপের বয়েসী ভরত বাউরিকে।

—উয়ার জবানের দাম কি বাপ? ভরত বাউরি খুবই নিরীহ গলায় বলতে থাকে, আমরা উয়াকে চিনি না, জানি না। বিয়াব আগে শালকাঁকির কোউ বর-ঘর দেখতে যায় নাই। বিয়ার কথা জানত্যেও পারে নাই। উয়ার বাপ তো উয়াকে মাউসী-বাড়ি নিযে বিয়া দিয়েছে, বটে কিনা।

—বটে তো।

প্রত্যেক জমায়েতে কিছু লোক থাকেই, তারা পুতুলের মতো বসে থাকে সারাক্ষণ। তাদের কিছু করণীয় নেই। বিচারের রায় কার দিকে গেল তা নিয়ে তাদের তিলমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তারা বিচারের কুট গহ্বরে প্রবেশ করেনা কদাপি, কখনই কোনও মতপ্রকাশ করে না। মাতব্বররা হাসলে হাসে, ক্রুদ্ধ হলে এরাও রাগী-রাগী চোখ করে বসে থাকে। আর, বিচারের স্থলে যে-কেউ কথার মধ্যে 'বটে কিনা' বললেই অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে, যান্ত্রিকগলায়, একেবারে নিজেদের অজান্তে ওদের ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে আসে, খেজুর কুলের আঁটির মতো, 'বটে তো!' এতদ্বারা কার, কোন্ মতকে সমর্থন জানানো হল সে খেয়ালও থাকে না এদের।

ভরত বাউরির কথার পিঠে এতগুলি মানুযের সমবেত 'বটে ত' শুনে প্রমাদ গোনে সখা বাউরি। পায়ের তলার মাটি কেমন নড়বড়ে লাগে। সহসা ধমকে ওঠে সে, কী 'বটে ত, বটে ত', কর হে! মন দিয়ে শুন, কে কী বইল্‌ছে! সে কথায় সহসা বুঝি সম্বিত ফিরে পায় মানুষগুলি। নড়ে চড়ে বসে। আলটপকা 'বটে ত' বলে ফেলাটা যে যার-পর-নাই বেকুবি হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে লজ্জায় অধোবদন হয়।

—ইখন, লিজ্যার মুলুকে উয়ার কী আছে, নাই আছে, উ লোক কেমন, উয়ার মাথার

উপর মুরুব্বি আছে কিনা, আমরা তো কিছোই নাই জানি। বটে কিনা? ভরত বাউরি তার যুক্তিজাল বিছাতে থাকে।

—বটে তো।

সখা বাউরি জ্বলন্ত চোখে তাকায় মানুষগুলির দিকে। শালারা ঠোঁটের ডগায় সারাক্ষণ গণ্ডা কতক 'বটে ত' গুঁজে লিয়ে বসে থাকে। যেমন দোক্তাপানটি গালের মধ্যে গুঁজে বুড়া-থুড়ারা বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর মাঝে মাঝে চিরিক চিরিক পিক ফেলে।

সখা বাউরির চোখের ভাষা নিশ্চিতভাবে পড়ে ফেলতে পারে মানুষগুলো। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অপরাধবোধে নীলাভ হয়ে আসে মুখ।

—ইখন, পাড়ার মেয়াটাকে লিয়ে গিয়ে যদি শেষমেষ কুনো বিপরীত ব্যাভার করে উ, যেদি অতিষ্ঠ হইয়্যোঁ মেয়াটা ভালমন্দ কিছো একটা কইরে বুসে, তখন তো 'ষোলআনা'ই দোষের ভাগী হবেক। অচিনা মানুষ, আর অচিনা জল, একোই কথা।

ভরত বাউরিকে জোরগলায় সমর্থন জানানোর ইচ্ছে হচ্ছিল তিলকের। কিন্তু বড়ই দমে গিয়েছে সে। তার প্রতি যে ইঙ্গিতটা করেছে 'ষোলআনা', তাতে করে একেবারেই মরমে মরে রয়েছে বেচারা। মুখ খুললেই যে অগ্নির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ তুলবে এরা, এটাই তাকে বোবা বানিয়ে রেখেছে পুরোপুরি।

—তুমি বড় ডগ্ ভাঙো ভরত। সখা বাউরি এবার সবাসরি প্রতিরোধে নামে, মেয়া যাবেক তার মরদের ঘর কইর্‌তে, আগাম অত কু গাইবার দরকার কি? সব মেয়াই বিয়ার পর চইলে যায় পরবাসে। মেয়ার দেশের লোক সে মুলুকের কথা কতটুকুই বা জানে! একদিন বর-ঘর দেইখ্‌তে গিয়ে কতটুকুই বা বুঝা যায়? তব্বো ত অচিনা মুলুকে যায় মেয়া, ঘর-সন্‌সার করে। বটে কিনা?

একটা সমবেত 'বটে ত' বড়ই আশা করছিল সখা বাউরি। কিন্তু 'বটে ত'র চাষীরা সব লিশ্চুপ। দু'দুবার ধমক খেয়ে লাগাম দিয়েছে মুখে। প্রবল বিরক্তিতে সারা মুখের সমুদয় রেখাগুলি ভাঙচুর হতে থাকে সখা বাউরির। চেঁচিয়ে বলে ওঠে, তুমরা কথা শুনছ, না'কি বুইসে বুইসে লিদাচ্ছ? অমন করল্যে বিচার হয়?

মানুষগুলি ততক্ষণে চিনে ফেলেছে তাদের তৃতীয় অপরাধটিকে। সখা বাউরির কথার পিঠে 'বটে ত' বলা উচিত ছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর 'বটে ত' বলার এবং না বলার মধ্যে কোনই ফারাক নেই।

গজেনই সমস্যার সমাধান করে দেয়। খুব বিনীত গলায় বলে, উই মুরুব্বির পো যা বইল্‌লেন, খুবোই লেহ্য কথা। চিনা শ্মশান, আর অচিনা জল, — কে নাই ডরায়? আমি এই তল্লাটেই ঘর কইর্যে রইব।

—এই তল্লাটে মানে?

—হয় শালকাঁকিতে, লয় তো চুয়ামসিনায়। গজেন খুব অমায়িক হাসে, তুমাদ্যার ঘরের মেয়া চক্ষের সুমুখেই রইল্যাক। খেইয়োঁ ফেলছি, নাকি গিলে ফেলছি, দেইখ্‌তে পাবে।

এ এমন একখানি প্রস্তাব, এমনই আকস্মিক, অভাবনীয়, যে অগ্নি, তিলক, ভরত-সহ জমায়েতের সবাইতো বটেই, এমনকি সখা বাউরিও বিস্ময়ে থ' হয়ে যায়। এমন প্রস্তাব

যে দিতে পারে গজেন, ভাবতেও পারে নি সে। তেমন কোনও ইঙ্গিত কেউই দেয়নি ওকে না গজেন, না প্রভঞ্জন।

অগ্নির সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গজেনের চোখে সরাসরি চোখ রাখে সে। দেখতে পায়, আপাত অমায়িক মুদ্রার আড়ালে গজেন লুকিয়ে রেখেছে সেই হাসিখানি, যা কিনা, আচমকা একখানা বোড়ে ঠেলে দিয়ে রাজাকে বন্দী করে ফেলবার মুহূর্তে চকিতে খেলে যায় চতুর দাবাড়ুর চোখের কোণে এবং ঠোঁটের ডগায়। মনে মনে শিউরে ওঠে অগ্নি। ওকে নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলবার যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে গজেন। এখন শুধু মুঠোখানি বন্ধ করবার অপেক্ষা।

সহসা বেত লতার মতো সপাং করে উঠে দাঁড়ায় অগ্নি, 'আমি উই খালমুয়ার ঘর কইর্‌তে রাজি লই। বাগে পেইলেই উ আমাকে ঘাড় মুইচ্‌ড়্যে মাইর্‌বেক। তুমরা উয়াকে চিন নাই। আমি চিনি। বলতে বলতে গোরাচাঁদকে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায় সে।

বিস্মিত, হতচকিত, অপমানিত 'ষোলআনা' থম মেরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর পুরো বড়ামতলা জুড়ে ধমক-চমক, কটু-কাটব্য, হুমকি ও শাপ শাপান্তের ঝড় বয়ে যায়। অগ্নি ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে নিজের উঠোনে।

১৯. ক্লাব মানে জোট

প্রভঞ্জনরা যখন 'মিতালি সংঘ' গড়েছিল, তখন পুরো চুয়ামসিনা গাঁ'টার তলব পড়েছিল সিংহগড়ে। সম্পন্ন পাড়াগুলো তো বটেই, বাউরি, বাগদি, শিকারি কোনও পাড়াই বাদ যায়নি। ব্লক অফিস থেকে সোস্যাল এডুকেশন অফিসার বিপদবাবু এসেছিলেন। আর, সন্ধেবেলায় সিংহগড়ের কাচারির সুমুখের খোলা মাঠে বসেছিল যেন কপিলেশ্বরের গাজন মেলা।

প্রভঞ্জন চিৎকার করে বলেছিল, একটা ক্লাপ ঘর গড়তে হবেক হে।

—সিট্যা কী আইজ্ঞা? মানুষগুলো অলবলে চোখে তাকায়।

'ক্লাপ' বস্তুটি কি, সেটা প্রভঞ্জনেরও ঠিকঠিক জানা ছিল না। যা দেখেছে,শুনেছে, 'ক্লাপ ঘর' হল কিছু 'নেই-কাজ তো খই ভাজ' ছোকরাদের আড্ডা-গুলতানি মারবার জায়গা। তাস পাশা, কেরাম পিটবার ঘর। মাঝে মাঝে ফিস্টি করা, যাত্রা-থিয়েটার, ফুটবল, ভলিবল খেলা। কামেশ্বর হাজরার ছেলে পল্টু হাজরা বিষ্টুপুরে, 'শক্তি সংঘে'র সেক্রেটারি। প্রভঞ্জনের ভাল মতো আলাপ রয়েছে ওর সঙ্গে। সেই সুবাদে বারকয় গিয়েছে 'শক্তি সংঘ'র ক্লাব ঘরে। ক্লাবে তো এই সবই হয়। এ ছাড়া পল্টুদার ক্লাবের আরও একটা বাড়তি ঐতিহ্য রয়েছে। মারামারিতে ঐ ক্লাব বিষ্টুপুরের মধ্যে চাম্পিয়ন।

—ক্লাপ মানে, এই গল্প-গুজব, খেলাধুলা, যাত্রা-থিটার....। প্রভঞ্জন এই প্রকারে ব্যাখ্যা করে ব্যাপারটা।

মানুষগুলো ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকে। খেলাধুলা, যাত্রা-থিয়েটারের দল বাঁধবেক বাবুরা, তা আমাদ্যার মতন চদুগুলানকে ডাকবার হেতু কি? আমাদ্যার তো দিনভর খাটালি করতে করতে পোঁদের চাম ক্ষয়ে যাবার জোগাড়। তবুও হাউসি ছোকরাদের দু'একজন শুধিয়ে বসে, কী খেলা আইজ্ঞা? দাড়িয়া, কপাটি, নাকি অন্য কিছো?

'দুর-দুর' প্রভঞ্জন শব্দ করে হেসে ওঠে, উসব খেলা আজকার দিনে কে খেলে? কত বিলাতি খেলা আমদানি হয়েছে দেশে। ফুটবল, ভোলিবল, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন ...।

—আমাদ্যার খেইল্‌বার টাইম কুথা আইজ্ঞা? আমাদ্যার তো দিনভর কাছা সামাল দিতেই অস্থির।

প্রভঞ্জন যথাযোগ্য জবাব খুঁজে পায় না। আমতা আমতা করে বলে, সব হবেক। কাজও হবেক, আমোদ-ফূর্তিও হবেক। যে মেয়া রাঁধে, সে তো চুলও বাঁধে।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়ান বিপদবাবু। এ তল্লাটের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণের দায়িত্ব তাঁরই ওপর ন্যাস্ত। 'ক্লাপ'এর সঠিক উদ্দেশ্য বাতলে দেওয়াটা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

বলেন, ক্লাব মানে জোট। নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধা। একা থাকলে কত বিপদ। ব্যাঙেও লাথি মারে। ঐ যে, বুড়োর চার ছেলের গল্প। ঝগড়া করত চারজনাতে। বুড়ো বলল, একটা করে লাঠি কুড়িয়ে আন তো বাপ। বিপদবাবু বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বলেন। ক্লাব হল সংঘবদ্ধ হওয়ার জায়গা। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকলে বাঘ-সিংহও পাশ ঘেঁসবে না।

কথাগুলো কেমন হেঁয়ালি ঠেকে মানুষগুলোর কাছে। মিনমিন করে বলে, ত, আইজ্ঞা, আমাদ্যারকে কী কইর্‌তে হব্যেক?

বিপদবাবু সেটা বোঝাতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্রভঞ্জন মুখের কথা কেড়ে নেয়।

—আগে ইস্কুল ঘরের পাশের খুইল্যাটা ভরাট কইর্‌তে হব্যেক। সেটা বটে আমাদ্যাব। বাবা উট্যা ক্লাপকে দান করবেক। কথা দিয়েছে। সেই জাগার উপর কাঁথ তুইল্‌তে হব্যেক। জঙ্গলের কাঠকেইট্যে কড়ি-বরগা বানাতে হবেক। ছাইতে হবেক। ভাবতে গেলে অনেক কাজ। তবে দশের লাঠি একের বোঝা, একজনের কাজ দশজনাতে কইর্‌লে দেইখ্‌তে জুগায় না।

পাদপুরণ করেন বিপদবাবু, ঘরটা তৈরি হয়ে গেলে, খেলার সরঞ্জাম আসবে। বই দেবে সরকার। রাত-পাহারার জন্য বল্লম, হুইশেল, টর্চ....। বিডিও সাহেব স্বয়ং আসবেন উদ্বোধন করতে। তারপর কাজ শুরু হয়ে যাবে পুরোদমে।

কাজ! কী আচানক কথা! খেলাটাকে কাজ আখ্যা দেন বাবুরা! কী কাজ আইজ্ঞা?

—কাজের অভাব আছে? গাঁয়ের পুকুর-পুষ্করিণীগুলো সাফ করতে হবে। ঝোপঝাড় কাটতে হবে। মশা-মাছি নির্মূল করতে হবে। ঘরে আগুন লাগলে ছাড়াতে হবে। কেউ মরে গেলে পোড়াতে হবে। কারুর অসুখ করলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গাঁয়ে চোর-ডাকাত পড়লে তাড়াতে হবে। আরও কত কত কাজ আছে। নেমে পড়লে সব বুঝতে পারবে তখন।

এসব কাজের কথায় বাউরি-বাগদিদের বুক পুলকে নেচে ওঠে না মোটেই। বুড়ো-মুরুব্বি, পাকামাথাদের কেউ কেউ ততক্ষণে পেয়ে গেছে পিঠের ভেতরের পুরটির সোয়াদ। গাঁয়ের বড় বড় পুকুরগুলোর বারোআনাই সিংহগড়ের। বাকি চারআনা কুচলান, কয়াল কিংবা গাঙ্গুলিদের। ওগুলো সাফ করলে মশা-মাছি কমবে কিনা জানা নেই এদের, তবে বাবুদের মাছ চাষের বড়ই সুবিধে হবে। আর আগুন নেভানো, মড়া পোড়ানো, ডাকাত ধরা, রোগীকে

কাঁধে বয়ে বিষ্টুপুর নিয়ে যাওয়া, এসব আসলে বাবুদের বেগার খাটানোর নয়া ধান্দা। বাউরির ঝুপড়িতে আগুন লাগলে সিংহবাবু, গাঙ্গুলি, কয়াল, কুচলানদের বাড়ির লোকেরা জল ঢালতে দৌড়ুবেন? বাউরি-বাগদি মরলে প্রভঞ্জন সিংহবাবু, স্বপন গাঙ্গুলিরা মড়া বইবেন? আর ডাকাত তাড়ানো? ওটা তো বাবুদের এক মস্ত রসিকতা। বাউরি-বাগদিদের পাড়ায় ডাকাত আসবে? উয়াদ্যার লাজ নাই মুখে? আসলে, ঐ ফিকিরে ছোটলোকগুলানকে নিজেদের কাজে বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেওয়া, সংঘবদ্ধতার নামে। আগে ধমক-চমক দিয়ে যে বেগাব আদায় করবার রীতি-রেওয়াজ ছিল, এখন মিষ্টি কথায় ক্লাপের নামে ঐ বেগার আদায় কবা। ঘুরিয়ে নাক দেখানো। অর্থাৎ কিনা, তোমরা সব জোট বাঁধো হে। জোট বেঁধে আমাদেব ঘরবাড়ি পাহারা দাও। আমাদের বাঁধ-পুকুরগুলানকে সাফ কর। আমাদের বাখুলের আগুন নিভাও। মড়া পোড়াও। আমাদের বাড়ির রোগীদের খাটিয়ায় বয়ে বিষ্টুপুর লিয়ে যাও। কেন না, ইয়ার নাম বটে জোটবাঁধা। ক্লাপ ঘর।

কার্যক্ষেত্রেও তাই হল। বাউরি-বাগদি-শিকারিদের গতর নিংড়ে যতটা আদায় করা গেল, তাতে করে ভরাট হল হীরাবাড়ির খুলিয়া, মাটির দেওয়াল উঠল। জঙ্গলের কাঠ দিয়ে কড়ি-বরগা হল। তখন চাল ছাইবার টিন চাই। সে টাকা কোত্থেকে আসে? বুদ্ধি জোগালেন স্বয়ং বিডিও সাহেব।

—একটা মোরাম রাস্তার স্কীম স্যাংসন কইরা দিত্যাসি। ক্লাবের ছোকরারা কামটা কইরা অই ট্যাহায় কিন্নিয়া লাও টিন। আমি মাস্টার-রোল পাইলেই খুশি।

প্রভঞ্জন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে শোনায়। বলে, এ হইল্যাক দেশের কাজ। দেশের কাজ এভাবেই কইর্‌তে হয়। স্থির হয়, লেবার দিয়ে নয়, এ স্কীমের মোরাম ক্লাপের মেম্বররাই কাইট্‌বেক।

ঠিক দিনে শুরু হয় মোরাম স্কীমের কাজ। জয়বামপুর থেকে লোখেশোল। মোরাম কেটে, বয়ে এনে, রাস্তার ওপর বিছানো। সকাল সকাল চুয়ামনিার বাউরি, বাগদি, লোহার, শিকারি আর সাঁওতাল পাড়ার বাছাবাছা শ'তিনেক জোয়ান 'ক্লাপ-মেম্বর' গাঁইতি-শাবল নিয়ে লেগে যায় কাজে। প্রভঞ্জন, স্বপন, মাখন, ভৈরব, অনুকূলরাও সেই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়। তবে শাবল-গাঁইতি দিয়ে মোরাম ভাঙা তো আর ওদের কম্মো নয়। ওরা কাজের থানে ঘোরাঘুরি করে, তত্ত্ববধান করে, বুদ্ধিভরসা জোগায়, কোন্ দিক থেকে জোরসে চাড় দিলে বিশাল মোরামের চাঙড়খানি উঠে আসবে, সে সব বুঝিয়ে বলে দেয়। চাড় মারবার সময় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেয়। চাড় মার্, মার্, জোরসে শাবল চাপ্‌রে। এই চৈত্‌না, জোর দে। ঘোর কার্তিকের দিন। গরীব-গুরবোদের ঘরে একদানা খাবার নেই। ক্ষেতে-খামারে কাজ নেই। এই মোরাম স্কীমের কাজটা পেলে কিছু মানুষ দিনান্তে আধাপেটা খেতে পেত। বাবুদের ক্লাপঘরের টিন কিনতে গিয়ে ....। উপোসী শরীরগুলো টলে। এখানে-ওখানে দু'একটা সরকারি মাটি-কাটার কাজ চলছে। যেতে পারলে দু'চার মুঠো খাবার মিলত দিনান্তে। নিদেন শাকপাতা, গেঁড়ি-গুগলি, বনের ফল-পাকুড় খুঁজে বেড়ালেও পেটের গভ্ভরে কিছু পড়ত। কিন্তু ক্লাপঘরের মেম্বরদের সে উপায় নেই। এ হইল্যাক দেশের কাজ, দশের কাজ।

রোজ সকালবেলায় নিজেদের ঝুপড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে মানুষগুলো। যদি কোন গতিকে একদিনের তরে দেশের কাজ-এর থেকে রেহাই মেলে। কিন্তু গাছে-পতরে বেলা বাড়লেই প্রভঞ্জনের দল ঝুপড়ির আগড়ে ঘা মারে। কুথা রে, কিংকর, সাগর ...।

কিংকর বাউরি আগড় ঠেলে বেরিয়ে আসে অগত্যা। কেঠো হাসি হাসে। বলে, যাবো আইজ্ঞা, কিন্তু কাল থিকে যে দানা নাই পেটে। খালিপেটে মোরাম ভাঙি ক্যামনে?

মাখন কাপড়ি বিজোড় দাঁতে হাসে। বলে, আরে চল্ না। উই,যা কাইট্‌বি, উয়ার থিকে কোদাল খেইয়ে লিবি।

এমন নির্মম রসিকতায়ও দাঁত গিজুড়ে হাসতে হয় কিংকর বাউরিকে। হাসির সঙ্গে হাসি মেলাতে হয়। কেন কি, এর নামই সংঘবদ্ধতা।

এইভাবে একদিন মোরাম স্কীমের কাজ শেষ হয়। সেই টাকায় নতুন টিন কেনা হয়। শক্তি সংঘ'র চালে ঐ টিন চড়ে। ঠা-ঠা দুপুরে সে টিনের গায়ে সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে যায়। বিশাল ডিহির মধ্যে সে এক শোভা। পাঁচ-সাত গাঁয়ের মধ্যে সে এক মহা গৌরবের ব্যাপার। দাপানজুড়ির জঙ্গলের মহুলগাছে চড়লে কিংবা ঠাকরান পুকুরের উঁচু পাড়ে দাঁড়ালে গ্রামসিনার 'শক্তি সংঘ'র চকচকে টিনের বাড়িটা দেখা যায়। আনাগোনার ফাঁকে কত দেশ-বিদেশের মানুষ দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে ভুলভুল চোখে দেখে।

ক্লাপঘরটা হওয়ার পর বাউরি-বাগদিরা কিছুদিনের জন্য নিস্তাব পেয়েছিল। বাবুরা আর বড় একটা ডাকাহাঁকা করতেন না। নিজেদের মনে ফূর্তি-আহ্লাদ করতেন ওঁরা। বল-টল খাথাতেন। তাস-পাশা পিটতেন। বেশ শান্তিতে ছিলেন। কেবল ক্লাবের থিয়েটার হওয়ার কালে ওদের ডাক পড়ত। খুঁটি পুতে ইস্টেজ তৈরি, সারমানা খাটানো, এবং আনুষঙ্গিক খাটালির জন্যই ডাকা হত ওদের। এছাড়া বাবুদের ঐ 'ক্লাপঘরের' সঙ্গে বাউরি-বাগদিদের তেমন একটা যোগাযোগই ছিল না। কেবল মাঝে মধ্যে উনাদের পাড়ায় চুরি-টুরি হলে এইসব পাড়ার কিছু দাগী মানুষকে গিয়ে ক্লাব ঘরের কড়িকাঠে ঝুলতে হত।

তিলক বাউরি, হঠাৎ মুর্মুদের মতো কিছু ছোকরা, যারা সুকুমারের পিছু পিছু ঘোরে, বাবুদের এই 'ক্লাপঘর' উপাখ্যানের চরিত্র হয়নি, -- বিপদবাবু সঙ্গোপনে বলেন, ওদের আনতে হবে। কারণ এদিকে না আনলে, ওরা অন্য দিকে যাবে। কেন কি, আইডিল ব্রেন ইজ ডেভিল্‌স্ ওয়ার্কশপ।

১০. নদী নিয়ে স্বপ্ন

সতীর অঙ্গছেদ, পীঠস্থানগুলির সৃষ্টি, — পাগল শিকারি পুরাণের গল্প শোনায় বুদ্ধদেবকে। একান্নটা পীঠ। মুখে মুখে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকাও পেশ করে। এবং পাগল শিকারির যা স্বভাব, গম্ভীর প্রসঙ্গ থেকে আচমকা তরল প্রসঙ্গে পিছলে যাওয়া, গম্ভীর ও তরলকে একসঙ্গে পাঞ্চ করে আপাত সরল বিষয়টিকে জটিলতার গভীরে ঠেলে দেওয়া। পুরাণের একান্ন পীঠের কথা বলতে বলতে আচমকা হলুদ দাঁত গিজুড়ে বলে, বাঁকুড়া জিলায় একটাও পীঠ নাই কেনে বলতে পারেন? সেই গল্পটাই তরিবত করে শোনায় পাগল।

উন্মত্ত শিবঠাকুর সতীর দেহখানি কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

'প্রভু শান্ত হোন, প্রভু শান্ত হোন' বলে পাশে পাশে দৌড়ুচ্ছে প্রিয় ভৃত্য নন্দী-ভৃঙ্গী। পেছ
নারায়ণের সুদর্শনচক্র সতীদেহ ছিন্ন করতে করতে চলেছে। তখন বেলা আন্দাজ দশ
শিব ঠাকুর বীরভূম থেকে একলম্ফে বাঁকুড়ার মাটিতে চরণ রাখলেন। সহসা চারপা
আকাশ-বাতাস জুড়ে শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠল। প্রলয় ঝড়ের মুহূর্তে সমুদ্রের কিনারে যে
বিরামহীন শোঁ- শোঁ আওয়াজ ওঠে, ঠিক তেমনি। শিবঠাকুর চমকে উঠলেন। আকাশের দি
তাকালেন। রোদ্দুরে ঝলমল করছে পৃথিবী। আকাশে এক টুকরো মেঘের লেশমাত্র নে
গাছ-গাছালির দিকে তাকালেন। স্থির তারা। ঝড়ঝঞ্ঝার কোনও দৃষ্টিগ্রাহ্য লক্ষণই নেই, অ
চতুর্দিকে অবিরাম শোঁ-শোঁ ঝড়ের আওয়াজ। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই নন্দী-ভৃঙ্গীর দিকে এক ঝল
তাকালেন শিব ঠাকুর। নন্দী-ভৃঙ্গী, এ কী বিপরীত আচরণ প্রকৃতির? ঝড়ের আওয়াজ শুন
পাচ্ছি, অথচ চারপাশে ঝড়-ঝঞ্ঝার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দৃশ্যমান নয়, এ কী অস্বাভাবিক অলৌকি
ব্যাপার? আমার ভয় করছে নন্দী। প্রকৃতির কুটিল অস্বাভাবিক রূপকে আমি চিরকালই ভ
করি।

নন্দী বলে, ভয় পাবেন না প্রভু। এ মোটেই ঝড়ের আওয়াজ নয়।

তবে?

আপনি রাঢ়ভূমিতে চরণ রেখেছেন প্রভু। এখন রাঢ়ের মানুষের সকালের জলখাব
খাওয়ার সময়। ওরা সবাই এক থালা করে মুড়ি নি বসেছে। মুড়িতে জল ঢেলে
মুড়ি ভিজছে প্রভু, এ তারই আওয়াজ।

শিবঠাকুর ক্ষণকাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন নন্দীর দিকে। তুমি বলছ কি নন্দী
মুড়ি ভিজলেএমন আওয়াজ ওঠে নাকি?

ওঠে প্রভু, তবে একটিমাত্র পাত্রে মুড়ি ভিজলে সে আওয়াজ শোনা যায় না। এক্ষে
ব্যাপারটা অন্যরকম। চারপাশের সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার পাত্রে মুড়ি ভিজছে।
তারই সমবেত আওয়াজ প্রভু।

শিবঠাকুরের দুই নেত্রে ভয় মিশ্রিত বিস্ময় ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। নন্দী কথা শেষ করব
সঙ্গে সঙ্গেই, 'মুড়ি ভেজানোর এই আওয়াজ! কোন্ মুলুকে এলুম রে বাবা! নন্দী, এ মুলু
আর এক দণ্ডও থাকা নয়।' বলে শিব ঠাকুর মারলেন এক বিষম লম্ফ। সটান পৌঁছে গেলে
হুগলি জিলায়। এত ঝটিতি ঘটল পুরো ব্যাপারখানা, সুদর্শন চক্র সতীর অঙ্গচ্ছেদ করব
সময়ই পেল না।

পাগল শিকারি পুনরায় দন্ত ছিরকুটি হাসে, সেই তরেই বাঁকুড়া জিলায় কুনো পীঠ ন
আইজ্ঞা। সুদর্শন চক্র এ জিলায় সতীর অঙ্গচ্ছেদ কইর্‌বার টাইমই পায় নাই। বলতে বল
নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠে পাগল শিকারি।

অন্তিম বিকেলে হরিণমুড়ি নদীর তীরে বসে সেই কথাটাই ভাবছিল বুদ্ধদেব। হরিণমুড়ি
জল বয়ে চলেছিল অবিরাম। অনেক দূরে, সিংহগড়ের গা ঘেঁসে হরিণমুড়ির সমগ্র গর্ভ জু
কালো ব্যাসল্ট পাথরের অমসৃণ চাতাল। হরিণমুড়ি সেখানে সারাক্ষণ ঘুঙুরের মতো বে
যায়। ঘুঙুরের আওয়াজখানা অস্পষ্ট কানে আসছিল বুদ্ধদেবের।

এমনিতে উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এক ও অখণ্ড ধারাবাহিক এক নদী, কিন্তু আজ আর হরিণমুড়ির ক্ষেত্রে তেমনটা বলা যায় না। আজ সে কম পক্ষে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এক-একটি ভাগের এক-একটি পৃথক পৃথক নাম। সেকসন-এ, সেকসন-বি ...। মানুষের দেওয়া নাম, নদী সেটা জানে না, জানলেও মানে না, সে বয়ে চলে অবিরাম, অখণ্ড, ধারাবাহিক। শুধু,যে অংশগুলো সরকারি অর্থে গভীর ও প্রশস্ত হয়েছে, নদী সেই অংশে পৌঁছে তীব্র অভিমানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীরে, আত্মহত্যার মুদ্রায়। বুদ্ধদেব বসেছিল অগভীর অপ্রশস্ত অংশে। অপলক দেখছিল নদীর বয়ে যাওয়া। ভাবছিল। মনের মধ্যে বুঝি ঘুরপাক খাচ্ছিল একটাই প্রশ্ন, নদী, তোমার কতগুলি অংশ? কত টুকরো হয়ে বইছ, নদী? তুমি কি জান, তুমি আর একটিমাত্র নামে নিজের পরিচয়কে সম্পূর্ণ করতে পার না? জানো কি, তোমার নামের পাশে আরও পাঁচ-পাঁচটা উপনাম দিয়েছে মানুষ? পাঁচ অংশে তোমার পাঁচ উপনাম। তুমি কি জানো, নদী, তোমার জন্যই আজ একটা মানুষের আজীবনলালিত স্বপ্নখানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল? বেবাক মিথ্যে হয়ে গেল? জানো কি, তোমার জন্য পাগল শিকারির স্বাধীনতা-দিবসের রাতে দেখা স্বপ্নটা সত্যি হতে বসেছে?

হরিণমুড়ি জবাব দেয় না। অবিরাম শব্দ তুলে বয়ে যায়। বুদ্ধদেবের যাবতীয় অদাহ্য অজীর্ণ প্রশ্নমালা মগজের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সতীর দেহের মতো হরিণমুড়িকেও কেটে পাঁচ টুকরো করেছে করালী সোম। রাঢ়ভূমির মাত্র জনা-পাঁচেক মানুষ জানত সেটা। এম-এল-এ সিদ্ধেশ্বর হাজরা, ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার সুকোমল দত্ত, বিডিও অবিনাশ ভৌমিক, করালী সোম আর সিদ্ধেশ্বরের ভাইপো পল্টু হাজরা। গেল নির্বাচনে হরবল্লভ যৎপরোনাস্তি খেটেছিলেন সিদ্ধেশ্বরের হয়ে। অর্থ এবং কর্মীদের দু'বেলা খাওয়ানোর জন্য চালও সরবরাহ করেছিলেন তিনি। সিদ্ধেশ্বর হাজরা সেই উপকারের কথা ভোলেন নি। প্রতিদানে হরবল্লভকে দিয়েছিলেন হরিণমুড়িকে পাঁচখণ্ডে ভাগ করবার অধিকার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। কম নয় সে অর্থের পরিমাণ। হরিণমুড়িব পাঁচ মাইল দীর্ঘ খাত, যা হরবল্লভের এলাকায় পড়েছে, প্রশস্ত ও গভীর করে কাটবার জন্য সাকুল্যে আড়াইলাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। পুরো স্কীমটা বানিয়েছিল করালী সোম। ভেট করেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার সুকোমল দত্ত। সে স্কীম কোলকাতায় গিয়েছিল অনুমোদনের জন্য। পাঁচটি অংশে বিভক্ত সে স্কীম, প্রতি অংশের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। এলাকার লোক শুনেছিল। হরিণমুড়ির একটা অংশ কাটানো হবে। কোন্ অংশ, কতখানি অংশ, এসব কেউ জানত না। হরবল্লভের দল গোপন রেখেছিল এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। সিদ্ধেশ্বরের তদবিরে স্কীমটা মঞ্জুর হয়েছিল কোলকাতায়। বিডিও সাহেব এবং করালী সোম কোলকাতায় গিয়ে হাতে হাতে নিয়ে এসেছেন অনুমোদনের হুকুমনামা। টাকার বরাদ্দনামাও হাতে হাতে এনেছেন। করালী সোম এ বিষয়ে যাবতীয় কাগজপত্র, হুকুমনামা রেখে দিয়েছে নিজের আলমারিতে।

এক সময় টেণ্ডার ডেকে ঠিকাদার নির্বাচন করে কাজ শুরু হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের ভাইপো পল্টু হাজরা পেয়েছে কাজটা। মাস ছয়েক ধরে এক নাগাড়ে কাজ চলেছে। এক সময় কাজ বন্ধও হয়ে গিয়েছে। এলাকার মানুষ জানতে পেরেছে, হরিণমুড়ির কাজ শেষ।

যদিও বুদ্ধদেব ঐ এলাকার গ্রামসেবক, ঐ স্কীমের ধার ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি তাকে। পল্টু হাজরা অধর ঝারমুনিয়া এবং তার মেজো ছেলে পচু ঝারমুনিয়াকে নিয়োগ করেছিল কাজটা দৈনন্দিন তদারকি ও লেবারদের মজুরি বিলি করবার জন্য।

আশে পাশের গাঁগুলো আশা করেছিল তাদের এলাকাতেও নদীটাকে কাটা হবে। অনেকেই নদীর ধারে দো-ফসলা চাষের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্কীমটার কাজ হল মাত্র মাইল দু'য়েক এবং তাও সিংহগড়ের পাশ থেকে জাঙ্গীরপুরের জঙ্গলতক্ক, যে এলাকায় হরবল্লভের জমিই বারোআনা, নদীর দুই কিনার জুড়ে। যে এলাকায় নদীটাকে কাটানো হল না, ঐ এলাকার জমিগুলো, যারা ইতিমধ্যেই শরীরে একখানা করে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি পরবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তারা সব ঈর্ষাতুর চোখে তাকিয়ে থাকে, আর শালিখ চড়ুইয়েরা ওদের রুক্ষ্ম বুক থেকে দানা খুঁটে খুঁটে খায় দিনভর।

২১. পাগল শিকারির বিপজ্জনক স্বপ্ন

পাগল শিকারি যে চারপাশেব অজস্র ক্যানভাসে বিপজ্জনক সব ছবি এঁকে ফেলতে পারে, তা বুদ্ধদেব জানে।

শুধু ছবি বানানোই নয়, পাগল শিকারি স্বপ্ন দেখতেও ওস্তাদ। একান্তে কিংবা হাজাব জনের মধ্যে, অবসরে কিংবা হাড়ভাঙা খাটুনির ফাঁকে ফাঁকে, নিদ্রায় অথবা জাগরণে, সে হঠাৎ হঠাৎ অসম্ভব সব স্বপ্ন দেখে ফেলতে পারে। আসলে, স্বপ্ন দেখে না, পাগল শিকাবি স্বপ্ন বানায়। এবং সেজন্য তার ঘুমোবার প্রয়োজন পড়ে না মোটেই। সে জেগে জেগে, জমিনে হাল চালানোর ফাঁকে ফাঁকে, বিশাল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে আলপথ ভাঙতে ভাঙতেও চুরি করে দেখে নিতে পারে এমন সব স্বপ্ন, যা কেবল অসম্ভব, অবাস্তব, অলৌকিকই নয়, কখনও কখনও বিপজ্জনকও বটে। যেমন স্বাধীনতা দিবসের দিন বিকেলে চুয়ামসিনা ইস্কুলের সামনে পতপত করে উড়তে থাকা পতাকাটাকে দেখতে দেখতে সে এমন স্বপ্ন দেখে ফেলতে পারল, যেন বাঁশের ডগায় পতাকাটা বেমালুম নেই। সবুজ রঙের দড়িখানাকে তার মনে হল একটা লাউডগা সাপ। সব মিলিয়ে, একখানা বাঁশের গায়ে একখানা লাউডগা সাপ পেঁচিয়ে উঠেছে, আর বাঁশের একেবারে চুড়োয় তার তেরঙ্গা ফণা। যেমন চুয়ামসিনায় বাবা কপিলেশ্বরের থানে কথক-গান শুনবার কালে, যখন কথক ঠাকুর গাইছিলেন বসুদেব আর দেবকীর বন্দী জীবনের বৃত্তান্ত, যখন প্রবল বর্ষণের রাতে কংসের কারাগারে দেবকী তাঁর অষ্টম সন্তানের জন্ম দিলেন, আর ঐ প্রলয় নিশীথে কৃষ্ণশিশুকে কোলে নিয়ে বসুদেব চললেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে, পথে বাসুকি নাগ তার সহস্র ফণা দিয়ে শিশু কৃষ্ণকে আড়াল করলেন প্রবল বর্ষণ থেকে, সে রাতে পৃথিবী প্রলয় তাণ্ডবে মেতেছে, চরাচর কাঁপিয়ে প্রলয়-বর্ষণ, মুহুর্মুহু বজ্রপাত, নখে-দাঁতে কিড়িমিড়ি খাচ্ছে আকাশ, প্রকৃতির সেই রুদ্রমাতনে প্রাসাদের সুখশয্যায় শুয়ে বার বার কেঁপে উঠছে মহাবলী কংসের শরীর। তার বুকের মধ্যে বাজছে দুরুদুরু রবে এক অচেনা বাজনা। শুনতে শুনতে কখন জানি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কথক-ঠাকুরের গান। পাগল শিকারি একটু একটু করে তলিয়ে গিয়েছে এক বিপজ্জনক স্বপ্নেব অতলে। প্রবল বর্ষণের রাতে সিংহগড় থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করেছে হরিণমুড়ির

দিকে। তার কোলে এক সদ্যজাত সন্তান। সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া বইছে, মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ছে গাছ-গাছালির ডাল, ঝলাক ঝলাক বিজলি চমকাচ্ছে বৈচ্যার জঙ্গলের মাথায়, আর, সব কিছুকে তুচ্ছ করে হেঁটে চলেছে পাগল শিকারি। নিকষ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না শিশুটির মুখ, কিন্তু তার কচি শরীরে এতখানি শক্তি যে পাগল শিকারি কিছুতেই তাকে কোলের মধ্যে সামাল দিতে পারছে না। রওনা দেওয়ার মুহূর্তে বউ সারো তাকে ভেজা গলায় অনুনয় করেছে, এমন কুথাও রেইখ্যে আইস, যাতে কত্তাবাবু উয়ার লাগাল নাই পায়। যেন আমাদের অন্তে বাকি খাটালির দায় উয়ার উপর নাই বর্তায়। পাগল শিকারি সেই কথাগুলিকে বুকের মধ্যে বাজাতে বাজাতে চলেছে .... চলেছে ....।

পাগল শিকারির আসল নাম সুধন্য। কিন্তু ও নামে আর কেউ ওকে ডাকে না। নামটা ভুলেই গেছে সবাই। তামাদি হয়ে গেছে। কিংবা নামও তো এক জাতের কপ্পুরের পারা চিজ, ব্যবহার না করে একঠাঁই ফেলে রাখলে উবে যায়।

অথচ পাগলের বাপ তুখোড় শিকারির কী ব্যাকুল এক ইচ্ছা ছিল, পাগলের নাম সুধন্য রাখে। আসলে তুখোড়ের বউ যখন ন'মাসের পোয়াতি, তখনই একদিন উজমুদ্দা এক সাধু এল শিকারিপাড়ায়। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল তুখোড়ের ঝুপড়ির সামনে। হিন্দি-বাংলায় মিশিয়ে বলল, এ ঝোপড়িমে দেওকি আছে। তুখোড় বুঝতে পারেনি। সাধুই বিতাং করে বোঝাল। বসুদেব আর দেবকীর গল্প। কংসের কারাগারে তারা এমন এক পুত্রের জনম দিল, যে কিনা বড় হয়ে বাপ-মাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করল। সে হল দেওকিনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ। কংসকে বধ করে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেছিল। সাধু বলে, এ ঝোপড়িতেও এক দেওকি রয়েছে। সাচ কি ঝুটা? তুখোড় গদগদ গলায় বলে, সাচ, বাবা। দেওকি মা'কে লিয়ে আয় তো সামনে। সরম কি কোই বাত নেই। উ মাতা, মে উনকী বাবুয়া। তুখোড়ের বউয়ের শরীর তখন বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। ঐ শরীর নিয়েই নিয়মিত সিংহগড়ে যেতে হয় তাকে। তার জন্যই তৈরি হচ্ছিল সে। এমন সময় দোরগোড়ায় ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, উঠোনে পা দিয়েই বলে কিনা, এ ঘরে দেওকী রয়েছে! ভারি শরীরখানা নিয়ে বউ এসে দাঁড়ায় সামনেটিতে। তুখোড় শিকারি ততক্ষণে দাওয়াতে ঝাঁটপাট দিয়ে সসম্মানে বসিয়েছে সাধুকে। বউয়ের দিকে থির পলকে তাকিয়ে থাকেন সন্ন্যাসী, বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে দু'চোখের সামনে মেলে ধরেন। ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন প্রতিটি রেখা। তারপর ভবিষ্যতবাণী করেন, তুখোড়ের বউয়ের গর্ভে যেটি আসছে, সেটি বেটা ছেলে হবে। সে-ই তোদের দু'জনকে পুরুষানুক্রমের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবে। আজীবনকাল ব্রহ্মচারী আমি, আমার বচন ঝুট নেহি হোগা। আর একটা কথা, ঐ ছেলের নাম রাখবি সুধন্য। অন্য কোনও নাম নয়। সুধন্য। একদিন ঐ নাম রাঢ়ভূমিব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। সুধন্য। সিধেপাতি নিয়ে চলে গেল সাধু। হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। শিকারিপাড়ার অন্য কোনও ঘরে গেল না, কাউকে কিছু শুধোল না, কারুর দিকে দৃকপাত অবধি করল না। যেন তুখোড় শিকারির বউকে এই হিতোপদেশ দেবার জন্যই তাঁর আগমন। কিনা, ব্যাটার নাম রাখিস সুধন্য।

আর, অবাক কাণ্ড, মাস না পেরোতেই বউ প্রসব করল একটি পুত্র সন্তান। সাধুর ভবিষ্যৎ

বাণীর অর্ধেক ফলল হাতে হাতে। বাকি অর্ধেক সময়ে ফলবে, এমন বিশ্বাসে তুখোড় শিকারি ছেলের নাম দিল সুধন্য।

দড়ির দোলনায় দুলতে দুলতে প্রতাপলাল শুধোলেন, ব্যাটার নাম কি রাইখ্‌লি রে, তুখোড়?

তুখোড় শিকারি মালিকের সুমুখে মরমে মরে যায়। মিনমিন করে কোনগতিকে উচ্চারণ করে, আইজ্ঞা, সুধন্য।

— কী ধন্য? প্রতাপলালের দোলনা দোল দিতে দিতে থেমে যায়। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন তুখোড় শিকারির দিকে।

তুখোড়ের কেমন ভয় করছিল। তাও সে দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করে নামখানি, সুধন্য।

বাব্বা! ব্যাটাব নাম সুধন্য! প্রতাপলালের ঠোঁটে তীব্র ভাঙচুর হতে থাকে, পাগল! বলতে বলতে তিনি তুখোড়ের ব্যাটার নামকরণ করে বসেন, পাগল। তুখোড়ের ব্যাটা পাগল।

মালিকের ইচ্ছার বাইরে যেতে পারেনি তুখোড় শিকারি। তা বাদে, প্রতাপলালের মুখ থেকে খসে পড়া নামখানি মাটিতে পড়তে দেয়নি অনুগত, বশংবদ, প্রজা, ভৃত্যের দল। সবাই ডেকে ডেকে ঐ নামটিকেই প্রতিষ্ঠা করে দেয় দুনিয়ার বুকে। কাজেই সুধন্য হয়ে যায়পাগল। পাগল শিকারি।

সাধুব ভবিষ্যতবাণীর বাকি অর্ধেক ফলেনি। পাগল শিকারিও মালিকের শিকলে বাঁধা পড়ে রইল আজীবনকাল। দেওকী আর বসুদেবকে মুক্ত করা তো দূরের কথা, আরও দ্বিগুণ বন্দীত্ব স্বীকার করে সে সিংহগড়ের ক্রীতদাসে পরিণত হল। তুখোড় শিকারি তার শেষ জীবনে, সাধুটাকে সুযোগ পেলেই আচ্ছাসে গাল পাড়ত। শালা, ঢ্যামনা সাধু, চাল আর পয়সাব ধান্দায় আইছিল। শালা, বলে কিনা, আজীবনকাল ব্রহ্মচারী, মুখের কথা মিছা হবেক নাই। শালা, লাব্বাক্!

আলোচালের ডাঙায়, ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় পথ হাঁটছিল পাগল শিকারি। চারপাশটা ভারি রহস্যময়! ডাঙাব মধ্যে ছড়ানো ছেটানো মউল, কুসুমের ডালে ডালে বাসা বেঁধেছে অন্ধকার। চাঁদের আলো অন্ধকারেব শরীরগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত বানায়, সেই গর্তগুলোতে ভরে দেয় পাতলা মাখনেব মতো জ্যোৎস্না। সিড়িঙ্গে ডালপালাগুলো নিঃশব্দে দোল খায়। নিশাচব প্রাণীব দল, যারা নিশুত রাতে খাদ্য সংগ্রহে বেরিয়েছে, নখে-দাঁতে হরেক বাজনা বাজাচ্ছে চার পাশে। চার পাশের গাছ-গাছালির আঁকাবাঁকা ডালে, শাখায় প্রশাখায়, মরা ঠুঁটের শরীরে জ্যোৎস্না পড়ে হরেক রূপ নেয়। কতই না লৌকিক-অলৌকিক মূর্তি চড়ে চড়ে বসে থাকে ডালে ডালে, শাখায়-শাখায়। লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করলেও, পাগলের চোখকে ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। ধরা পড়ে যায়।

আচমকা সিড়িঙ্গে কয়েৎবেলের গাছটার মাঝডালে সাধুটাকে দেখতে পায় পাগল শিকারি। ইতিমধ্যে হরেক থানে, হরেক সময় মুখোমুখি হয়েছে লোকটার। এই সাধুই যে তার জন্মের প্রাক্কালে হাজির হয়েছিল ওদের ঝোপড়িতে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই পাগল শিকারির। বাপের মুখ থেকে শুনতে শুনতে লোকটার সম্পর্কে এক ধরনের বিদ্বেষ

রি হয়ে গেছে পাগলের মনে। শালা, ঢ্যামনা সাধু, তুমার লগার তেজ কতখানি, সে আমার
ঝা শেষ। ক্ষ্যামতা নাই ত অমন চাবুক-চোদ্দ কথা কও ক্যানে হে? ডাঙার মধ্যে একা
কা আচমকা কয়েৎবেলের মাঝডালে সাধুটাকে দেখামাত্রই দুনিয়ার রোষ উথলে ওঠে
াগল শিকারির মনে। প্রাণ খুলে গাল পাড়তে থাকে সাধুকে।

আমার কি দোষ? মাঝডাল থেকে সাধু জবাব করে, আমার দিয়া নামটা ত ব্যাভারই
ইর্‌লি নাই। কথা ফইল্‌বেক কী কইর্যে? ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় কয়েৎবেলের ডালে দোল
খতে খেতে সাধু ব্যাপারটা বিতাং করে বোঝায় পাগলকে। কেবল নামকরণ কইর্‌লেই
ব্যেক? ব্যাভার না কইর্‌লে তার গুণ বারাবেক? ধর, তুয়াকে একটা মাদুলি দিল্যম। মাদুলিটা
লি কিন্তু গলায় পরলি নাই। কাজ দিব্যেক? ধর, কোবরাজ তুয়াকে ওষোধ দিল্যাক। তুই
খলি নাই। রোগ সাইর্‌বেক? আমার দিয়া নামটা ত নিজ শরীরে ধারণ কইর্‌লি নাই তুই।
কউই ত তুয়াকে সুধন্য বলে ডাকল্যাক নাই।

পাগল শিকারি জবাব দিতে পারে না। সব যুক্তিতর্কের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। হাঁটার গতিখানা
হসা বাড়িয়ে দেয় সে। তার মধ্যে তীব্র প্রদাহ শুরু হয়। সাধুব দেওয়া নামখানা শরীরে
াদুলির মতো ধারণ করতে পারলে, না জানি আজ কতকিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যেত
াব জীবনে। পাগল শিকারি তাব স্বাদ কোনদিনও পেল না।

২. অগ্নির মায়া-আরশি

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে দিনভর কলিজা ভরে দম নিতে থাকে নিশান বাউরি। ভাবটা
যন, পরের শ্বাসটি নিতে পারব কি না ঠিক-ঠিকানা তো নেই, এই শ্বাসেই যতখানি সম্ভব
বে নিই কলিজা। মজুত রাখি যতটা সম্ভব প্রাণবায়ু। ঐ অবস্থায় একদিন অগ্নিকে বিছানার
াশটিতে ডেকে নেয় সে। পাখি পড়াবার মতো পড়ায়।

ষোলআনার সমস্ত কথাবার্তা অগ্নির থেকে কিছুটা এবং গোরাচাঁদের মুখ থেকে বাকিটুকু
নেছে নিশান। গজেনের শেষ প্রস্তাবটিও শুনেছে। তখন কেউ জানত না, এখন
উরিপাড়ার অনেকেই পিঠের মধ্যেকার পুরটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। সিংহবাবুরা
জেনকে ঘর তৈরির ভিটে দিচ্ছে পদম পুকুরের পাড়ে। দিনকতক আগে উন্নত প্রথায় মাছ
ষ নিয়ে বলক্ আপিসের মাছ-আপিসার অনেক বক্তৃতা দিয়ে গেছে 'মিতালি সংঘ'র মাঠে।
সই থেকে প্রভঞ্জন খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। মাছ-আপিসার নাকি বলেছে, পদমপুকুরে
ক ঠিক মাছ চাষ করলে বছরে না হোক দশটি হাজার টাকা লাভ হবে। সেই থেকে দু'ঠ্যাঙে
চছে প্রভঞ্জন। দেখেশুনে হরবল্লভও রাজি হয়েছেন। বলক্ থেকে এ বাবদ যখন লোনও
চ্ছে, আর চাকরি-বাকরি কবে কীই বা পাবে প্রভঞ্জন, তার যখন কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই,
খন একটা কিছু করুক ছগরা। কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকুক। চুপচাপ বসে থাকলেই
া দিয়ে আঁকচিরা কেটে মেঝে নষ্ট করবেক মানুষ। কাজবাজ না থাকলেই দুনিয়ার বদ-
তলবে থাইক্‌বেক উ। করুক, একটা কিছু লিয়ে মেতে থাকুক। আয়-উপায় লিয়ে কথা
য়, দশ হাজারের বদলে দশ-গণ্ডা পয়সা এলেও ক্ষতি নেই। মাছ চাষ করে সংসারের
ল ফেরাবার কথা এখনও অবধি ভাবতে হয় না চুয়ামসিনার সিংহবাবুদের। তেমন পবিস্থিতি

এখনও আসেনি। কথাটা হল, প্রভঞ্জনটাকে কাজ কামের মধ্যে রাখা, আর অতবড় দীঘিটার হাতছাড়া হতে না দেওয়া। উদানীং ছগরা মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছে বিষ্টুপুর। সেখানে অরুন্ধতী থাকে উমা আর দেবিদাসকে নিয়ে। দু'চার দিন অন্তর চুয়ামসিনায় চলে আসে অরুন্ধতী। দিনে দিনে আসেন, দিনে দিনেই ফিরে যান, যদি না রাত্রিবাস করবার তেমন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছেন অরুন্ধতী। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, অভ্যেসে, আচরণে, শহর ঢুকে পড়ছে দ্রুত। একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে সবটুকু পরিসর।

ইদানীং খুব বিষ্টুপুর যাচ্ছে প্রভঞ্জন। আগে ফিরে আসত। এখন রাতের বেলায় থেকে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। সিনেমা-টিনেমা দেখছে, হোটেলে-ফোটেলে খানাপিনা কচ্ছে... কামেশ্বর হাজরার ব্যাটা পল্টু হাজরার সঙ্গে খুবই দোস্তি হয়েছে ওর। পল্টুর সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছে দিনরাত। পল্টুর ক্লাবে গিয়ে আড্ডা মারছে গভীর রাত অবধি। আরও কী কী করছে সব, হরবল্লভ জানেন না, তবে আন্দাজ করতে পারেন। অভিজ্ঞ চোখ দুটি তাঁর বুঝতে পারে ছেলের সাম্প্রতিক মতিগতি। কাজেই, একটা কাজের মধ্যে থাকতে চাইছে থাকুক। তাছাড়া পদমপুকুরটাও মজে যাচ্ছে দিন দিন। আগে ছিল দু'শরিকের। বছর দুই হল, কনকপ্রভার অংশটা কিনে নিয়েছেন হরবল্লভ। মাছ-চাষ হোক না হোক, পুকুরখানা তো এই ফাঁকে সংস্কার হয়ে যাবে।

প্রভঞ্জনই প্রস্তাব দিয়েছে, মাছচাষ করতে হলে পুকুর পাড়ে একটা বিশ্বাসী লোক বসানো দরকার। লচেৎ লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাব্যেক। আর শালকাঁকি বাউরিপাড়াটাতো চিরকালই ভেতরে ভেতরে সিংহগড়ের বৈরী। সেই নিশান বাউরির আমল থেকে। ইদানীং ফের সুকুমার আচাজ্জি পার্টি লিয়ে ঢুকে পড়েছে পাড়ায়। সে যে ভেতরে ভেতরে কত গভীর সুড়ঙ্গ কেটেছে, ভগবানকে মালুম। ঐ পাড়ায় কে যে আপন, কে যে পর, বোঝা মুশকিল। সখা বাউরিদের মতো জনাকয় রয়েছে বটে অনুগতজন, কিন্তু তারাও ভেতরে ভেতরে কতখানি অনুগত, কে জানে। কাজেই, মাছের চাষ যদি করাও যায়, একলা শালকাঁকির বাউরিপাড়াই রাতে রাতে সাবাড় করে দেবে তাবৎ মাছ। আর, অনুগত ভেবে ঐ পাড়ার যাকেই পাহারার দায়িত্বে রাখা হোক না কেন, সেই যে রাতের আঁধারে 'বিলাই'টি সাজবেক নাই, তার কোনও গেরেন্টি আছে? কাজেই, সবদিক ভেবেচিন্তে গজেনকেই বসানোর প্রস্তাব দিয়েছে প্রভঞ্জন। গজেন নম্র, ভদ্র, অনুগত ...। সবচেয়ে বড় কথা, সে পরদেশী। এদেশে তার নিজেরজন বলতে তেমন কেউই নেই যে তাকে নিয়ে দলবাজি করবে। নিজের শ্বশুর, দাদাশ্বশুর এমনকি বউটিও অবধি তার বৈরী। এমন মানুষের পক্ষে বেশি উড়ে বেড়ানো কঠিন। অনুগত তাকে থাকতেই হবে। হরবল্লভ মেনে নিয়েছেন প্রভঞ্জনের প্রস্তাব। গজেন ঘর বানাবার জমিন পাচ্ছে পদম পুকুরের পাড়ে। খড়-বাঁশ পাচ্ছে। নিশান বাউরিও সেটা জেনেছে।

গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থাকা অগ্নির পিঠে নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে নিশান বাউরি। জিভখানা অলবলিয়ে চরে বেড়ায় মুখের মধ্যে। ঘোলাটে চোখ দুটি কুঠুরিময় ঘুরে বেড়ায়। হাতের তালু দিয়ে সে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরিয়ে দেয় অগ্নির পিঠে। বিড়বিড়িয়ে বলে চলে

কতই না কথা। বলে, মেয়া মানুষ লতার তুল্য রে মেয়া, বেড় মেইর‍্যে মেইর‍্যে উঠবার লেইগে একখান গাছ উয়ার চাইই চাই। সুবৃক্ষ পেলে ভাল, লচেৎ কুবৃক্ষের গায়েই শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েই উয়াকে কাটাতে হয় সারাটা জীবন। গাছ ছাড়া সে বেঁচে থাকতেই পারবেক নাই। বলে, তুই গজেনের কথায় রাজি হইয়েঁ যা, দিদি।

অগ্নি গুম মেরে বসে থাকে। হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

নিশান বিড়বিড়িয়ে বলে চলে, আমি ত মড়াচীরের দিকে দু'ঠ্যাং বাড়াই রয়েছি। কবে যে কলিজার ধুকপুকানিটুকু থেমে যাব্যেক তার ঠিকঠিকানা নাই। পরীক্ষিতটা ত উড়া পাইখ। উয়ার উপর কুনো ভরসা নাই। গোরা ত দুধের বাচ্চা। তাও সে রইল্যাক বিদ্যাশে। আমি চোখ বুঁজলে তুয়াকে কে দেখবেক, বল্?

অগ্নি লা কাড়ে না। কিন্তু তার সারা মুখে অন্ধ জেদ জমাট বাঁধে।

—বিটি ছেইলা, জনম-লগন থিকেই দুখী। নিশান বাউরি গলার কফ-শ্লেষ্মার সঙ্গে ফেনা ফেনা আবেগ মিশিয়ে নেয়, স্বয়ং রামচন্দরের সাথ বিয়া হইলেও উয়াকে রাবণ হইর‍্যে লেয়। পাতালে সেঁধাবার আগে অবধি উয়াকে খেপে খেপে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, বনবাস সইতে লাগে।

অগ্নি দাদুর চোখে চোখ রাখে এতক্ষণে। বলে, উই মাতাল লম্‌ফটের সাথ ঘর কইর্‌তে বলছ তুমি?

—আরে, হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? নিশান বাউরি পাশ ফিরে শোয় অগ্নির দিকে, দোষে-গুণে মানুষ। এ কি পাঁচমুড়াব মাটির হাতি-ঘোড়া, যে, সবগুলি একোই মাপের হব্যেক? এ হইল্যাক মানুষ। হাতি-ঘোড়া কুমারে বানায়, আর মানুষকে বানায় ভগমান। উঁয়ার অশেষ লীলা। বুঝা দায়। নিশান বাউরি দম নেয়। মুখের লালায় ভিজিয়ে নেয় ঠোঁট দুটি। বলে, 'ভেইব্যে দ্যাখ্, আরও কতকত পাষণ্ডর সাথ ঘর কচ্ছে কত মেয়া। কচ্ছে তো? তো, তুই সারাটা জীবন সোয়ামী থাইক্‌তেও 'ভাতারছাড়ী' নাম বয়ে বেড়াবি? শেষের দিকে অনুনয়ে ভিজে আসে নিশান বাউরির গলা, না করিস নাই দিদি। আমি তুয়ার বড়। আমি বলছি, তুয়ার ভাল হবেক। একলাটি থাইক্‌লে তুয়াকে শিয়াল-শাগ্‌না ঠুকরাব্যেক। বলতে বলতে নিশান বাউরির গলাখানি ধরে আসে। অগ্নির পিঠে থেমে থাকে হাতখানি। চোখদুটি ভিজে আসে। জিভখানি অলবলিয়ে ঘুরে বেড়ায় মুখময়।

এর মধ্যে গজেন একদিন এসেছিল নিশানের বাড়িতে। অগ্নি ঘরে ছিল না। গোরাচাঁদ স্কুল বোর্ডিং-এ ফিরে গেছে। নিশান ওকে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছিল। হাজার হোক লাত-জামাই। কুটুম।

গজেন জানায়, সে এখন গরুর ব্যাপারী। হাটে হাটে যায় খদ্দেরদের নিয়ে। দেখেশুনে, দরদাম করে কিনে দেয় গরু। দু'পক্ষের থেকেই কমিশন খায়। গাঁয়ে-ঘরে কেউ অভাবের জ্বালায় গরুবাছুর বেচতে চাইলে, গজেন জলের দরে কিনে নেয়। সেই গরু নিয়ে চলে যায় কোতুলপুর কিংবা ঘোড়াধরার মতো বড় বড় পশুহাটে। বেশ কিছুটা লাভ রেখে বেচে দিয়ে আসে।

গজেন বলে, ভরত জেঠা একটা গরু বিকবেক। দেইখ্‌তে আইছিল্যাম। ভাবল্যাম, দেইখ্যে যাই বুড়াটা কেমন বা আছে! বুড়া মাইন্‌ষের কথা ত আর ভাবে নাই কেউ এ দুনিয়ায়।

সে কথায় ছলছল হয়ে ওঠে নিশানের চোখদুটি। ঘসটে ঘসটে উঠে গিয়ে গজেনকে ভেলিগুড় দিয়ে জল দেয়। ওর চিবুক ধরে মিনতি করে, লাতিনটা আমার বড় অবুঝ, উয়াকে বুঁঝাইসুঝাই ফের ঘর বাঁধ্, ভাই। তুই সুখী হবি।

গজেন সারা মুখে একধরনের বঞ্চিত, অনুতপ্ত ভাব ফুটিয়ে বলে, অগ্নি যদি আমার সাথ ঘর কইর্‌তে রাজি হয় ত উয়াকে মাথায় তুইল্যে রাইখ্‌ব আমি। উয়াকে বইল্লো, সে গজেন বাউরি আর নাই। রত্নাকর থিক্যে বাল্‌মিকি হয়্যেঁছে উ।

নিশান বাউরি সেই দিনই মনস্থ করেছিল, অগ্নিকে গজেনের সঙ্গে থিতু করেই তবে চোখ মুদবে সে। তার আগে নয়।

গজেন যখন নিশান বাউরিকে জয় করবার সাধনায় রত, ঠিক সেই মুহূর্তে শাকপাতা তুলতে এসে হরিণমুড়ির পাড়ে বসে কাঠ হয়ে গিয়েছে অগ্নি। তার জীবনের যে-কোনও সঙ্কটে এই নদীটিই ওর একান্ত আশ্রয়। গ্রীষ্মে হরিণমুড়িতে জল প্রায় থাকেই না। কেবল নদী যেখানে খুব কনুইমোচড় নিয়েছে, সেখানেই বাঁকের মুখে কোমরসমান তুত রঙের জল। নদীর সেই দিকটা খুব খাড়াই হওয়ায় পাড়টিতে বসলেই পায়ের তলায় একটি তুঁতরঙের আরশি। অগ্নি ফুরসত পেলেই ঐ আরশির সামনে নিজের মুখখানি মেলে ধরে। সময় বয়ে যায় তিবতিরিয়ে। অগ্নি মুগ্ধ, মগ্ন হয়ে নদীর আরশিতে নিজের মুখখানি দেখতে থাকে অপলক। আবশিতে চারপাশের কতকিছুর ছায়া। ছায়া দোলে, ছায়া ভাসে, ছায়া কাঁপে ...। সারা সকাল, দুপুর, জলের কিনারে ঠায় বসে বসে অগ্নি দেখতে থাকে সে সব। দেখতে দেখতে সে ছায়ার জগতে ঢুকে পড়ে অজান্তে। তখন সে গজেনের কথা ভাবে। গোরাচাঁদের কথা ভাবে। তিলকের কথাও। নিজের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, সবকিছু দৃশ্যমান হয ঐ মায়া-আরশিতে।

ইদানীং তুঁতরঙের মায়া-আরশিতে দুনিয়া দেখতে দেখতে অগ্নির মনে হয়, জলের মধ্যে, ঐ আরশির ভেতর বাগে, আরও একজন অগ্নির বসবাস। সে অতখানি দুঃখী অগ্নি নয়। তার পরনে লাল চোলি, মাথায় টিকলি, পায়ে মল, ঠোঁটের কোণে সুখী সুখী দেমাকী হাসি। আর, দু'হাতে, কী আশ্চর্য, দু'খানি করে ঝলমল কাচের চুড়ি। তার শরীরখানা সোনালি, দু'ধারে রক্তের মতো লাল রঙের সরু বর্ডার।

বহুকাল যাবৎ অগ্নির বুকখানা এক বগ্চরা বিল। জলেব মধ্যে, মায়া-আরশিতে আর এক অগ্নিকে দেখতে দেখতে কখনো বা ঐ বিলের মধ্যে, এখানে ওখানে, মুখ দেখায় দু'চারটে লাল-শালুকের কুঁড়ি, কখনো বা জলের ভেতরের সতীন তুল্য সেই সুয়োরানী অগ্নি তার ব্রহ্মতালুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন প্রবল ঈর্ষায় অগ্নির সারা শরীর জ্বলন্ত চিতার কাঠ। আশে পাশে পড়ে থাকা মাকড়া পাথরের নুড়ির থেকে একখানা তুলে নিয়ে প্রবল আক্রোশে ছুঁড়ে মারে হরিণমুড়ির জলে, স্বরচিত মায়া-আরশিখানি প্রতিদিন নির্মম রোষে ভেঙে দেয় এইভাবে।

২৩. খেলার জন্ম বিলাতে

সুকুমার, তিলক, বাঁশি বাউরি এবং হঠাৎ মুর্মু এখন নেই। হাজতে বসে লপ্‌সি খাচ্ছে ওরা। তাই নিয়ে মস্করা চলছিল হরবল্লভের বৈঠকখানায়। এবারে যে নৈতন দারোগাটি আঁইছে, শালা ভারি চৌকস। ওষোধটা দেয় পয়লা পহরে। হরবল্লভ প্রভঞ্জনদের বোঝান, এই হইল্যাক মোক্ষুম সময়। উয়াদ্যার চ্যালা-চামুণ্ডাগুলানকে ধর্ এবার।

—ঠিক। শালাদ্যার উচিত শিক্ষা দিবা দরকার। হাড়-গোড় ভাইঙে দে এক-একটার। দেখি, শালাদ্যার কুন বাপ আইসে বাঁচায়। পাশ থেকে বলে ওঠে ঝাড়েশ্বর নায়ক।

প্রতাপলালের শেষ বেলাকার মুখখানি মনে পড়ে হরবল্লভের, তাঁর শেষ কথাগুলো মগজে ভাসে। মন্ত্র বদলাও, মানুষ বশ কইর্‌বার মন্ত্র বদলাও। লচেৎ সব যাবেক। ঝাড়েশ্বর নায়কেব দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকান হরবল্লভ। বলেন, খালি কথায় কথায় হাড়-গোড় ভাঙবার কথাটা মনে হয় ক্যানে তুমাদ্যার? অন্য উপায়ে বশ হয় না মানুষ? একটুখানি থেমে বলেন, প্রেমে বশ কইর্‌তে হবেক উয়াদ্যারকে।

ঝাড়েশ্বর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেও রতিকান্ত ঠিক জানে, তাকে এখন কী বলতে হবে। তালে তাল দেবার কৌশলখানি সুন্দর আয়ত্ত করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে, হাঁ--, জানোয়ারও প্রেমে বশ হয়, আর এ তো মানুষ। যদিও সে জানে, এ হল বড়কর্তার কোনও নতুন কৌশলের মধুমাখানো নাম। প্রেম।

হরবল্লভ সেই সন্ধ্যায় বসে খুব ধৈর্য সহকারে প্রভঞ্জনদের বোঝালেন ব্যাপারখানা। দিনকালের ভাবগতিক বদলে যাচ্ছে। জমিদারি বিলোপ আইন পাশ হয়ে গিয়েছে, যদিও কার্যকরী হতে এখনো ঢের দেরি। এখন শুধু তাল ঠোকা চলছে। আসল কুস্তিব আগে বহুৎক্ষণ ধরে নিজের উরুতে চাপড় মেরে মেরে যেমন তাল ঠোকে কুস্তিগীবরা। ঊনপঞ্চাশের বাঁধগাবার লড়াইয়ের পর কম্যুনিস্টরা বেশ কিছুদিনের জন্য দমে গিয়েছিল। ওদের বাছাবাছা নেতাদের অনেকেই চলে গিয়েছিল জেলে। নিজেদের মধ্যেও কোন্দল বেঁধেছিল ভেতবে ভেতরে, তেভাগার হটকারিতা আর গোয়ার্তুমির জন্য। আবার যেন শালারা বাড়ছে। রক্ত বীজের মতো শনৈ শনৈ বেড়ে যাচ্ছে গোপনে। মাঝে মাঝে টেব পাওয়া যায় সেটা। এই তো কিছুদিন আগে গোরাবাড়িতে কংসাবতীর ওপর ড্যাম বানানো নিয়ে হয়ে গেল বিশাল জলডুবি আন্দোলন। হাজারে হাজারে লোক, কোথায় ছিল যে ওদের অত সমর্থক, পুলিশের জীপের সুমুখে, বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, সরকারি বুলডোজারের সুমুখে শুয়ে পড়ে। গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে দশ-বিশ মাইল দূরের কোনও ঘোর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেও তিন দিনের মধ্যেই পায়ে হেঁটে ফিরে আসে অকুস্থলে, এমনই লগার তেজ শালাদের। অম্বিকানগরের যুবরাজ, উঁয়াদ্যার গড় থেকে সামান্য তফাতে তো গোরাবাড়ি, বাঁকুড়া কালিক্টারিতে দেখা হতে বলেছিলেন একদিন বিতাং করে। বাপরে, শালাদের জেদ ভারি।

অনেকক্ষণ ধরে, প্রভঞ্জনদের সুমুখে, যুগের বদলে যাওয়ার একখানা মোটামুটি ছবি আঁকতে সক্ষম হন হরবল্লভ। এবং লক্ষ করেন, ছোকরাগুলোর ললাটের বলিরেখায় দুর্ভাবনার রেশ। বলেন, এই এলাকাটা এমনিতেই বড় বিপজ্জনক। চিরকালই যত খতরনাক মানুষের

ভিড় এখানেই। ও বাড়ির কোকিল, অর্থাৎ কিনা প্রিয়ব্রত মহামাত্র। তারপর ধর পরীক্ষিত বাউরি। আর মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যা, ওদের দলের জেলার নেতা, সেও তো এই এলাকার মানুষ। অনাথবন্ধু, প্রথম জীবনে তো সন্ত্রাসবাদীই ছিল। বোম-টোম বানাত। পরে না হয়, কপালে ফোঁটা কেটে, বোষ্টম হয়ে, 'বিড়াল বলে মাছ খাবো নাই, আঁশ ছুঁবো নাই, কাশী যাব' ভাব। এরা সবাই,—সবাই তো এই এলাকারই লোক। এরা সবাই তো এক একটি চিজ। এ ব্যাপারে কে কম, আর কে বেশি! কারে ছেইড়ে কারে হেরি। এ বলে, আমাকে ভাল্, উ বলে, আমাকে। উয়ারা প্রায় সবাই ছিল তেভাগায়, জলডুবিতে। কোকিল অবশ্য জলডুবিতে গিয়ে ফুইট্যে গেল্যাক। কিন্তু বাকিরা ত আছে। উয়াদের সঙ্গে ইদানিং পোঁ ধরেছে সুকুমার আচার্য, গোবিন মিস্ত্রি, বাঁশি বাউরি, তিলক বাউরি, হঠাৎ মুর্মুর মতো কিছু অপোগণ্ড। শুনতে পাই রোজ রাতে মিটিং বসে উয়াদ্যার, বত্রিশভাগীর জঙ্গলে, কানশিকড়ার শ্মশানে ...। কী ওষুধ যে ঘুঁটছে, কত মানুষকে যে ভেতরে ভেতরে পচিয়ে দিল এতদিনে, ভগবানকে মালুম। আর, এই অনাথ রায়, খুব সাবধান, বাইরে মনে হয় কংগ্রেসী, আসলে শালা অন্য ডালের পাইখ। বোমা-পিস্তল দিয়ে উয়ার রাজনীতি শুরু। সুকুমার আচার্যর সঙ্গে যে শালার তলে তলে যোগাযোগ আছে, সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই আমার। সব মিলিয়ে দিনকাল খুব ঘন ঘন রঙ বদলাচ্ছে। তোমাকে সেই বদলের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে হবেক। সেটা কীভাবে সম্ভব? না, বুদ্ধি দিয়ে। কেন না, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নিবুর্দ্ধিস্য কুতো বলম। বলতে বলতে হরবল্লভের সারা মুখে ফুটে ওঠে এক ধরনের দার্শনিক প্রশান্তি। বলেন, অতিকায় জন্তুরা পৃথিবী থেকে লোপাট হয়্যে গেল্যাক, অথচ মানুষ টিকে রইল্যাক। কেন? না, বুদ্ধির জোরে। মানিয়ে নেবার ক্ষমতায়। হুটহাট বল প্রয়োগের দিন চলে যাচ্ছে বাপ সকল। এখন বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুর মোকাবিলা করতে হবেক। ঠাণ্ডা মাথায় কাম সারতে হবেক। সর্বত্র সুঁচটি হয়ে ঢুকে ফালটি হয়ে বেরিয়ে যেতে হবেক। সার্থক শিক্ষাদান অন্তে প্রকৃত শিক্ষকের সারামুখ যেমন জ্যোতির্ময় প্রশান্তিতে ভরে যায়, ঠিক তেমনই, সারা মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে বসে থাকেন হরবল্লভ। তো, সেই বুদ্ধিখানি কী হবে এক্ষেত্রে? হরবল্লভ বলেন, অসির বদলে বাঁশি। মোহনবাঁশি।

সে সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে মোহনবাঁশির গুণাগুণ, ব্যবহারবিধি বর্ণনা করে অবশেষে থামেন হরবল্লভ এবং আসন ছাড়বার আগে শেষ মন্তব্যখানি ছুঁড়ে দেন। গলায় অপরিসীম আত্মবিশ্বাস জমিয়ে বলেন, যদি বাঁশিতে সুরটা ঠিকঠাক তুইল্‌তে পারিস তুয়ারা, তো সুকুমার আচায্যি জেল থিক্যে ফিরে এসে দেখবেক, উয়ার সাধের বাগিচা শুকিয়ে শ্মশান।

কাজেই, পরের দিন বিকেলেই ফের চুয়ামসিনার ডিহির সামনে 'মিতালি সংঘ'র মেম্বরদের তলব হল। সব্বাইকে নয়। বাউরি-বাগদিদের সব পাড়া থেকে দু'একজনকে নিয়ে মোট জনা বিশেককে।

ভয়ে ভয়ে জড়ো হয় সবাই। খরগোশের মত অচেনা আশঙ্কায় দুরু দুরু করে বুক। ভয়ার্ত চোখের মণি স্থির হয়ে থাকে বাবুদের মুখের ওপর। মন বলছে, আবার কোনও ভারি কাজ চড়েছে বাবুদের ঘাড়ে। 'ক্লাব ঘরের মেম্বর'দের দিয়ে সেটা বিনে পয়সায় করিয়ে নেবার

ধান্দা। কী কাজ, কত দিনের, কতখানি পরিশ্রমের, এসব নিয়েই দুশ্চিন্তা। আসলে, এই 'ক্লাপঘর'টিকে নিয়ে বাউরি-বাগদিদের মনে আতঙ্কের শেষ নেই। বড়ঘরের গুটিকয় ছগ্‌রা দাপিয়ে বেড়ান সেখানে। তাসপাশা পেটেন। তিনদিকে কাপড় টাঙিয়ে পালাগান করেন। আর, গাঁয়ে ঘরে চুরি হলেই বাউরি-বাগদি পাড়ার কিছু মানুষকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়ে 'ক্লাপঘরের' কড়িকাঠে ঝোলান। এই ঝোলানোর ইঙ্গিতটা বাবুরা দিয়েছিলেন, যখন বাউরি-বাগদি-শিকারি ঘরের ছোকরারা মাটি কেটে ভরাট করছে হীরাবাড়ির খুলিয়া, কাদা মাখিয়ে দেয়াল দিচ্ছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে কড়ি-বরগা, মুর্ধুন বানাচ্ছে, তখনই কথার পিঠে কথা বলবার মতো করে, মস্করার ছলে এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন যাতে করে 'ক্লাপ ঘরের' ঐ নবাগত 'মেম্বর'দের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি যে ক্লাপঘর নামক এই আপাত-সুন্দর সোনার হারটি ওদের গলার ফাঁস হতে চলেছে।

সরকারে খাস হয়ে যাওয়া একটা ডাঙা থেকে তালগাছ কেটেছিল ওরা। ট্যারা বাউরি তালকাঠ ফাঁড়ায় ওস্তাদ। যদিও পাকা সিঁদেল চোর হিসাবে সারা তল্লাট জুড়ে তার দুর্নাম, তবুও তাল কাঠ ফাঁড়ানোর কাজে বহাল করবার জন্যই ট্যারাকে দেওয়া হয়েছিল 'ক্লাপ'-এর অস্থায়ী মেম্বরশীপ। আর, যখন তাল কাঠ ফাঁড়াচ্ছিল ট্যারা বাউরি, প্রভঞ্জন, কাজ-তদারকির ফাঁকে, ইলচি করে বলেছিল, টুকচান মোটা কর‍্যে ফাঁড়াবি রে ট্যারা। টাঙাবার টাইমে য্যান্ ভেইঙে না পড়িস মাটিতে। খিকখিক করে হেসেছিল ওরা। আর যেহেতু হাসির সঙ্গে হাসি মেলাতে হবে, কেন কি, ইয়ারই নাম সংঘবদ্ধতা, ট্যারার সঙ্গে কাজ করতে থাকা অন্য বাউরি-বাগদিরাও দাঁত গিজুড়ে হেসেছিল। বেশ মোটা দেখে কড়িকাঠ বানিয়েছিল ট্যারা বাউরি এবং সেটা যে কত শক্তপোক্ত তা কিছুদিন বাদে সে নিজেই হাতবাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে বুঝিয়ে দিয়েছে। না, এ ক্লাপঘরের আর যা থাক-না-থাক, কড়িকাঠগুলান বেজায় মজবুত বটে।

—এই ক্লাপঘরখানা কে গইড়েছে? উপস্থিত জমায়েতের সামনে প্রভঞ্জন আচমকা খুব নাটকীয় গলায় উত্থাপন করে প্রশ্নটা।

কিংকর বাগদিরা ভুলভুল করে তাকায়, 'আপনারা হুজুর।'

—শুধু 'আমরা? প্রভঞ্জন বুঝি ব্যথা পায়, তুয়ারা করিস নাই?

কিংকর বাউরিরা থম মেরে থাকে। এমন কথার জবাবে হ্যাঁ বলাটা উচিত হবে কিনা মহাধন্ধে পড়ে যায় ওরা।

প্রভঞ্জনই জবাবটা দেয়। খুলিয়া বুজানো, দেয়াল তুলা, কাঠ ফাঁড়ানো ...., শুধু আমাদ্যার কী সাধ্য ছিল? তুয়ারা লাগা-পাড়া না কইর্‌লে ...। স্বরচিত বিপদজালখানি এভাবেই কেটে দেয় প্রভঞ্জন। এবং কথাগুলো শোনামাত্রই বাগরি-বাগদিদের চোখগুলো অজান্তে মার্বেলের পারা গোলাকার হয়ে ওঠে। বাবুরা করেছেন কাজটা? বাউরি-বাগদিরা লাগা-পাড়া কর‍্যেছে? লাগা-পাড়া কারে কয়? হায় হরি। কলিব কি তেবে শেষ প্রহর। বাস্তবিক, ওরাই তো পুরো কাজটাই করল। বাবুরা তো কেবল ময়ূরকণ্ঠী লুঙ্গি পরে, লক্কা পায়রার মতন বকম বকম করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অথবা কেঁদ গাছের তলায় বসে বসে কুলি-খাটানোর ভঙ্গিতে ধমক

ধামক দিয়েছেন। ইখ্যেনে ফ্যাল, উখ্যেনে ঢাল্। লচেৎ বাবুদের সাধ্য কি, এক পেইত্যা মাটি ঐ খুলিয়া অবধি লিয়ে যায়! জঙ্গলেব ইয়া বড় বড় শাল গাছগুলোকে কুড়াটের ঘায়ে উল্টে দেয়! প্রাচীন তালবৃক্ষগুলিকে ফাঁড়ে! বাবুদের মুখে যত ক্ষমতা, গায়ে-গত্তে অত নাই হে। কিন্তু এসব কথা মুখ ফুটে বলা চলে না। অত সাহস নেই ওদের। কাজেই, কিংকর বাউরিরা চুপ মেরে বসে থেকে জবাব দেবার দায় এড়ায়।

প্রভঞ্জন গলায় আক্ষেপ ফুটিয়ে বলে, ক্লাপঘরটা শেষ হবার পর থিক্যেই তুয়ারা আব ইদ্দিগ্ মাড়াস না। ইট্যা কি ভালো?

বাবুদের এমন মাখমের মতো মোলায়েম গলা শুনে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় কিংকর বাউরির দল।

কিংকর বলে, আমাদ্যার কত কাজ-কাম আইজ্ঞা। সময় কুথা?

—উয়ার মধ্যেই টাইম কত্তে হব্যেক। কামও হব্যেক, আমোদ-ফুর্তিও হব্যেক।

আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলে প্রভঞ্জন। শেষেমেষ কিংকরদের কথা দিতেই হয়, বিকেলের দিকে যেভাবেই হোক সময় করে 'ক্লাপে' আসবে ফুটবল খেলতে। আর সন্ধ্যা বেলায় নাইট ইস্কুলে।

— তোদের জন্য সিলেট আছে, বই আছে, লণ্ঠন আছে। প্রভঞ্জন বাচ্চা ছেলেকে নাড়ু দেখানোর ভঙ্গিতে বলে, বাবা কত কষ্টে সরকার থিক্যে আনা করিযেছে সব। শেষমেষ এক চোখ ছোট করে প্রভঞ্জন আসল কথাটি উচ্চারণ করে, পড়তে আসলে রোজ পাঁচটা করে বিড়িও দিবেক সরকার। জনা পিছু পাঁচটা!

মাঘ-ফাগুনে বাউরি-বাগদিদের অতখানি ভোখ খিঁচতে হয় না। তখন সবার ঘরেই দু'চাব দানা থাকে। 'এখ্যান' দিনে সম্বৎসরের মাইন্দারি বাবদ কিছু কিছু দাদন পায় অনেকেই। এখানে ওখানে মেলা-পার্বন চলে। বিকেল নাগাদ বত্রিশভাগীর জঙ্গলের ধার ঘেঁসে বসে যায় মোরগ লড়াইয়ের আসর। কাজেই, বিকেল নাগাদ কিংকর বাউরিরা পায়েপায়ে এসে হাজির হয় 'ক্লাপঘরে'র সুমুখে। কোমরের নেংটি আঁটোসাটো করে বেঁধে নিয়ে ফুটবল খেলবার জন্য প্রস্তুত হয়।

কোলকাতা গিয়েছিল প্রভঞ্জন। কিনে এনেছে এক জোড়া বল খেলবার বুট। লোহার মতো শক্ত সে জুতা। তলায় দশ বারোটা ডুমোডুমো লোহার পেরেক বসানো। এ হল ফুটবল খেলবার বুট। এ তল্লাটে প্রথম নিয়ে এল প্রভঞ্জন সিংহবাবু। দু'দলের বাকি খেলোয়াড়রা সবাই খালি পায়ে খেলে। কেবল প্রভঞ্জনই পায়ে হাঁটু অবধি মোজা পরে, লোহার পেরেক বসানো জুতো পরে হুঁকুরে বেড়ায় মাঠময়।

একটা চামড়ার বলকে লাথাতে লাথাতে ছুটতে থাকা। এবং ছুটতে ছুটতে বলটাকে তে-কাঠির মধ্যে সেঁধিয়ে দেওয়া। প্রথম প্রথম খুব মজা পায় ওরা। ক্রমশ এই খেলার আসল যন্ত্রণার দিকটা একটু একটু করে বুঝে ফেলে।

বলে লাথি মারতে গিয়ে, প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে গিয়ে, যতবার পা ঠেকছে বাবুদের পায়ে, ততবারই তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করতে হচ্ছে বাউরি-বাগদিদের। না, এমনটা

করতে বলে দেয়নি কেউ। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, উচ্চবর্ণের মানুষের অঙ্গে চরণ ঠেকলে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। সেই সংস্কার যাবে কোথায়! বিশেষ করে প্রভঞ্জন সিংহবাবু এবং ভৈরব গোস্বামীদের মতো ব্রাহ্মণ সন্তান হলে তো কথাই নেই। একে ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, তার ওপর ধনাঢ্য, — উয়াঁদ্যার শরীলে পা ছুঁয়ালে পা খইস্যে যাব্যেক নাই? ফলে, সারা মাঠময় খেলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে কারো-না-কারো পা ঠেকছে কোন-না কোনও উচ্চবর্ণের শরীরে। এবং তৎক্ষণাৎ খেলা থামিয়ে সে প্রণাম সেরে নিচ্ছে ভূমিষ্ঠ হয়ে। সারা মাঠময় সারাক্ষণ প্রণাম করবার ধুম পড়ে যায় রোজ। বল নিয়ে এগিয়ে আসা প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে হলে একেবারে মুখোমুখি হয়ে বলের গায়ে চার্জ কবতে হয়। কিংকর বাউরিরা চার্জ করতে গিয়েও সঙ্কোচ বশে শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিচ্ছে পা। বল-সহ বাবুদের পায়ে লাথি মারা—, ভাবতে গেলেই সিঁটিয়ে যায় ভয়ে। ফলে বাবুদের পায়ের সর্বক্ষণ বল। অপ্রতিরোধ্য তারা। খালি এগোয়, খালি এগোয়, কেউই বাধা দেয় না, খেলাটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

এক সময় ক্ষেপে ওঠে প্রভঞ্জনেরা। অমন কইর্‌লে খেলা জমে? দৌড়াও, বাধা দাও, চার্জ কর, কাটাও, পাশ দাও, তবে না খেলা। খেলার জন্ম বিলাতে। এত সাহসেও পুরোপুরি সাড় ফিরে পায় না পা'গুলো। কত শতাব্দী ধরে অসাড়। অত সহজে সাড় ফেরে না?

তাও একদিন সাগর বাগদি অসীম সাহসে বুক বেঁধে মনের যাবতীয় সংস্কারকে ঘুম পাড়িয়ে চার্জ করে বসে ভৈরব গোস্বামীকে। ফল হয় এই, বলখানা ছিটকে পড়ে একদিকে, ভৈরব সটান অন্যদিকে। দু'হাতে ডান পা চেপে ধরে গোঙাতে থাকে সে। বলে, ইট্যা কিন্তু ইচ্ছাকৃত মারলু তুই। বামুনের ছেইলাকে লাথ মাইর্‌বার সুযোগটা কাজে লাগালু।

মরমে মরে যায় সাগর বাগদি। ঠাকুর-দ্যাবতার দিব্যি কেড়ে বোঝাতে চায়, তেমন কিছু ওর মনে স্বপ্নেও ছিল না। খুব বিরস বদনে উঠে দাঁড়ায় ভৈরব গোস্বামী। রুষ্ট চোখে তাকায় সাগরের পানে। খেলা আবার শুরু হয়। সাগর কিন্তু আর কিছুতেই সহজ হতে পারে না।

পরের দিনই খুব একখানা উত্তেজনার মুহূর্তে কিংকর বাউরির সঙ্গে প্রভঞ্জনের লাগে মুখোমুখি ধাক্কা। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল প্রভঞ্জন। খানিক বাদে চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিংকরের দিকে তেড়ে যায় অপরিসীম আক্রোশে। গলা ফাটিয়ে বলে, শালা, সাবধানে খেলতে লারিস? জুতিয়ে চামড়া খুইলে লুবো।

প্রভঞ্জনের রূদ্রমূর্তি দেখে ততক্ষণে কিংকর বাউরির সারা শরীর জুড়ে শুরু হয়েছে বাঁশপাতার কাঁপন। কিংকর তো বটেই, এরপর যেটুকু বা খুলেছিল কুঁড়িগুলি, গুটিয়ে গেল পুনরায়। পায়ে পা লাগানো চলবে না, তবুও খেলতে হবে ফুটবল। এ এক নিদারুণ বিড়ম্বনা। এক অদ্ভুত সাপের-ছুঁচো-গেলা অবস্থা ছোকরাগুলোর।

নেপাল শিকারির নাকখানা ফুলে কোলা ব্যাঙের পারা ঢোল। ঠোঁটজোড়া টাটিয়ে রক্ত চোষা জোঁকের পারা পুরুষ্টু। কথা বলতে পারছিল না বেচারা। চেনাজানা মানুষজনের সঙ্গে দেখা হলে ভারি করুণভাবে হাসে। বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে তার নাক-মুখ ফেটে যাবার করুণ উপাখ্যান। শুনতে শুনতে থ' হয়ে যায় সবাই। বল নিয়ে ছুটে আসছিল প্রভঞ্জন।

নেপাল শিকারি খেলছিল ব্যাকে। কী করবে, না করবে, ভাবতে ভাবতে শেষ মুহূর্তে পা বাড়িয়ে বাধা দিতে গিয়েই পা ঠেকল প্রভঞ্জনের ডান চরণে। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করবার উদ্দেশ্যে নুয়ে পড়েছিল বেচারা। প্রভঞ্জন ততক্ষণে ফাঁকা গোল পেয়ে শট নিতে উদ্যত। ধাঁই করে কিকখানা লাগল নেপালের নাকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গলগলিয়ে রক্ত। দু'চোখে অন্ধকার দেখে সেইখানেই লুটিয়ে পড়েছিল নেপাল শিকারি। কিংকররা পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসে পাড়ায়। গাছ-গাছড়ার পাতা বেটে প্রলেপ লাগায়। গতকাল রাতভর কঁকিয়েছে বেচারা। গা পুড়ে যাচ্ছিল জ্বরে। সকালে জ্বরটা সামান্য কম। তবে নাকের ফোলাটা কমেনি। টাটানিটা বেড়েছে। একটা নিদারুণ প্রদাহ চলছে ভেতরে।

নেপাল শিকারির অবস্থা দেখে মনে মনে খুব মজা পেয়েছে প্রভঞ্জন। হুঁকুরে উঠে বলে, শুধু বলে লাথ মাইর্‌লেই ফুটবল খেলা হয় না হে। খেলার জন্ম বিলাতে।

২৪. বুদ্ধদেবের মুখোমুখি বামাচরণ

সেটা ছিল এক বিশাল চমক সৃষ্টিকারী বিকেল।

মল্লিকা ব্লক অফিসে এক ফাঁকে বলেছিল, দীপাদি আজ বিকেলে তোমায় ডেকেছে। খুব জরুরি কথা আছে।

মল্লিকার সঙ্গে বিকেলে দীপমালার বাসায় গিয়ে প্রথম চমকটি খায় বুদ্ধদেব। ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে বামাচরণ। দীপমালার সঙ্গে খুব নিচুগলায় কথাবর্তা চলছে। বামাচরণের মতো একটি আজব মানুষকে দীপমালার ঘরে দেখবে এমনটা একেবারেই আশা করেনি বুদ্ধদেব। দীপমালা বুদ্ধদেবের কপালের বলিরেখায় প্রকট হয়ে ওঠা বিস্ময়টাকে চিনতে পারেন বুঝি।

বলেন, খুব অবাক হয়ে গেছ মনে হচ্ছে?

বুদ্ধদেব জবাব দেয় না।

দীপমালার চোখে কপট ভ্রূকুটি, একে চেন তো? নাকি—।

--চিনি বৈকি। বুদ্ধদেব অপ্রস্তুত হাসে, তবে এখানে ঠিক আশা করিনি।

—কেন? দীপমালার ভ্রূজোড়া পুনরায় কুঞ্চিত হয়।

বুদ্ধদেব মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। এ প্রশ্নের জবাব কেমন করে দেবে সে, সেটাই বুঝে উঠতে পারে না ঠিকঠিক। বামাচরণকে দেখে, তার বেতো ঘোড়ার মতো কোমরে ঠেকনা দিয়ে হাঁটা, তার ভারসাম্যহীন আচার-আচরণ এবং তার সম্পর্কে ব্লক অফিসের লোকজনের মুখে যা সব শুনেছে এতকাল, তাতে করে একটা কিম্ভূত কিমাকার ছবি গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের মনে। সেই তাকেই দীপমালার মতো একজন মার্জিত, দায়িত্বশীলা মহিলার ঘরে দেখা যাবে, এ যেন কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তেমন কথা তো আর বামাচরণের সামনে উচ্চারণ করা চলে না।

বুদ্ধদেব কোন গতিকে বলে, না, মানে, কোনদিন দেখিনি তো এখানে, তাই।

দীপমালা আর এ নিয়ে কথা বাড়ান না।

বলেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনার জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। বোসো।

বুদ্ধদেব এবং মল্লিকা বসে।

দীপমালা বলেন, হরিণমুড়ি কাটানোর স্কীমটা কি শেষ হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। অনেকদিন।

—কতখানি কাটা হল?

—মাইল দুয়েক।

দীপমালা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান বামাচরণের দিকে। বলেন, এবার তুমিই বল বামা।

বামাচরণ বার দুই ঢোঁক গেলে। চারপাশটা সাবধানী দৃষ্টি মেলে দেখে নেয়। তারপর বলে, মোট পাঁচটা সেকশনে পাঁচ মাইল কাটবার জন্য স্যাংশন হয়েছে আড়াই লাখ টাকা।

বুদ্ধদেব ভীষণ চমকে ওঠে। তা কী করে হয়। দু'মাইল কাটানোর পর ওরা ঘোষণা করে দিয়েছে স্কীমের কাজ শেষ।

—সেই জন্যই তো তোমায় ডাকা। দীপমালা বলেন, ওরা একলাখ টাকা খরচ করেছে। বাকি দেড়লাখ মেরে দিয়েছে।

বিস্ময়ের ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি বুদ্ধদেবের। বিড়বিড় করে বলে, মেরে দিয়েছে? কেমন করে মেরে দিল?

বামাচরণ বলে, ওরা অধর ঝারমুনিয়া আর করালী সোমের সাহায্যে বাকি দেড় লাখের মাস্টার-রোল বানিয়ে ফেলেছে। অধরের বাড়িতে পর পর দু'রাত কাটিয়েছে করালী সোম। সারা রাত জেগে গুটিকয় বশংবদ মানুষের আঙুলের টিপছাপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে। ওদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে দু'শো করে টাকা।

যেন রূপকথার গল্প শুনছিল বুদ্ধদেব। আচমকা খর দৃষ্টি মেলে ধরে বামাচরণের দিকে, তুমি এত খবর পেলে কোত্থেকে।

বামাচরণ খুব রহস্যময় হাসে। বলে, কী করে জাইন্ল্যাম, সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ লয়। কথা হল, খবরটা সত্যি। ষোলআনা সত্যি।

বামাচরণকে চিরকালই খুব রহস্যময় লাগে বুদ্ধদেবের। বেতো রোগীর মতো হাঁটা, ন্যালা-খ্যাপার মতো চাউনি, জড় ভরতের মতো আচার-আচরণ সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে ওর আপাত নির্বোধ মুখমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে কিছু বিচিত্র অভিব্যক্তির বসবাস, যা কালেভদ্রে নিজের অজান্তে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিছু দুর্জ্ঞেয় আচার-আচরণ যা ও সর্বদাই লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, তাদের এক-আধটা ক্বচিৎ-কদাচিৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে বলেই লোকটাকে খুব জটিল আর রহস্যময় লাগে। যেদিন ওকে সমিতির আপিসঘরের পেছন থেকে বেরোতে দেখেছিল বুদ্ধদেব, ওর হাঁটার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, গভীর রাতে গেরস্তের হাঁস-কুঠুরিতে ঢুকেছিল শিকারি শেয়াল, হাঁসটি মুখে ঝুলিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছে।

বুদ্ধদেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বামাচরণকে। ওর ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে দৃষ্টিখানি বিঁধিয়ে দিয়ে খুঁজতে চাইছিল সেই রহস্যময়তাকে। বামাচরণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। সে যথারীতি ভাবলেশহীন, নির্বোধের মতো মুখ করে বসেছিল।

বুদ্ধদেব শুধোয়, তুমি যে গল্পটা শোনালে এতক্ষণ, সেটা কি তুমি কারুর থেকে শুনেছ? নাকি এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ রয়েছে তোমার কাছে?

বামাচরণ সামান্য উশখুশ করে। দীপমালার দিকে বার-দুই তাকায়। মল্লিকার মসৃণ পায়ের ওপর চোখ রাখে। তারপর বলে, এ কোনও শোনা কথা নয়। রীতিমতো প্রমাণ রয়েছে বলেই বলছি।

—কী প্রমাণ? বুদ্ধদেব দৃষ্টি সরায় না বামাচরণের মুখ থেকে।

বামাচরণ কেমন যেন দোটানায় পড়ে যায়। কীভাবে এমন প্রশ্নের জবাব দেবে, সেটা স্থির করতে একটুখানি সময় নেয়। বুদ্ধদেব স্পষ্ট বুঝতে পারে, বামাচরণ কিছু লুকোতে চাইছে প্রাণপণে। অথবা এমন কিছু কথা রয়েছে, যা বলবে কি না, বলা উচিত হবে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয়ে পড়ে গিয়েছে সে।

দীপমালাও সম্ভবত চিনতে পেরেছেন বামাচরণের এই টানাপোড়েন অবস্থাটিকে। বলেন, তুমি নিঃসঙ্কোচে সব খুলে বল, বামা। বুদ্ধদেব আমাদের নিজের লোক।

বামাচরণ লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নেয় বার দুই। মাথার বালিবর্ণ চুলগুলোকে দু'হাতে মুঠো করে ঝাঁকায়। এক সময় বলে ওঠে, আমি স্যাংসন অর্ডার, অ্যালট্‌মেন্ট অর্ডার নিজের চোখে দেখেছি।

—কেমন করে দেখলে? বুদ্ধদেব তার দৃষ্টিখানি সারাক্ষণ সার্চলাইটের মতো তাক করে রাখে বামাচরণের মুখের ওপর। ঝানু উকিলের মতো জেরা করতে থাকে ওকে। বল, কেমন করে দেখলে তুমি?

—করালীদার আলমারির মধ্যেই রয়েছে সবকিছু। একদিন আমি বস্যেছিল্যম করালীদার ঘরে। করালীদা কাজ করছিল। এক সময় বিডিও সাহেব উয়াকে ডাকলেন। উ চল্যে গেল সাহেবের ঘরে। আলমারির গায়েই চাবিখান্‌ ঝুলছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আলমারিটা খুলে হরিণমুড়ির ফাইলখানা উল্টেপাল্টে দেইখ্যে লিল্যম। স্যাংশন অর্ডার, অ্যালটমেন্ট অর্ডার, সবকিছু।

—তুমি আচমকা হরিণমুড়ির ফাইল খুলে দেখতেই বা গেলে কেন? তেমন আগ্রহ তোমার হল কী কারণে?

—আমি কানাঘুষোয় শুইনেছিল্যম, হরিণমুড়ি স্কীমে ব্যাপক চুরি হয়েছে। সেই কারণেই—।

—কানা ঘুষোয় মানে? কে বলেছিল তেমন কথা? সে-ই বা জানল কোত্থেকে?

—অধর ঝারমুনিয়ার বাড়িতে বইস্যে যাদের থিকে টিপছাপ লিয়ে জাল মাস্টার রোল তৈরি করেছে করালী দা, তাদেরই একজন আমাকে খবরটা দেয়।

—কী খবর?

—অধর ঝারমনিয়ার বাড়ির দোতলায় বসে বসে নাকি দু' কিস্তিতে দু'বস্তা টিপছাপওয়ালা কাগজ বানিয়েছেন বাবুরা। আমার মনে হল, এত মাস্টার-রোল হরিণমুড়ি ছাড়া আর কোনও স্কীমের জন্য হতেই পারে না।

—লোকটার নাম কি?

বামাচরণ মুখ নাবিয়ে নেয়। খুব নীচু গলায় বলে, নাম আমি বইল্‌ব নাই। মাফ কর আমাকে। তবে কথাগুলা এক বর্ণ মিথ্যা লয়।

বুদ্ধদেব বেশ খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থাকে। গভীর ভাবনাগুলো কিলবিল করতে থাকে ওর মগজে। বামাচরণকে কেমন যেন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না তার একেবারেই। বলে, আচ্ছা না হয় তর্কের খাতিরে মেনেই নিলাম, স্যাংশন-অর্ডার এবং এ্যালটমেন্ট অর্ডার তুমি দেখেছ। এর দ্বারা মোটেই প্রমাণ হয় না যে মঞ্জুর হওয়া সব টাকাই ওরা তুলেছে।

—ঐ যে অত জাল মাস্টার-রোল—। পাশ থেকে দীপমালা বামাচরণের হয়ে বলে ওঠেন।

—ওগুলো যে বাকি তিনটি সেকশনের মাস্টার রোল, তার কী মানে আছে? যে দুটো সেকশনের কাজ হয়েছে, তার জন্যও বানানো হতে পারে। এক লাখ টাকার কাজ, সত্তর-পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ হল, বাকি পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকার ফল্‌স্‌ মাস্টার রোল বানিয়ে নিল, এমনটা হতে পারে না কি?

এমন কথায় দীপমালা দমে যান। তিনিও সদুত্তরের আশায় বামাচরণের দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

বামাচরণ খুব নির্লিপ্ত গলায় জবাব দেয়, আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটও দেখেছি। পুরো আড়াই লাখের। আমার হাত দিয়েই তো সব চিঠি-চাপাটি যায়।

বুদ্ধদেব ভীষণ দোটানায় পড়ে যায়। বামাচরণকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! আড়াই লাখ টাকার দেড় লাখই চুরি! কিন্তু বামাচরণের কথায় প্রত্যয় করবার কোনও কারণ দেখে না বুদ্ধদেব। কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে ওর কথাবার্তা। কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় ওর আচরণ।

একটু বাদে বামাচরণ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি এখন যাচ্ছি। আমার একখান্‌ জরুরি কাজ রয়েছে। বেতো ঘোড়ার মতো ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে যায় বামাচরণ। যাবার বেলায় বুদ্ধদেবকে এক ঝলক দেখে নেয়। দৃষ্টিখানাকে বুদ্ধদেবের ভারি শীতল মনে হয়।

বামাচরণ চলে যাবার পরও আরও কিছুক্ষণ থেকে যায় বুদ্ধদেব ও মল্লিকা।

এতক্ষণে বুদ্ধদেব দীপমালার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বলে, বামাচরণকে আপনার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় দীপাদি?

—কেন বল তো?

—না, মানে, ওর হাব-ভাব, হাঁটা-চলা, কথাবার্তার মধ্যে এক ধরণের অস্বাভাবিকতা রয়েছে বলে মনে হয় আমার। ব্লকের সবাই ওর সম্পর্কে নানা কথা বলে। তাই—।

দীপমালা নিঃশব্দে হাসেন। আলতো আলমোড়া ভেঙে শরীরের জড়তা দূর করেন। তারপর বলেন, শোন, তাহলে তোমায় খুলেই বলি, বামাচরণকে তুমি কিছুই চিনতে পার নি। এক ঝলক তাকিয়ে বুদ্ধদেবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটুকু দেখে নেন দীপমালা, বামাচরণ আমাদের পার্টির একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মী। ওর মতো সৎ এবং সিরিয়াস কর্মী আমাদের পার্টিতে বোধ করি খুব বেশি নেই।

এও বুদ্ধদেবের কাছে এক বিরাট চমক। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে দীপমালার দিকে।

দীপমালা খুব দৃঢ় গলায় বলেন, ওর প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করেছি আমি। এখন ভেবে চিন্তে স্থির কর, এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। কোন্ উপায়ে এই ঘুঘুর বাসাটিকে ভাঙা যায়।

বুদ্ধদেব ভাবনায় ডুবে যায় অনেকক্ষণ।

এক সময় বলে, আমি ঐ কাগজগুলো স্বচক্ষে দেখতে চাই।

কাগজপত্রগুলো স্বচক্ষে দেখবার ক্ষেত্রেও অসাধ্য সাধন করেছিল বামাচরণ।

করালী সোমের আলমারি খুলে হরিণমুড়ি-স্কীমের সংশ্লিষ্ট কাগজগুলি হাতিয়ে এনেছিল অপরূপ এক ছলনায়। এবং এক সন্ধ্যায় দীপমালার বাসায় সেগুলি পেশ করেছিল বুদ্ধদেবের সামনে।

স্যাংসন অর্ডাব, অ্যালটমেন্ট অর্ডার এবং ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, তিনখানি কাগজই পুরোপুরি নকল করে নিয়েছিল বুদ্ধদেব। চিঠির মেমো নম্বরগুলোও যত্ন করে টুকে নিয়েছিল। সারা সন্ধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা, ভাবনা চিন্তার পর স্থির হয়েছিল বিষয়টি কম্যুনিটি ডেপেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে এবং ডি-এম'এর ভিজিলেন্স দপ্তরে জানানো হবে। প্রশ্ন উঠেছিল, কে জানাবে? একজন কেউ জানালে, তার ওপর সমস্ত রোষ পড়বে ওদের। চিঠিখানা যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব নাও পেতে পারে। স্থির হয়েছিল, মাস-পিটিশনে কয়েকশো মানুষেব সই সংগ্রহ করে পাঠানো হবে ওপরে। তাতে কাজ না হলে দীপমালার নেতৃত্বে অগ্রণী মহিলা সমিতি ডেপুটেশন দেবে ডি-এম-এর কাছে।

বামাচরণ কাগজগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল ঠিক ঠিক।

বুদ্ধদেব বুঝতে পারছিল না, কাকে দিয়ে মাস পিটিশনে সই সংগ্রহের কাজটি করাবে। সে একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে তার ওপরওয়ালার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সই-সংগ্রহ অভিযানে নেতৃত্ব দিতে পারে না। দীপমালা পারেন, কিন্তু তাঁর চুয়ামসিনা এলাকায় অতখানি প্রভাব ও পরিচিতি নেই যে তাঁর কথায় শয়ে শয়ে মানুষ এম-এল-এ, বিডিও এবং হরবল্লভের বিরুদ্ধে সই দিতে রাজি হবে। এক ছিল সুকুমার। কিন্তু সে তো আজ ক'মাস বিনা বিচারে আটক। ঠিক তেমনি মুহূর্তে অনাথবন্ধুর কথা মনে পড়ে। অনাথবন্ধু, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের একটা সমৃদ্ধ ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর কৈশোর, যৌবন। আজ, প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মানুষটির দু'চোখ থেকে হারিয়ে গিয়েছে যাবতীয় আলো। বুদ্ধদেবের মনে হয়, অনাথবন্ধুকেই পুরো ঘটনাটা খুলে বলা চলে।

অনাথবন্ধু কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সারামুখ বেদনায় নীল হয়ে আসে। এ এক আশ্চর্য লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সারা দেশে। একখানা পাকা আম নিয়ে চারজন চারদিক থেকে চুষছে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল অনাথবন্ধুর। ধীরে ধীরে সেই অহঙ্কারের জায়গাটাও ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। ইদানীং

মানুষকে বড় সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর মনে হয়। বড় পলাতক। এদের জন্য কিছু করতে চাইলে প্রথমেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে নিজেরাই। সামান্য একটুখানি অর্থ, অথবা সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের পায়ে অনায়াসে মেরে বসবে কুড়ুলের ঘা। নামমাত্র মূল্যে যখন-তখন বেমালুম বিক্রি হয়ে যাবে। এদের সঙ্গে নিয়ে বেশিদূর এগোনো মুশকিল। এদের সম্বল বলতে কিছুই নেই, কিন্তু মনের মধ্যে রয়েছে দুর্বার লালসা। আর সমস্ত প্রাণীদের সমাজে এমনই পাকা বন্দোবস্ত যে সেখানে সামান্য পোকামাকড়ও এক খাদক। সেও গাছের কচি পাতাগুলিকে চিবিয়ে চিবিয়ে, চুষে চুষে খায়, যতদিন না ব্যাঙেরা তাকে ধরে গিলে ফেলছে। তখন, ব্যাঙও এক খাদক। তারও রয়েছে খাদ্য হিসেবে পোকামাকড়। সেও ছোট্ট ডোবায়, হাঁটু প্রমাণ জলে তার সাম্রাজ্যটিকে তিলতিল গড়ে তোলে। ভোগ করে। যদিও, সেও একদিন সাপের খাদ্য হয়ে যায়। তখন সাপ এক খাদক। যদিও তার জন্যও এক সাপুড়ে রয়েছে। এইভাবে, প্রাণী সমাজে শোষণের এমনই এক শেকলের মতো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যে সামান্য পোকাও তার নিজের ছোট্ট ঝোপগাছের সাম্রাজ্যটিতে বিভোর হয়ে থাকতে চায়। কোনও মূল্যেই সে তার ঐ সাম্রাজ্যটিকে হারাতে চায় না। ব্যাঙও সেই একই কারণে তার ডোবাটিতে মজে থাকে। পোকাগুলি কোনও কিছুর মূল্যে তার ঝোপ হারাতে রাজি নয়, ব্যাঙগুলিও তার একান্ত ডোবাটিকে খোয়াতে নিতান্তই নারাজ। নিজের ঝোপটিকে কিংবা ডোবাটিকে নিরাপদ রাখতে তারা সর্বদাই তটস্থ, জড়সড় থাকে, ঐ টুকু রাজ্যকে ঠিকঠাক রাখবার জন্য তারা যে কোনও অধঃপতনের জন্য তৈরি।

মানুষের সমাজেও পোকামাকড়, ব্যাঙ, সাপ, সাপুড়েদের শৃঙ্খলবদ্ধ বসবাস।

অনাথবন্ধু জানেন, হরবল্লভদের এই কীর্তির কথা জানতে পারলে মানুষগুলো কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে, কিন্তু কখনোই জ্বলে উঠবে না। আর, গণ-দরখাস্ত করবার প্রসঙ্গ তুললে তো সেই যে গর্তে ঢুকে পড়বে, আর কিছুতেই বেরোবে না। এই টাকাগুলো ওদেরই প্রাপ্য ছিল। লুণ্ঠন করে না নিলে ওগুলো ভাগাভাগি হয়ে ওদেরই সংসারে ঢুকত। অথচ কিছুতেই রাগ হয় না এদের, কোনও কিছুতেই ক্রোধ জাগে না মনে। ভিজে কাঠগুলিতে কিছুতেই আর আগুন জ্বলে না। সব কিছু শুনে বড় জোর অদৃষ্টকে দোষ দেবে, কিংবা ঐ ডাকাতগুলোকে আড়ালে অভিসম্পাত দেবে। তারপর পোকা মগ্ন হয়ে যাবে তার ঝোপটিকে নিয়ে, ব্যাঙ মজে থাকবে তার নিজস্ব ডোবাটিতে।

তবুও অনাথবন্ধু একদিন এলাকার কিছু বাছা বাছা বিশ্বাসী মানুষকে ডাকেন। গোবিন মিস্ত্রী, তিলক বাউরি, ভরত বাউরি, বাঁশি বাউরি, হঠাৎ মুর্মু, পবন লোহার, গোকুল ধল্ল, এরা সব চুপিসারে আসে অনাথবন্ধুর বাড়িতে। অনেক রাত অবধি শলা-পরামর্শ চলে। অবশেষে স্থির হয়, একটা দরখাস্ত লেখা হবে ডি-এম-এর কাছে। তাতে এরা সবাই টিপ সই দেবে। দরখাস্তখানি নিয়ে অনাথবন্ধু যাবেন ডি-এম'এর কাছে।

বৈঠক চলাকালীন গোবিন মিস্ত্রিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বুদ্ধদেব। লোকটা কেমন যেন বুড়িয়ে গিয়েছে এই এক-দেড় বছরে। একে তো চুরির অপবাদ ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, তার ওপর একটা মামলা চালাতে গিয়ে বেচারার প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থা। বুদ্ধদেব লক্ষ করে, গোবিনের সারা মুখে গভীর অবসাদ আর ক্লান্তির রেখাগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

সবাই চলে যাওয়ার পর বুদ্ধদেব এবং অনাথবন্ধু দরখাস্তখানা মুসাবিদা করে ফেলেন। অনাথবন্ধু বলেন, খুরশিদ সাহেব থাকলে আমি নিজেই চলে যেতাম। কিন্তু নতুন ডি-এম'টির সঙ্গে আমার আলাপ নেই। শুনেছি, লোকটি অন্য জাতের।

নতুন ডি-এমটি, যতদূর জানা গেছে, একটু কর্তা ভজা গোছের মানুষ। কাজেই অনাথবন্ধুর দৌত্য কতখানি সফল হবে, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল বুদ্ধদেবের। বিশেষ করে, নির্বাচন যখন দ্রুত এগিয়ে আসছে, এত বড় কেলেঙ্কারিকে তিনি, শাসকদলের স্বার্থে, পাঁচ কান হতে দেবেন বলে মনে হয় না। তবুও, চেষ্টা তো করতেই হবে। সেটা বুদ্ধদেবদের কর্তব্য।

২৫. পাগল শিকারির স্বপ্নপুরাণ

চুয়ামসিনার গাজনতলায় কথক ঠাকুরের সুমুখে বসুদেব-দেবকীর আখ্যান শুনতে শুনতে একটা বিপজ্জনক স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল পাগল শিকারি।

এবং বছরটাক বাদে জন্মাষ্টমীর দিনে, সেই এক প্রবল ঝড় বৃষ্টির রাতে যখন সিংহগড়ের নাটমণ্ডপে জমজমাট পালাগান চলছিল, কৃষ্ণের জন্মবিত্তান্ত, সেই রাতে শালকাঁকির ডাঙার ভাঙা ঝুপড়ির মধ্যে চিল-চিৎকার জুড়েছিল পাগল শিকারির বউ সারো। সে রাতে প্রকৃতি প্রলয় তাণ্ডবে মেতেছিল। সারা আকাশ জুড়ে থিকথিকে কালো মেঘ। ঝলাক্ ঝলাক্ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর বাজ পড়ছিল। সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়া বইছিল। মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছিল গাছের ডাল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝরেছিল রাতভর। প্রকৃতি সে রাতে কেঁদেছিল অবিরল ধারায়। আর পাগল শিকারির বউ তার তলপেট চেপে ধরে কেঁদে উঠছিল বারবার। ত্রাহিত্রাহি রব তুলেছিল সে।

মাস গণনায় ভুল ছিল না। পাগল শিকারি বুঝেছিল, তার ঝুপড়িতে আজ রাতে একজন আসছে।

প্রথম পোয়াতি বলে পাগলের একটু দুশ্চিন্তা ছিল। ব্যথাটা উঠেছিল বিকেলের দিকে। একটু একটু করে বাড়ছিল। পাগল ততখানি গা করে নি। ওদের জাতে কে কবে পোয়াতির প্রসব নিয়ে অধিক ভাবনা-চিন্তা করেছে। যিনি বেঁধেছেন, তিনিই মুক্ত করবেন। পাগলের খুড়ি চিন্তামণি নাম করা ধাই। সারোর তলপেটে তেল-হলুদ ঘষেছে দম্মে। পাগলের দুশ্চিন্তাটা গাঢ় হল সন্ধ্যায়, যখন আকাশে ঘনঘন গুরুলে উঠল মেঘ, নিকষ আঁধারে ঢেকে গেল চরাচর, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, এবং এই সবকিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারোর চিল-চিৎকারও বাড়তে লাগল ক্রমশ।

প্রায় রাতভর চলেছিল সেই চিৎকার। চিন্তামণি ধাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাত্রির শেষ প্রহরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল সারো। আর তাতেই ধন্যি ধন্যি রব উঠল শালকাঁকির শিকারিপাড়ায়। কী? না, পাগল শিকারির ভাগ্যি ভাল, কেন কি, জন্মাষ্টমীর ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের রাত্তিরে ছেইলা প্রসব করেছে উয়ার বউ। এ ছেলিয়া যেমন-তেমন হবেক নাই। শিকারিপাড়ার নাম অনেক উঁচাতে তুইল্বেক। দ্বাপরে কিষ্টো ঠাকুরের জন্মের খেই ধরে পাগল শিকারির পড়শিরা অনেক রোমহর্ষক ভবিষ্যতবাণী করেছিল সেদিন। পাগল আর সারোকে বন্দী বসুদেব আর দেবকীর সঙ্গে তুলনা করেছিল। ওরাও তো সিংহগড়ে আজীবনকাল বন্দী।

হরবল্লভ শুনে বলেন, উয়ার নাম রাখ্ মাকুন্দ। পাগলের ব্যাটা মাকুন্দ। নেহাতই তাচ্ছিল্য মেশানো রসিকতা ছিল সেটা। কিন্তু তাও পাগল শিকারি অমান্যি করতে পারেনি মালিকেব রায়কে। মস্করার ছলে বললেও সেটা পাগলের কাছে নির্দেশের তুল্য, কেন কি, কথাটা বলছে কে? না, খোদ মালিক। তিনি যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঠাট্টার ছলেও বাঁধা মাইন্দারের ছেলের একটা নাম বাতলে দেন তো কার সাধ্যি তার হেরফের করে! সাবোব মনোগত বাসনা ছিল, তার প্রথম সন্তানের নাম রাখে, শ্যামাপদ। শুনে পাগল শিকারি বউয়ের ওপর বাঘের ঝাপট নেয়, ধুশ শালী, শিকারি ঘরের ছেইলার নাম শ্যামাপদ! উ'কি কোঁছা সামল্যে ইস্কুলে মাস্টারি করতে যাবেক নাকি, চুয়ামসিনা ইস্কুলের শ্যাম মাস্টারের মতন! না, ঘণ্টা দুলিয়ে গিরস্থের ঘরে ঘুরে পূজা কইর্বেক রাধালগরের শ্যাম ঠাকুরের তুল্য! অতএব বউয়ের অনুনয় আব্দার তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়ে যায়। এবং পাগল শিকারির ছেলের নাম হয় মাকুন্দ।

পাগলের মনের অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। তার ইচ্ছে, ছেলের নাম রাখে সুধন্য। বউ শুনে ক্ষেপে কাঁই। তুমার কি ভীমরতি ধর্যেছে? ব্যাটার নাম রাইখ্তে চাও সুধন্য! সুধন্য তুমার লিজের নাম লয়? পাগল বলে, ক্ষতি কি? সে নামে তো আমাকে কস্মিনকালেও কেউ ডাকে নাই। বউ বলে, তা হোক, তবুও বাপের নাম ব্যাটা কি লিতে পারে? ছিঃ! পাগল শিকারি বাখান পাড়ে, মুর্খ মেয়ামানুষ, তুয়াকে আর কীই বা বুঝাব? একখান্ মাদুলি কিনে, না পইর্লে, মাদুলিটা তো লুতনই থাকে, বটে কিনা? ব্যাভার না কইর্লে নামের মূল্য কি? তা বলে, ব্যাটার নাম দিবে লিজের নামে? বউটা আরও ক্ষেপে যায়। পাগল শিকারি ওকে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে বসে, আরে, আমার নামই লয় উট্যা। ধর্, একখানা লৈতন কাপড় তুয়াকে দিল্যাক কোউ। কাপড়টা তুই পইর্লি নাই। রেখে দিলি। ধর্, কুনো বিয়াঘরের কুটুম্বিতা রইক্ষা কইর্তে তুই কাপড়খানা দিয়ে দিলি। দোষ আছে কিছো? বউ কী বোঝে, তা সে ও-ই জানে, পাগল শিকারি স্থির করে ফেলে ছেলের নাম সুধন্যই রাখবে। মুচকি হেসে বলে, ইয়ার পরে যেটা আইবেক! উয়ার নাম শ্যামাপদ, বামাপদ, ভীমাপদ, যা রাখ আমি কিছো নাই বইল্ব। বউ রোষে, লজ্জায় একাকার হয়।

ছেলের নাম সুধন্য রেখে পাগল শিকারি বসুদেব হতে চেয়েছিল। বউকে বানাতে চাইছিল দেওকি। সেই থেকে এক আনকোরা স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল তার বুকে। স্বপ্নের শিশুটি হাত-পা নেড়ে হাঁটাহাঁটি জুড়েছিল বুকের মধ্যে।

এসব কথা মাকুন্দ শিকারি বড় হয়ে শুনেছে। সে তখন বারো-তেরো বছরের বালক। সিংহগড়ের ভাতুয়া বাগাল। শুধু পেটভাতায় সিংহগড়ের গরু চরায়। আর, সকাল-সন্ধ্যা বৃদ্ধ প্রতাপলালের গা-হাত-পা মালিশ করে দেয়। রোজদিন সন্ধ্যেবেলায়, যখন হরবল্লভ চা খেতে খেতে রেডিওতে খবর শোনেন, কিংবা গাঁয়ের ভদ্দর জনদের সঙ্গে মজলিশে বসেন, তখন পাশটিতে বসে আস্তে আস্তে তাঁর পা টিপে দেয়।

হেনকালে একদিন, মৌভাণ্ডারের মাঠে, সিংহবাবুদের জমিনে লক্ষ্মীকাজল ধানের আঁটি বাঁধতে বাঁধতে পাগল শিকারি দেখে ফেলে আরও একখানা বিপজ্জনক স্বপ্ন। দেখে,

সিংহগড়ের দোতলায়, বিষ্টুপুরী লণ্ঠনের আলোর বৃত্তের মধ্যে বসে হরবল্লভের ছোটছেলে দেবিদাস আর মেয়ে উমার সঙ্গে একাসনে লেখাপড়া করছে তারই পুত্র মাকুন্দ। স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ার পর পাগলের সারাশরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছে। স্বপ্নটা সে কারোর কাছেই ভাঙেনি মূলত দুটো কারণে। এক, এ স্বপ্ন প্রকাশ পেলে তার লতি-লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। এবং দুই, স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে দিলে, ফলে না।

পাগল শিকারির দেখা স্বপ্নটা কাকপক্ষীতে প্রকাশ না পেলেও তা আজীবন অপূর্ণ থেকে যেত, যদি প্রমথ গাঙ্গুলির বড় ছেলে স্বপন গাঙ্গুলি বেকার হয়ে না বসে থাকত। অন্যদিকে, যদি হরবল্লভের শালা কুমুদকান্ত বাঁকুড়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে জামাইদাকে না ধরে বসতো যে নতুন গড়ে ওঠা লোখেশোল জুনিয়র হাইস্কুলে তাকে যে কোনও গতিকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যদি ঐ নিয়ে অরুন্ধতী অষ্টপ্রহর রাগে-রোষে, খোঁটায়-গঞ্জনায় হরবল্লভের প্রাণ না ওষ্ঠাগত করে তুলতেন। এবং যদি প্রমথ গাঙ্গুলি লোখেশোল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির একজন প্রভাবশালী মেম্বার না হতেন। এতগুলি 'যদি' একত্রে মিলে মিশে পাগল শিকারির স্বপ্নটাকে আংশিকভাবে সত্যি করে তুলেছিল, যদিও পাগল শিকারি এজন্য হরমোহন চট্টরাজ নামে একজন স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে আসছে আজীবনকাল।

হরবল্লভ লোখেশোল জুনিয়র হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। কিন্তু স্কুলে যখন একজন বি.এ পাশ মাস্টারের দরকার হয়, হরবল্লভ দেখেন, অনাথবন্ধু তাঁর কোন্ এক একসঙ্গে-জেলখাটা স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুর ছেলেকে ঐ পোস্টে ঢুকিয়ে দেবার তাল করছেন। কী? না, সারাজীবন জেল খাটতে খাটতে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর সংসারের দিকে তাকাবার তিলমাত্র ফুরসৎ পাননি। ফলত পুরো সংসারটি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এদিকে দিদির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় কুমুদকান্ত সিংহগড়ে এসে থানা গেড়েছে, এবং যতদিন না লোখেশোল ইস্কুলে মাস্টারিটা পাকা হচ্ছে, ততদিন সিংহগড় না ছাড়বার জন্য সে একেবারে বদ্ধপরিকর।

অনাথবন্ধুকে ঠেকাবার জন্য প্রমথ গাঙ্গুলির সমর্থনের প্রয়োজন ছিল হরবল্লভের। বাকি মেম্বররা সব 'কাদার ম্যাক'। যেদিকে টানা হবে সেদিকেই হেলে পড়বে। প্রমথ গাঙ্গুলির কাছে সরাসরি প্রস্তাবটা রাখবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রমথ রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি একখানা শর্ত চাপাতেও ভুল করেননি তিনি। স্বপনটাও তো বইসে রয়েছে আজ ক'বছর। তুমরা বর্তমানে উয়ার একটা ব্যবস্থা হবেক নাই? ইঙ্গিতটা একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল হরবল্লভের কাছে। স্বপনের মাস্টারির একটা ব্যবস্থা হলে তবেই প্রমথ গাঙ্গুলি কুমুদকান্তর পক্ষ নেবেন ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ। বাধ্য হয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিশাকর দত্তর শরণাপন্ন হন হরবল্লভ। নিশাকর তাঁর শুধু বন্ধুস্থানীয়ই নন, সিংহগড়ের সঙ্গে তাঁর পরিবারের বহুদিনের সম্পর্ক। নিশাকর দত্ত জোগান মোক্ষম বুদ্ধি। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, তাতে করে আরও একজন মাস্টার না হলে চলছে নাই, এই মর্মে একটা প্রপোজাল সাব-ইনস্‌পেক্টর এবং ডি-আই সাহেবের

মাধ্যমে পাঠাবার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তিনি ডি-আই সাহেবকে বলে দেবেন যাতে তিনি খুব একটা বেগড়বাঁই না করেন। সেইমতো প্রস্তাব যায় সদরে এবং মঞ্জুরও হয়ে যায় একটি বাড়তি পদ, যদিও ছাত্রসংখ্যা বাস্তবে বাড়ল না একজনও। যা বাড়ল, সবই কাগজে-কলমে।

ঐ বাড়তি ভ্যাকেন্সিতে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত চায় স্কুলবোর্ড। এবং বহু ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করা ছেলেকে টপকে থার্ড ডিভিশনে পাশ করা স্বপন গাঙ্গুলির মাস্টারিটা হয়ে যায় চুয়ামসিনা ইস্কুলে। আর, যে প্রক্রিয়ায় গাছের গোড়ায় সার-জল ঢাললে ডগায় ফুল-ফল ধরে, সেই প্রক্রিয়ায় প্রমথর গাছটিতে সার-জল জুগিয়ে হরবল্লভ অল্পদিনের মধ্যে এক আশ্চর্য ফুল তুলে নেন ঐ গাছ থেকে। অনাথবন্ধুর যাবতীয় যুক্তিতর্ক, অনুরোধ-উপরোধকে অগ্রাহ্য করে হরবল্লভ-প্রমথ জোট লোখেশোল জুনিয়র হাইস্কুলে প্রতিষ্ঠা করে কুমুদকান্তকে।

দিন কাটে, রাত কাটে, হেনকালে একদিন বিষ্টুপুরের স্কুল-ইনস্‌পেক্টরটি বদলি হয়ে যান এবং তাঁর বদলে যিনি আসেন তিনি খুব কড়া আর নীতিবাগীশ মানুষ বলে রটে যায় সারা তল্লাটে। একদিন তিনি চুয়ামসিনা ইস্কুল পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর, যাকে গ্রামের স্কুলের ছাত্ররা 'নিসপটর্‌' বলে জানে, তাঁর স্কুল পরিদর্শনে আসা এক রীতিমত পিলে চমকানো ব্যাপার। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ক্লাসরুম এবং স্কুলের চারপাশ ঝাড়পুছ করা হয়। ঝোপঝাড় কেটে পরিস্কার করা হয়। স্কুলের যাবতীয় খাতাপত্র খুঁজে পেতে, ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। ছাত্রদের সাফ-সুতরা হয়ে আসতে বলা হয়। নিসপটরবাবু কী শুধোলে কী জবাব দিতে হবে, তার রিহার্সেল হয় বারেবারে। হরবল্লভের গড়ে তাঁর মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। সবদিক থেকে আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখনই শ্যামাপদ মাস্টার দেয় এক চরম দুঃসংবাদ। স্কুলের হাজিরা খাতায় যত ছাত্রের নাম রয়েছে, হাজিরা তার অর্ধেক। হরবল্লভ জানেন, এর বারোআনা দায়ভাগ তাঁরই। কারণ অনুপস্থিত ছাত্রের সিংহভাগের বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। প্রমথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে জোট বাঁধবার স্বার্থে স্বপন গাঙ্গুলিকে স্কুলে ঢোকাতে গিয়ে বহু কল্পিত ছাত্রের নাম হাজিরাখাতায় ঢোকাতে হয়েছে। আগের ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ব্যাপারটা জানতেন। তিনি বড় মিশুকে, সামাজিক মানুষ ছিলেন। তাঁকে কিছু লুকোবার দরকারই হত না। এ লোকটি নাকি যার-পর-নাই নীতিবাগীশ আর টেটিয়া। ভাবনায় পড়ে যান হরবল্লভ। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চারআনা ছাত্র অনুপস্থিত থাকবে, জানা কথা। কিন্তু বাকি বারোআনা বানাতেই অন্তত গুটি চল্লিশেক বাচ্চা দরকার। দু'দিনের মধ্যে চল্লিশটি অতিরিক্ত পড়ুয়া জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। গতিক দেখে শ্যামাপদ মাস্টার কাঁপতে লেগেছে ততক্ষণে। স্কুলের হেড পণ্ডিত হিসেবে এই বিশাল অনুপস্থিতির দায় সে এড়াতে পারে না। তার এও সন্দেহ হচ্ছে, ইন্‌স্‌পেক্টরসাহেব উজমুদ্দা আসছেন না। রীতিমতো সবকিছু জেনেশুনেই যাচাই করতে আসছেন। কোনও পক্ষ থেকে পুরো ব্যাপারটা তাঁর গোচরে আনা হয়েছে নির্ঘাৎ। নইলে আজ পাঁচ-সাত বছর যে ইস্কুলে কোনও ইন্‌স্‌পেক্টরই আসেন নি, নতুন

সাহেব এসেই সেই ইস্কুলটাকেই পছন্দ করবেন কেন? ব্যাপারটা হরবল্লভের কানে তুলতেই তাঁরও ভ্রূসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে, এবং প্রথমেই যে মুখখানা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, সে হল সুকুমার আচার্য। কাঠিবাজ ছগরা, সর্বদাই এর-ওর-গর্তে মুখ ঢোকাচ্ছে। মানুষজন যাতে অসুবিধেয় পড়বে তেমন কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে সর্বক্ষণ। এলাকার কোনও ঘটনাই ওর অগোচরে থাকে না। যত গোপনেই সারা হোক না কেন, ছাত্র বাড়ানোর ব্যাপারটা নির্ঘাৎ কোনও সূত্র থেকে জেনে ফেলেছে শালা। আর যেই বুঝেছে নতুন সাহেবটি কড়াধাতের মানুষ, অমনি এক ফাঁকে গিয়ে উগরে দিয়ে এসেছে। সুকুমারের মুখখানা মনের পর্দায় ভাসছিল, পাশাপাশি আরও একটি মুখও ভাসতে থাকে। অনাথবন্ধু রায়। মুখখানি ভাসতে ভাসতে স্থায়ী হয়। অনাথবন্ধুও এটা করতে পারে। নিজের পেয়ারের লোকটিকে ঢোকানো যায় নি, রাগ তো তার হতেই পারে। আর জেল-টেল খাটবার দরুণ, নিজের হাতে একখানা জলজ্যান্ত স্কুল গড়ে তোলার সুবাদে, এলাকায় ওর একটা আলগা সুনাম ছড়িয়েছে। বিষ্টুপুরের আপিস-কাচারিগুলোতে ব্যাটা এক ধরণের সম্ভ্রম পায় বলে শুনেছেন হরবল্লভ। সেও গিয়ে নতুন সাহেবের কানভারি করে আসতে পারে। সে যাই হোক, আপাতত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। কান টানলেই যেমন মাথা আসে, শ্যামাপদর চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হলে হরবল্লভের কীর্তিও ফাঁস হয়ে যাবে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে। হরবল্লভ ভাবতে থাকেন।

সন্ধ্যে নাগাদ রতিকান্তকে ডাকেন হরবল্লভ। চুয়ামসিনা এবং চারপাশের বাউরি-বাগদি-শিকারি-লোহার পাড়াগুলোতে যত অনুগত মানুষজন আছে, তাদের বাচ্চাগুলোকে একদিনের জন্য ইস্কুলে পাঠানোর নির্দেশ জারি করেন রতিকান্ত মারফৎ। রতিকান্ত সারা সন্ধ্যে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে থাকে এবং জনা তিরিশেক বাচ্চা সংগ্রহ করে মালিককে তাক লাগিয়ে দেয়। হরবল্লভ বলেন, কাল সকালে-বিকালে আবার যাও তুমি। বল, আগামী শুক্কোরবার ইস্কুলে সব্বাইকে দুধ খাবানো হবেক। ইস্কুলে ইস্কুলে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য ইউনিসেফ থেকে প্রচুর পাউডার দুধ পেয়েছিলেন হরবল্লভ। বারোআনা পেটি বিষ্টুপুরেই খালাস করে এসেছেন হরিকিষেণের গদিতে। বাকিগুলো সদরমহলের একখানা ঘরে ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে মাস ছয়েক। নিজেদের কাচ্চাবাচ্চারা মাঝেমধ্যে ঢুকে খানিকটে করে বের করে খায়, অনুগত সহপাঠীদের বিলোয়। বাকি দুধ প্রায় জমতে বসেছে। এতদিনে সেই দুধের সামান্য অংশ উপযুক্ত কাজে ব্যয় করবার কথাটা মাথায় খেলে যায় হরবল্লভের। বলেন, বইল্‌বি, যে ইস্কুলে যাবেক, এক গেলাস করে ফুটানো দুধ পাবেক। হরবল্লভের আনন্দ হয় আরও একটি কারণে যে, এতদ্বারা ইনস্‌পেক্টর সাহেবকেও দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে সরকার থেকে পাওয়া দুধের সদ্‌গতি হচ্ছে হরবল্লভের এলাকায়।

পরের দিন সকাল না হতেই রতিকান্ত নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ে।

২৬. গজেনের ক্ষতস্থান

অবশেষে অগ্নি একদিন নিশান বাউরিকে শুধোয়, বারবার যে চইলে যেইতে বলছ, আমি চইলে গেলে তুমাকে দেখবেক কে?

—সে তুয়াকে ভাইব্‌ত্যে হবেক নাই। পয়লা তুই রাজি হইয়েঁ যা দেখি।

—সিটি হব্যেক নাই। অগ্নি গোঁ ধরে বসে থাকে, তুমাকে দেখভাল কইর্‌বার বেবস্তা না কইর্য়ে আমি কুথাও নাই যাব।

আর যেই না বলা, অমনি নিশান বাউরি দাপানজুড়িতে লোক পাঠিয়ে তার শালার এক নাতনিকে আনিয়ে নেয় হপ্তাটাক বাদে। বলে, ইবার রাজি হ। তাবাদে, তুই তো দুয়ার গোড়াতেই রইলি। অবরে-সবরে এইস্যে দেখে যাবি।

এরই মধ্যে কবে কবে সখা বাউরিকে খবর দিয়ে ডাকিয়েছে নিশান। বলেছে, অগ্নিকে আমি রাজি করাচ্ছি। তুমি লাত-জামাইকে লিয়ে এস একদিন।

সেই সুবাদে একদিন অগ্নিদের উঠোনে সখা বাউরির পিছু পিছু গজেন এসে হাজির। সাফ-সুতরা জামা-কাপড়। বেশ আলাবার্ট করে আঁচড়ানো বাবরি চুল। হাতের পুঁটলিতে আধসেরটাক বোঁদের নাড়ু।

নিশান বাউরি লাত-জামাইকে নিজের কাছটিকে এনে বসায়। এবং ঠিক যেমনটি করে অগ্নির পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সেদিন, তেমনি করে নিঃশব্দে হাত বুলোতে থাকে গজেনের পিঠে। গজেনও ভেজা বেড়ালটির মতো গুটিশুটি মেরে বসে থেকে হাত-বুলুনিটা উপভোগ করতে থাকে।

এক সময় ঘোলাটে চোখদুটি গজেনের মুখের ওপর তুলির মতো বোলাতে থাকে নিশান বাউরি। বলে, এবারে আর আমার লাতনিটাকে গতি-লাঞ্ছনা কইর্‌বি নাই তো রে, গজেন?

—আবার! পাশ থেকে বলে ওঠে সখা বাউরি, উয়ার হাত-পা ভেইঙে দিব নাই তা'লে?

গজেন মুখে এক ধরনের দুঃখী-দুঃখী ভাব আনবার চেষ্টা করে চলে সারাটা সময়। ভেঙে পড়া গাছের মতো এক ধরনের দীনহীন মুদ্রা রচনা করে সারা শরীরে।

—এক কাজ কর্‌ না ক্যানে? নিশান বাউরি শলা দেয়, ইখ্যেনেই ক্যানে এইসে থাক্‌ না তুই? অগ্নি বইল্‌ছিল, দু'দিন বাদে ত এই ভিটা-পুকুর, ঘব-বাড়ি সবই তুয়াদ্যার হব্যেক, শুধুমুদু ক্যানে পরের ভিটায় হাঁড়ি বাঁধা।

গজেন কিছু বলবার আগেই মাঝপথে ছোঁ মেরে নেয় সখা বাউরি। বলে, সিট্যা ত ভালই হইতো। কিন্তু অন্য দিকটাও বেবেচনা কর। মিনাশূন্যে পদম পুকুরের পাড়ে পাঁচকাঠা ভিটা পাচ্ছে ছেইলাটা। ঘর-বাড়ি তিয়ারির খরচও। তুমার ঘরে এসে থাকলে উসব কি আর পাবেক? তা বাদে, মাছ চাষের মেনেজারি বাবদ, রাতে পাহারা দিবার বাবদ, মাসে মাসে মাইনাও দিব্যেক উয়ারা। শুধু বউকে লিয়ে ঘর কল্লেই তো হইল্যাক নাই, বউকে তো পালতে হব্যেক, না-কি? গজেন যে সুযোগটা পাচ্ছে, অন্য কেউ হইলে চারহাতে লুফে লিত। ভিটামাটি, ঘরবাড়ি, তার উপর ফের মাস-মাইনার চাকরি। আর, কত বড় ঘাটে লাওটি বাঁধতে চইলেছে তুমার লাত-জামাই, সিটাও দেখ একটিবার।

নিশান বাউরির মনে ধরে সখার কথাগুলি। বিড়বিড়িয়ে বলে, সিট্যা বটে ঠিক। অমন সুযুগ বড় একটা পায় না মানুষ।

সেদিন দুপুরবেলায় নিশানের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া সেরেছিল গজেনরা। অগ্নিই রাঁধাবাড়া করল, পাত পেড়ে খেতে দিল।

সেদিন অগ্নির কেন জানি মনে হচ্ছিল, মানুষটা আগের মতো অতখানি চামার নেই। তার প্রকৃতিতে একটা পরিবর্তন এসেছে। ভাবতে ভাবতে অগ্নির শরীরের আগুন-গাছে সামান্য ছায়া-ছায়া ভাব।

শেষ অবধি নিশানকে তার শালার নাতনির হাতে সঁপে দিয়ে গজেনের সংসারে চলে আসতে হয়েছে অগ্নিকে।

পদম পুকুরের পাড়ে ছিটেবেড়ার ঘর হয়েছে গজেনের। পুকুরটা সাফ করে মাছের পোনা ছেড়েছে প্রভঞ্জন। একটা নেশায় পেয়েছে বুঝি ওকে। দিনের অধিকাংশ সময় তার কেটে যায় পদম পুকুরের পাড়ে। কখনও সঙ্গে থাকে স্বপন গাঙ্গুলি, ভৈরব গোস্বামীর দল, কখনও প্রভঞ্জন একা। অগ্নিকে দিনেব মধ্যে দু'তিনবার চা বানিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় পুকুরঘাটে।

দু'খানা ছোট ছোট খুপরি, মধ্যে ছিটে বেড়ার দেয়াল। একটাতে বসেছে মদের আসর। প্রভঞ্জন, স্বপন আর ভৈরব। সঙ্গে রয়েছে গজেনও। দেশি মদের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায়। জয়রামপুরের মোড় থেকে আলুর চপ কিনে এনেছে গজেন। দেশি মদের সঙ্গে চাট হিসেবে দারুণ। অনেকক্ষণ ধরে পান করছে ওরা। কথা জড়িয়ে এসেছে এখনই। কারণে, অকারণে হেসে উঠছে প্রভঞ্জন। এর-ওর উরুতে চাপড় মারছে অকারণে। দেশিতে আর চইল্ছে নাই। ইবার বিষ্টুপুর থিকে বিলাতি আনব। একবার বিলাতি খেলে, দেশির দিকে আর ঘুরেও চাইবি না তুয়ারা।

পাশের কুঠরিতে বসে অগ্নি কাঠ হয়ে শুনছে। বুকের ওপর একখানা মস্ত পাথর। পাথরখানা ক্রমশ ভারি হচ্ছে। আগে হপ্তায় দু'একদিন চলত, ইদানীং প্রায় ফি-সন্ধ্যায় মদের আসর বসে গজেনের ঝুপড়িতে। জমায়েত হয় বাবুদের বাড়ির ছোকরারা। প্রথম দিনে ওদের আসর পাততে দেখে বিস্ময়ে অগ্নির চোখের পাতনি পড়ে না, হাই বাপ, বাবুদ্যার বাড়ির ছগ্রা, বাউরি দোরে বইস্যে মদ খাচ্ছে গ! ঘিন্নাপিত্তি নাই একতিল! আগের দিনে, বাউরির উঠানে পা দিলে বাবুদ্যার সিনান কইর্ত্যে হইতো। আর আজ, একাসনে থাবড়ে বুইস্যে এক বোতলে মদ খাচ্ছে!

অনেক রাত্তির অবধি মদ খায় ওরা। গভীর রাতে টলমল পায়ে ফিরে যায়। নেশাটা বেশি হয়ে গেলে আর ঘরে ফেরে না। ক্লাবঘরেই গিয়ে শুয়ে পড়ে। অগ্নি জানে, এসবের জন্য গজেনকে কিছুই খরচ করতে হয় না। সব খরচ প্রভঞ্জনের। সে শুধু মদের টানেই আসে না, ইদানীং অগ্নির বিশ্বাস জন্মেছে, অগ্নিব জন্যও আসে লোকটা। শুধু তাই নয়, ইদানীং অগ্নির মনে হয়, গজেনকে ঘরবাড়ি বানিয়ে থিতু করা, সখা বাউরির মাধ্যমে অগ্নিকে গজেনের ঘর করতে বাধ্য করা, সবকিছুর মধ্যে প্রভঞ্জনের এক দীর্ঘমেয়াদী ছক রয়েছে। সেই ছক অনুসারে সে একটু একটু করে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে অগ্নির

দিকে। অনেকদিন থেকেই অগ্নির ওপর নজর রয়েছে প্রভঞ্জনের। বছরটাক আগের সেই আকাট দুপুরের অভিজ্ঞতা এখনও অবধি অগ্নির স্মৃতিতে জীবন্ত। পেত্যাখানি প্রভঞ্জনের মুখে ছুঁড়ে দিয়েই দৌড় মেরেছিল অগ্নি। সে যাত্রা অনেক হম্বিতম্বি করেও বেশি দূর এগোয় নি প্রভঞ্জন। ওপরের দিকে থুথু ছিটোলে নিজের গায়েই পড়ত। তাবলে কিছুই ভোলে নি প্রভঞ্জন। অগ্নির আশা সে বুঝি তিলেকের তরেও ছাড়ে নি। ছক কষতে কষতে নির্দিষ্ট নিশানায় এগিয়ে আসছে সে। আগের দিনকাল হলে অত হিসেব করে পা ফেলবার দরকারই হত না। প্রভঞ্জনের বাপ-ঠাকুর্দারা একেবারে শিকার কববার ভঙ্গিতে দখল নিত তাদের পছন্দের মেয়েগুলিকে। কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিল না তাদের। সরাসরি লগদি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যেত যাকে খুশি। ইচ্ছেমতো ভোগ করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিত যথাসময়ে। অগ্নির বড়-ঠাকুমা অর্থাৎ নিশান বাউরির প্রথম পক্ষটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে লগদি দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সুদর্শন সিংহবাবু। রাতভর ভোগ করেছিল জয়রামপুরের লৈতন কাচারি ঘরের দোতলায়। সেই রাতেই কড়িকাঠে ঝুলে জীবন হারিয়েছিল বড়-ঠাকুমা। অগ্নি বড় হয়ে নানাজনের মুখে শুনেছে সেই বিত্তান্ত। এইভাবে, প্রকাশ্যে, বুক ফুলিয়ে এলাকার বহু যুবতীর ইজ্জত নিয়েছে সিংহবাবুরা। সে সব কাহিনী এখনও চুয়ামসিনার বাতাসে ভাসে। আগের দিনকাল হলে অগ্নিকে জয় করবার জন্য অত কাঠখড় পোড়াবার দরকারই হত না প্রভঞ্জনের। কিন্তু দিনকাল বদলে গিয়েছে। এখন আর পরের ঘরের বউড়ি-ঝিউড়িদের সরাসরি তুলে এনে ভোগ করা সম্ভব নয়। এখন কিঞ্চিৎ ছলাকলা। সামান্য ঘুরপথ। একটুখানি ঘুরিয়ে নাক দেখানো। তাই, আগে, পুকুরপাড়ে বসে থাকতে থাকতে প্রভঞ্জন প্রায়ই বলত, গজেন, তুয়ার বউকে একটু চা কইর্‌তে বল্ না। গজেন সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পাড়ে, অগ্নি চা কর্। ইদানীং প্রভঞ্জন নিজেই, সরাসরি ফরমায়েশ করে, অগ্নি এটা কর্, উট্যা কর্। অগ্নি করে। হাজার হোক, মনিবের জাত। জমিন দিয়েছে, ঘর করে দিয়েছে, মাসকাবারি মাইনা দিচ্ছে, তার দু'চারটা ফাই-ফরমাশ ত খাইট্‌ত্যে হব্যেক্‌ই। মাঝে মাঝে চা বানিয়ে তেঁতুলতলায় নামিয়ে দিয়ে পিছু ফেরার মুহূর্তেই 'অগ্নি—।' বলে ডাক পাড়ত প্রভঞ্জন। ফিরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির চোখে চোখ মিলিয়ে প্রথমেই একচিলতে হাসি-উপহার দিত। পরমুহূর্তে বলত, কুথা যাচ্ছু? বোস না।

গজেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেই, হঁ, কুথা যাস? বস্ না।

অগ্নি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁকচিরা কাটতে থাকে নিঃশব্দে।

প্রভঞ্জন তাকিয়েই থাকে ওর দিকে। নিষ্পলক। মুখে আঠালো হাসি। বলে, সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকু ক্যানে?

গজেন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, হাঁ, ঢুকে থাকু ক্যানে?

প্রভঞ্জন বলে, তুই আমাদ্যার গাঁয়ের মেয়া, তুয়ার অত লাজ কিসের?

—হাঁ, লাজ কিসের? গজেন তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে।

অগ্নি অত কথায়ও বাজে না। তেঁতুলতলা থেকে হাত চারপাঁচ দূরের অর্জুন গাছটিকে দু'হাতে আঁকড়ে ঠায় খাড়া থাকে, আর মনোযোগ সহকারে আঁকচিরা কাটতে থাকে মাটিতে।

টিকটিকি যেমন করে পলকহীন তাকিয়ে থাকে পোকার দিকে, প্রভঞ্জন ঠিক তেমনভাবেই অনেকক্ষণ দৃষ্টিখানি স্থির রাখে অগ্নির শরীরে। একসময় বলে, যা, ভাল কইরে গেলাস ধুয়ে, এক গেলাস জল লিয়ে আয়।

—হাঁ, ভাল কইরে গেলাস ধুয়ে জল লিয়ে আয়।

অগ্নি পায়ে পায়ে ফিরে যায়, পায়ে পায়ে ফিরে আসে। জলের গেলাসখানি নামিয়ে দেয় মাটিতে। পিছু ফিরলেই প্রভঞ্জন ফের ডাক পাড়ে, অগ্নি, শুন।

অগ্নি থমকে দাঁড়ায়।

—একটা পান সেজ্যে আন তো।

—হাঁ, পান সেজে আন তো।

অগ্নি পায়ে পায়ে ফিরে যায। পেছন থেকে গজেন বলে ওঠে, এলাচদানা দিবি।

এইভাবে নানা অছিলায় প্রভঞ্জন অগ্নিকে ধরে রাখতে চায় নিজেদের কাছে। চোখে চোখে বেঁধে রাখতে চায়, যতক্ষণ সম্ভব।

মাছের পোনাগুলো যখন হাতেব চেটো সাইজ হল, প্রভঞ্জন গজেনকে দিয়ে সেই মাছ ধরাল একদিন। বলল, এই লে টাকা, বেশি কইরে তেল কিনে আনবি। সইন্ধ্যাবেলায় মাছভাজা দিয়ে জমবেক।

সেই শুরু। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পদম পুকুর থেকে চারাপোনা তুলে মচ্ছব চলছে। গজেন জাল ফেলে বিকেলের দিকে। অগ্নি সেই মাছ ভেজে দেয়। সারা সন্ধ্যে মাছভাজা সহকারে মদ খায় প্রভঞ্জনের দল। যেদিন স্বপনরা থাকে না, প্রভঞ্জন আর গজেন দু'জনেই বসে বসে অনেক রাত অবধি খায়। অগ্নি পাশের ঝুপড়িতে কাঠ হয়ে বসে থাকে।

অল্পখানিক পেটে পড়লেই মুখ খুলে যায় প্রভঞ্জনের। সে তখন অবিরাম বকবক করে কত কিছু বলে চলে। কত আস্ফালন, প্রলোভন,- হামবড়া কথা সব। আর মাঝে মাঝে অগ্নিকে চোখের সামনে পেতে চায়।

ইদানীং অন্তরে বড় আঘাত পেয়েছে গজেন। আঘাতটা শরীরে যত না, মনে তার চেয়ে বেশি। মাসটাক আগের ঘটনা, কিন্তু এখনও অবধি ভুলতে পারে নি। মাঝে মধ্যেই একান্ত মানুষজনের কাছে চোঁয়া-ঢেঁকুর তোলে ঐ নিয়ে।

দাপানজুড়ির সাঁতাল পাড়ায় ইদানীং গজেনের আনাগোনা বেড়েছিল খুব। সেখানে নাকি খুব গরু-ছাগল বেচছে লোকজন। গজেন গরু-ছাগল কিনতে যেত, নাকি সাহেব টুডুর বউটাকে দেখতে যেত সে ব্যাপারে এলাকার মানুষের ঘোরতর সংশয় রয়েছে। কবে নাকি দাপানজুড়ির জঙ্গলে সাহেব টুডুর বউয়ের ছাগল ছানাটিকে তাড়া করেছিল হুঁড়ার। সাহেব টুডুর বউ তো হুঁড়ার দেখেই ভয়ে আধমরা। গজেন তখন গরুর খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরছিল ভড়া থেকে। অপরিসীম বীরত্ব দেখিয়ে, লাঠি-ফাটি আছড়ে, হুঁড়ারকে তাড়িয়ে সে উদ্ধার করেছিল ছাগল ছানাটিকে। সেই থেকে আলাপ। আর আলাপ হওয়া মাত্রই, গজেন বাউরির বিশ্বাস জন্মাতে লাগল, দাপানজুড়ির সাঁতালপাড়ায় বহু মানুষ

গরু-ছাগল বেচতে চায়, লেগে থাকতে পারলে দম্মে ব্যবসা হবে। আর, ঘরে ঘরে গরু-ছাগল খুঁজে খুঁজে থকে গেলে তৃষ্ণার্ত গজেন সাহেব টুডুর ঘর ছাড়া কার উঠোনেই বা দু'ঢোক জলের জন্য গিয়ে দাঁড়াবে। কার সঙ্গেই বা তার অতখানি ঘনিষ্ঠতা যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উজমুদ্দা 'জল খাব' বলে হাজির হওয়া যায়! তার বউয়ের ছাগল ছানাকে সে কিনা নিজের কলিজা বাজি রেখে বাঁচিয়েছে হুঁড়ারের হাত থেকে। এইভাবে গরু খুঁজতে খুঁজতে, জল খেতে খেতে, উঠোন থেকে দাওয়া, দাওয়া থেকে কুঠরির ভেতর অবধি সেঁধিয়ে গিয়েই একদিন সাহেব টুডুর কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় সে। আর, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে সাঁওতাল সমাজে যে বাড়াবাড়ি বকমের স্পর্শকাতরতা, তা গজেনই বা বুঝবে কী করে! সারা পাড়া যে খবর পাওয়া মাত্তর সাহেব টুডুর ঘরখানিকে এমন চারপাশ থেকে শিকাব ধরবার কায়দায় ঘিরে ফেলবে, সেটা তো গজেনের স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রভঞ্জনদের কাছে যখন খবর পৌঁছুল, তখন ঠায় দুপুর। অগ্নি ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে ছিল, প্রভঞ্জনরা পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা মারছিল, হেনকালে দাপানদুড়ির কামদেব দত্তর মুনিশটা এসে খবরখানা দিল।

সাঁইসাঁই সাইকেল চালিয়ে প্রভঞ্জনদের দল সাঁতালপাড়ায় পৌঁছে দেখে গজেনকে একটা নিমগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, আব সাঁতালপাড়ার অর্ধেক মানুষ ঘিরে বয়েছে জায়গাটা। ক্ষিদেয়, তেষ্টায়, ভয়ে, ভাবনায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে গজেনের মুখখানি। সারা গায়ে অজস্র লাঠিপেটার দাগ। শরীরেব দু'এক জাযগায় কালচে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছে।

সারা দুপুর, বিকেল জুড়ে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে, খানিকটা সিংহগড়ের প্রভাব, খানিকটা কামদেব দত্তর প্রতিপত্তি, এবং সর্বোপরি জরিমানা বাবদ সারা পাড়াকে একমণ চাল এবং যথেষ্ট পরিমাণ মদ এবং মাংসের টাকা নগদে মিটিয়ে সে যাত্রা গজেনকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল প্রভঞ্জনরা। কিন্তু সাঁওতাল রমণীর ইজ্জত নষ্ট করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে যে পাষণ্ড, সাঁওতাল সমাজ তো তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিতে পারে না। মদ-মাংসের ভোজ পেলেও নয়। তাদের সামাজিক আইনেই আটকে যায় সেটা। সাঁওতাল সমাজের আইন মোতাবেক অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ষণকারীকে তীর বিঁধে মারতে হয়। এক্ষেত্রেও তো তার ব্যত্যয় হতে পারে না। মদ-মাংসের ভোজ এবং বাবুদের অনুরোধে গজেনকে না হয় প্রাণে নাই মারা হল, কিন্তু সামাজিক আইনটার গায়ে তো একেবারে মুতে দেওয়া যাবেক নাই। কাজেই আবার মুরুব্বিদের বৈঠক বসে। কামদেব দত্ত মোড়ল গোছের দু'একজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশটা করে টাকা গুঁজে দেয় ওদের হাতে। ফলে, তাদের মাথা থেকে এমন এক বুদ্ধি বেরোয় যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সেই অনুযায়ী, গজেনকে নিমগাছটার আড়ালে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং নিজের মেয়ামানুষের ধর্ষণকারীকে তীর দিয়ে বেঁধার অধিকারী হিসেবে ধনুর্বাণ তুলে দেওয়া হয় সাহেব টুডুর হাতে। সে অনেক কসরৎ করে, অনেক ভাবে নিশানা স্থির করে রাবণ বধরত রামচন্দ্রের ভঙ্গিমায় তীর ছোঁড়ে এবং সেই তীর অব্যর্থ নিশানায় নিমগাছটিকে বিদ্ধ করে।

গজেন বাউরি নিমগাছের আড়ালে দু'চোখ মুদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশ পাতার মতো কাঁপতে থাকে।

সেই বিকেলে সাহেব টুডুর হাতে গজেনের প্রতীকী মৃত্যু ঘটেছিল। সারা অঙ্গে জমাট রক্তের দাগ বহন করে সে শেষ বেলায় ফিরে এসেছিল পদম দীঘির পাড়ে।

রক্তের দাগ মুছে গিয়েছে, লাঠির দাগও অদৃশ্য, কিন্তু গজেনের মনের ক্ষতটা আজও অবধি দগদগে। পেটে দু'টোক পড়লেই ক্ষতস্থানে প্রদাহ শুরু হয় এখনও। প্রভঞ্জনকে নিজের মানুষটি ভেবে উগরে দেয় মনের যাবতীয় আক্ষেপ, জান, পভঞ্জনদা, শালীটাকে ভোগ করে মার খেইলে আমার কুনো দুঃখু ছিল নাই। শিকারটি পালাল্যাক, আর আমি শুধুমুধু পায়ে গাদাগুচ্ছেক কাঁটা ফুটিয়ে ল্যাংচে বেড়াল্যম, এই দুঃখুটাই ভুইল্‌তে লারি।

প্রভঞ্জন গজেনের দুঃখটাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। বলে, আমারও কি কম দুঃখু রে গজা, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ কইর্‌ছি দিনের পর দিন, অথচ লাভের বেলায় লবলঙ্কা। কাঁদিস নাই, আমি তুয়াকে ভাল মেয়া জুটাই দুবো। শালা, পইসা ছড়ালে ফের এ দুনিয়ায় মেয়ার অভাব।

২৭. যার জন্য চুরি করি

চুয়ামসিনার লঙ্গরখানা চলছে দুটো।

একটা চালাচ্ছে প্রভঞ্জনের পরিচালনায় 'মিতালি সংঘ', অন্যটা অরুন্ধতীর পরিচালনায় নিবেদিতা মহিলা সমিতি। দুটোরই দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে বুদ্ধদেব।

চালে-ডালে ফুটিয়ে লপসি মতো। তারই দু'হাতা করে পাচ্ছে উপোসী মানুষ। তাও সবাই নয়। এক-একটি লঙ্গরখানায় তিনশোজনের খাদ্য বরাদ্দ। অথচ চুয়ামসিনা, শালকাঁকি, লোখেশোল, এবং সংলগ্ন বাউরি-বাগদি, শিকারি, লোহারপাড়া মিলিয়ে কয়েক হাজার প্রত্যাশী মানুষ। তাদের থেকে হরবল্লভ বেছে বেছে লিস্টি বানিয়েছেন ছ'শোজনের। অধিকাংশই তাঁর পদানত মানুষজন।

দিন কয়েক ধরে ক্রমাগত অভিযোগ আসছিল, লপসি নাকি ক্রমশই পাতলা হচ্ছে। দু'হাতাই দিচ্ছে বটে, কিন্তু তার দেড় হাতাই জল। তাবাদে ছ'শোজন পাচ্ছে না। দু'টো লঙ্গরখানা মিলিয়ে চারশো-সাড়ে চারশো না পেরোতেই বলে দিচ্ছে, মাল শেষ। আর কেউ পাবেক নাই।

ভরদুপুরে বৈঢ্যা থেকে ফিরছিল বুদ্ধদেব। সেখানেও একটা লঙ্গরখানা চলছে। সকাল থেকে ছিল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া চুকেবুকে যাওয়ার পর, এই এতক্ষণে ফিরছে।

আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ চলছে। মাথায় পুরু করে গামছা জড়িয়েছে বুদ্ধদেব। ঢেকে নিয়েছে বারোআনা মুখ। পকেটে রেখেছে আস্ত পেঁয়াজ গোটা দুই। সানস্ট্রোক এড়ানো যায় তাতে। পদম পুকুর পেরিয়েই দেখতে পায় সেই দৈনন্দিন দৃশ্য। মাথার ওপর সূর্যদেব বিষবাতি হয়ে জ্বলছেন। গনগনে মাকড়া পাথরের ডিহির ওপর পাত পেড়ে বসেছে না হোক অন্তত হাজার খানেক উদোম মানুষ। তীর্থের কাকের মতো ক্ষণ গুণছে। কখন মিলবে দু'হাতা জল-জল লপসি। যদিও এরা জানে, সবাইয়ের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়বে না, তবুও

আশায় আশায় বসেছে, যদি বাবুদের কৃপা হয়। বুদ্ধদেব কল্পনা করে, আর কিছুক্ষণ বাদেই লপসি বিতরণ শুরু হবে। শুরু হবে এবং জমায়েতের সিকি মানুষ না পেতেই শেষ হয়ে যাবে। ক্লাবঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রভঞ্জন কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলবে, মাল শেষ। আর কেউ পাবেক নাই। সঙ্গে সঙ্গে হল্লা উঠবে সারা ডাঙা জুড়ে। চিৎকার চেঁচামেচি, ধমকানি-তড়পানি, সবকিছু মিলেমিশে সে এক সমবেত রোদন। প্রভঞ্জনের দল তিলমাত্র গায়ে মাখবে না সেই কলরব। তারা ক্লাবঘরে তালা লাগিয়ে ফিরে যাবে যে যার ঘরে। মানুষগুলো তাও ঠায় বসে থাকবে তপ্ত ডাঙার ওপর।

থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে গরম ঝলা বাতাস। পুড়িয়ে দিচ্ছে মুখ এবং শরীরের অনাবৃত অংশ। বুদ্ধদেব জোরে জোরে প্যাডেলে চাপ দেয়। হাঁপরের মতো হাঁফায়। 'মিতালি সংঘ'র সামনে এসে যখন পৌঁছোয়, রান্না তখনও চলছে। দুটো মাঝারি কড়াইতে লপসি টগবগিয়ে ফুটছে।

—কত চাল চড়েছে আজ?

অধর ঝারমুনিয়ার ছোট ব্যাটা গজানন লঙ্গরখানায় রাঁধুনির জোগাড়দারের কাজ পেয়েছে। প্রভঞ্জনদের খাস-আদমি সে। উনুনের পেটে কাঁটাখোঁচা পুরতে পুরতে জবাব দেয়, লিত্যিদিন যা চড়ে।

নিয়ম মতো প্রতিটি লঙ্গরখানায় চালে-ডালে তিরিশ সের রান্না হওয়ার কথা। কিন্তু ক'দিন ধরে লক্ষ করছে বুদ্ধদেব, পনের সের রান্না হচ্ছে কিনা সন্দেহ। গতকাল প্রভঞ্জনকে লঙ্গরখানার হিসেবের খাতা চেয়েছিল বুদ্ধদেব। প্রভঞ্জন না শোনার ভান করে চলে গেছে। আজকে হিসেবটা না দেখে যাবে না বুদ্ধদেব।

গজানন ঝারমুনিয়ার জবাবের মধ্যে কর্কশতা ছিল। ঔদ্ধত্যও।

বুদ্ধদেব ততোধিক কর্কশ গলায় বলে, প্রতিদিন কত চড়ে সেটাই তো জানতে চাইছি।

গজানন মুখ তুলে তাকায়। সারা মুখ কঠিন হয়ে আসে। যান্ত্রিক গলায় জবাব দেয়, চালে-ডালে তিরিশ সের।

—এই দুটো কড়াইতে তিরিশ সের চাল-ডাল রয়েছে?

গজানন জবাব দেয় না। যেন শুনতেই পায় নি। খুব নির্লিপ্ত মুখে কাঠকুটো আনতে চলে যায় ক্লাবঘরের পেছনে।

অল্প তফাতে দাঁড়িয়েছিল হাঁদা মুর্মু। বুদ্ধদেবকে দেখতে পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। পেছনে জনাকয় শীর্ণ হাড় জিরজিরে মানুষ। অতলস্পর্শী কোটরের মধ্যে হাঁদা মুর্মুর চোখদুটো দপদপ করছিল। বুদ্ধদেবের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। চোখে চোখ রেখে বলে, আমাদ্যার একটা আজ্জি আছে রামসেবকবাবু।

বুদ্ধদেব হাঁদা মুর্মুকে নিষ্পলক দেখছিল। এবার তাকায় পেছনের মানুষগুলোর দিকে। কোঁকড়ানো কালো চামড়ার আড়ালে খানকয় হাড়ের একটা জোড়াতালি কংকাল। চোয়ালের ওপরে গভীর গর্ত। তার মধ্যে জীবন্ত একজোড়া চোখ। নড়ে চড়ে।

—বল। বুদ্ধদেব প্রস্তুত হয়।

—এ লঙ্গরখানা কাদের লেইগে বাইনেছে বটে গরমেট?

—কেন? হঠাৎ এমন প্রশ্ন?

—একি কত্তাবাবুদের ভাতুয়া, বারমাসিয়া, মুড়িভাজনি, গুয়ালকাড়ুনিদের তরে? হাঁদা মুর্মু উত্তেজনায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল। কোটরের ভেতর থেকে চোখজোড়াকে এক ঝাঁকুনিতে তুলে এনে বলে, আমরা কি তবে এমন কইরেই মইর্‌ব?

মরছে। এখানে ওখানে দু'চারজনের মৃত্যুর খবর আসছে। এইতো গত পরশু মারা গেছে লায়েকবাঁধের হস্তী লায়েক। অখাদ্য জংলি শাকপাতা খেয়ে মরেছে লোখেশোলের কুঞ্জ শিকারি। শুধু এই অঞ্চলেই নয়, মানুষ মরেছে অবন্তিকায়, হিংজুড়িতে, কাওয়াশোলে, ঘুঘিমুড়ায়...। মরবার কথাটা তাই হাঁদা মুর্মুর অভিমানের কথা নয়। নির্মম বাস্তব এক ভবিষ্যতবাণী করে ফেলেছে হাঁদা। অথচ বুদ্ধদেব জানে, এসব মৃত্যুকে অনাহারজনিত বলা চলবে না কিছুতেই। সরকারের আইনেই মানা রয়েছে। এদেশে অনাহারে মরতে পারবে না কেউ। সেটা বেআইনী। কাজেই এ ধরনের মৃত্যুকে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু বলতে হবে। ডেথ ডিউ টু ম্যাল-নিউট্রিশন। এমনি একটা রিপোর্ট দিয়ে প্রায় ফাঁসতে বসেছিল উলিয়াড়ার গ্রামসেবক জগদীশ দাস। বিডিও সাহেব তাকে নিজের চেম্বারে ডাকিয়ে যা নয় তাই বলেছিলেন। অনাহারে মর্‌সে লিখ্‌ছস্‌, তুমি কী কইর‍্যা জান্‌লা সেটা? তুমি ডাক্তার? তুমি অর প্যাটেব মইধ্যে ঢুক্‌সিলা? তবে? অর প্যাটের মইধ্যে যে খাইদ্য নাই, সেটা কি খড়ি পাইত্যা জান্‌লা?

হাঁদা মুর্মুর কথার কী জবাব দেবে ভেবে পায় না বুদ্ধদেব। হাজার হাজার উপোসী মানুষেব মধ্যে দু-আড়াইশো জনকে দু'হাতা পাতলা লপসি দেবার ব্যবস্থাকে আগাগোড়াই প্রহসন মনে হয়েছে তার। এ বড় করুণ অবস্থা। ভাবতে গেলে ঘেন্না হয়। চোখ ফেটে জল আসে। নিজেদের প্রতি এক ধরনের তীব্র বিতৃষ্ণায় ভরে যায় বুক। বিডিও সাহেবকে কথাটা বলেছিল সে। শুনে তাঁর মুখের একটি রেখাও বদলায় নি। বরং তীব্র শ্লেষে বলেছিলেন, শুন্‌সি, তুমি নাকি বড়লোকের একমাত্তর পোলা। যাও না, বাবাকে বলে শ'দুই বস্তা চাল লইয়া আস না। গভর্নমেন্টের এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা নাই গা। ফুডে সিলাম ত, গভর্নমন্টের ইস্টক পজিশন ভালই জানি। ফুটন্ত কড়াইয়ের ওপর চোখ চারিয়ে পরখ করে বুদ্ধদেব। মাল যা রয়েছে, শ দুই-আড়াই মানুষ দু'হাতা করে পাবে। সিংহগড়ের ভেতরে অরুন্ধতীদের লঙ্গরখানায় নাকি দেড়শোর বেশি পাচ্ছেই না।

হাঁদা মুর্মুর চোখের ওপর চোখ রাখে বুদ্ধদেব। পরমুহূর্তেই নামিয়ে নেয়। বিড়বিড় করে প্রায় সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর গলায় বলে, আমি দেখছি। আমি চেষ্টা করছি। তার বেশি আমি কিছু পারি না। আমি সামান্য গ্রামসেবক।

শেষের দিকে গলাটা ধরে আসে বুদ্ধদেবের। তাই দেখে হাঁদা মুর্মু ঈষৎ বিচলিত বোধ করে। তার কড়া কথাতেই ভাল রামসেবকবাবুটা দাগা পেলেন এমন ধারণাবশত তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। খুব স্খলিত গলায় বলে, আমি তো কিছো কই নাই আইজ্ঞা, শুধু বলছিল্যম্‌, ইয়ারা না খেতে দিলে মইরে যাব। হাঁদা মুর্মুর কোনও কথায় যে আহত

হয় নি বুদ্ধদেব, যে তীরে সে বিদ্ধ হয়েছে তা ছুটে এসেছে অন্য তূণ থেকে, উপস্থিত এত কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। হাঁদা মুর্মুর থেকে পালানোর মুদ্রায় সে ঝটিতি ক্লাবঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এমন অসময়ে বুদ্ধদেবকে দেখে সামান্য বিস্মিত হয় প্রভঞ্জন। মুহূর্তের জন্য মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে কেঠো হাসি হেসে শুধোয়, কী ব্যাপার? এ সময়ে যে বড় গ্রামসেবকবাবুর আগমন? সান-খাওয়া হবেক নাই? নাকি এই লঙ্গরখানায় দু'হাতা—। দাঁত বের করে খ্যাকখ্যাক করে হাসতে থাকে প্রভঞ্জন।

বুদ্ধদেবের গা জ্বলে যাচ্ছিল অসহ্য রাগে। তাও নির্বিষ গলায় বলে, প্রতিদিন কত চাল রান্না হচ্ছে প্রভঞ্জনবাবু? সব মানুষ পাচ্ছে না কেন?

প্রভঞ্জন বুদ্ধদেবের প্রথম প্রশ্নেব জবাবটা এড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নেব খেই ধরে বলে, সরকারের এই নামমাত্র রিলিফে দুনিয়ার সব লোক খাব্যেক কী করে? সেই বলে না, একটাকায় কিনল্যম খাসি, লোক হয়্যেছে বারোশো আশি। সব্বাই বলে খাবেকখাবেক, কে কতটা ভাগে পাবেক! জুতসই একখানা শোলোক আউড়াতে পেরে প্রভঞ্জন আত্মপ্রসাদে হাসে।

—চালে-ডালে তিরিশ সের তো কম নয়।

—কম হোক, বেশি হোক, রান্না হচ্ছে, বিলি হচ্ছে, আমি তো একহাতা খাচ্ছি নাই ইয়ার থিকে। অসম্ভব কর্কশ গলায় জবাব দেয় প্রভঞ্জন। আপনি যখন আইছেন, ভাগ-বাটোয়ারা করে খাবাই দিয়ে যান না আজ। দেখি।

—তিরিশ সের চড়ানো হয়েছে?

এ কথায় সহসা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে প্রভঞ্জন। বোমার মত ফেটে পড়ে, কী বইল্‌তে চান আপনি, পষ্ট কইরে বলুন তো? আমি কি চাল-ডালগুলা ঘরে লিয়ে যাচ্ছি? আমি কি চোর? বলতে বলতে ঠোঁটজোড়া ভেঙে দুমড়ে যায় প্রভঞ্জনের, উই সবকাবি গুদামের গুমা চাল আর পোকায় কাটা ডাল সিংহগড়ের গরুগুলানও খাবেক নাই।

বুদ্ধদেব খবর পেয়েছে, চাল-ডালের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে রাসবিহারীর নিজস্ব দোকানে। যারা এখনও এক-আধ সের কিনতে পারছে, ঐ মালই সামান্য কম দামে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষগুলোর প্রতি তীব্র ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা অনেকদিন ধরেই জমছিল বুকের মধ্যে। আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না বুদ্ধদেব। বলে ওঠে, চোর-সাধুর তফাতটা আর সাদা চোখে ধরা পড়ে কই প্রভঞ্জনবাবু! সে কথা থাক। আইনত এই লঙ্গরখানার অফিসার-ইনচার্জ আমি। এর হিসেবপত্তর, জমাখরচ সবকিছু আমাকে দেখাতে আপনি বাধ্য। কালও বলেছিলাম, আজও বলছি, হিসেবের খাতাটা একবার আনুন। আমি দেখতে চাই।

প্রভঞ্জনের চোখমুখ ক্রোধে লাল হচ্ছিল ক্রমশ। কপালের শিরা ফুলে চিতি সাপ। ঝাঁঝালো গলায় বলে, আপনি যে মশাই নবাব-বাদশার মতন হুকুম কচ্ছেন! এই ভরদুফোরে এতগুলান মানুষকে আকাট রোদ্দুরে ঠায় বসিয়ে বেখে আপনাকে হিসাব বুঝাতে হবেক?

আচমকা অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে ওঠে প্রভঞ্জন, গরীব মানুষকে কি আপনি কুকুর-শিয়াল ভাবেন?

ওদের বচসার মধ্যে বহু মানুষ দরজার বাইরে এসে ভিড় জমিয়েছে। শুনছে বাবুদের কথা কাচাকাচি। কোটরের মধ্যে চোখগুলো দপদপিয়ে জ্বলছে। প্রভঞ্জনের শেষ কথাগুলি সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয় তৎক্ষণাৎ। জমায়েতের মধ্য থেকে কর্কশ গলায় কলরোল ওঠে, হিসাব-নিকাশ লিয়ে রঙ্গ পরে হব্যেক হে, ইখন খাইদ্য দ্যান মাইন্‌ষের মুখে। পরান যায়।

—উসব হবেক নাই। প্রভঞ্জন চিৎকার করে বলতে থাকে, তুয়ারা মর্। জাহান্নামে যা। আগে আমি হিসাব বুঝাব, তারপরে অন্যকথা। আর, হিসাব বুঝিয়েই ছুটি লিব এ কাজে। ঢের হয়েছে। সিংহবাবু-বংশের ছেইলা হয়ে চোর অপবাদও লিতে হইল্যাক। বলতে বলতে এমনই একখানা নিদারুণ-ব্যথা-পাওয়া-মুখ বানিয়ে ফেলে মুহূর্তে, বুদ্ধদেবও হকচকিয়ে যায়।

একটা পাঁচমেশালি রোল উঠেছে জমায়েতের মধ্যে। ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে সেটা। এই রামসেবকটার জন্যই যে খাবার পেতে দেরি হচ্ছে, ওর জন্যই যে লঙ্গরখানাটা কাল থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই সব পাঁচমেশালি আশঙ্কা একেবারে কাবু করে ফেলে লোকগুলোকে।

দু'চারজন চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। সরাসরি বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, হইত্তে পার তুমি সরকারি লোক, তা বলে ইট্যা একটা হিসাব মাগবার টাইম হইল্যাক বটে। একটা আক্কেল নাই তুমার?

—লিজ্যার পেট তো ভর্তি, অন্যের ভোখের জ্বালা বুঝবেক কি?

—অত বড় বংশের ছেইলাটাকে তুই ঝাঁ কইর‍্যে চোর বইলে দিলি, কুনো পর্‌মাণ আছে তুয়ার হাতে?

দু'একজন এগিয়ে এসে প্রভঞ্জনকে প্রবোধ দিতে থাকে, তুমি উয়ার কথায় কান দিও নাই প্রভঞ্জনদা। রাজার মাকে ডাইন বইল্‌লে রাজার মা'র কিচ্ছোটি নাই হয়।

প্রভঞ্জন কথা বলে না। বিষাদমূর্তি হয়ে বসে থাকে ঠায়।

বুদ্ধদেব লক্ষ করে, জমায়েতের মধ্যে যারা অধিক রুদ্রমূর্তি ধরেছে, তাদের কেউই হরবল্লভের লোক নয়। বরং যাদের জনাকয়েককে বুদ্ধদেব প্রায় ঝগড়া করে লপসি-প্রাপকদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে, এরা তারাই। এরা সাধারণভাবে সুকুমার আচার্যর লোক এবং বুদ্ধদেবকে মান্য করে। লপসি-প্রাপকদের তালিকায় নাম নেই এমন জনাকয়ও খুব তড়পাচ্ছে। খুব সম্ভব, নিদারুণ খিদের জ্বালায় এবং তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশায় তারা প্রভঞ্জনকে তুষ্ট করতে চাইছে।

বুদ্ধদেব স্থির পলকে দেখছিল লোকগুলোকে। অপমানে পুড়ে যাচ্ছিল বুক। ধীর গলায় বলে, হিসেবটা তাহলে কখন দেখতে পাব? বিকেলে?

—আমরা, এই 'মিতালি সংঘ'র ছেইলারা আপনার চাকর লয়, বুঝলেন? প্রভঞ্জন

আব এক প্রস্থ গলা চড়ায়, সকাল থিকে কাজে নেমেছি। এখন তক্ক কারো পেটে এক ঢোক জল পড়ে নাই। এসব ঝামেলা চুকতে তিনটা বেজে যাবেক। তারপর যে-যার ঘরে গিয়ে সান-খাওয়া সারতে সইন্‌ধা। কী করে হিসাব দেখাব বিকালে? আপনার বিবেচনাটা কী বলে?

বুদ্ধদেব কী বলবে ভেবে পায় না। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেশিক্ষণ এই নিয়ে রাশি টানাটানি করতে ইচ্ছে করে না। যাদের জন্য লড়ছে সে, তারাই এখন প্রভঞ্জনের পক্ষ নিয়েছে।

বুদ্ধদেবকে নীরব থাকতে দেখে প্রভঞ্জন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। গলায় তীব্র শ্লেষ ঢেলে বলে, নামে তো অফিসার-ইনচার্জ, দিনের মধ্যে একবারও তো মুখ-ভেটও দেন না। ছেইলাগুলান যে কী কচ্ছে, কী করে যে এ মহাযজ্ঞ সামলাচ্ছে, ভুখা মানুষগুলান যে কী খাচ্ছে, না খাচ্ছে, সে সব দেইখ্‌বার তো সময় হয় না আপনার! মাঝে মইধ্যে, ভিড়-ভাট্টার সময়টি বুঝে, আসেন আর ঝামেলা পাকান। ফোঁচ করে নাকটা দু'বার ঝেড়ে নেয় প্রভঞ্জন, সেই বলে না, ভাত দিবার ভাতার লয়, কিল মাইর্‌বার গুঁসাই!

এসব কথার কী জবাব দেবে বুদ্ধদেব। তার কানদুটো নিঃশব্দে পুড়তে থাকে। সারা এলাকায় বেশ কয়েকটা লঙ্গরখানা চলছে। মাটি কাটার কাজও চলছে কিছু কিছু। জি-আর বিলি হচ্ছে প্রায় প্রতিটি গাঁয়ে। দুর্গতির কথা জানিয়ে দরখাস্ত আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিতে হচ্ছে। ঐসব নিয়ে দিনভর চতুর্দিক চষে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। সবদিকে তাল রাখতে গিয়ে একেবারে হিমসিম খাচ্ছে। কিন্তু এসব কথা প্রভঞ্জনকে বলে লাভ নেই। জমায়েতের এই মানুষগুলোও বুঝবে না। তাদের এখন পেটের মধ্যে শকুনের ছানারা কান্না জুড়েছে। এখন, যে কোনও উপায়ে, যে কোনও মূল্যে কিছু খাদ্য চাই ওদের।

প্রভঞ্জন তর্জনী তাক করে বুদ্ধদেবের দিকে, শুনুন বুদ্ধুবাবু, রোজ রোজ এসে যদি অমন ঝামেলা করেন তো লঙ্গরখানা বন্ধ কইর‍্যে দুবো আমরা। মাইন্‌ষের উপ্‌কার করতে এসে, কারুর পাশ খত্‌ লিখে দিই নাই।

প্রভঞ্জনেব কথাগুলোর শক্তি যে কতখানি তা পরমুহূর্তেই মালুম হয়। লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলো স্পষ্টতই হিংস্র হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল বাখান জোড়ে ওরা। বুদ্ধদেব ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল, দুঃখে, অপমানে...। তার মধ্যেও সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায়, শুধুমাত্র একটুখানি প্যাঁচ কষবার উদ্দেশ্যেও যদি প্রভঞ্জনের দল দু'এক দিনের মতো বন্ধ রাখে লঙ্গরখানা তো তার ফল বুদ্ধদেবের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। শূন্য উদর কোনও নীতি মানে না, রীতি মানে না। সহসা নিজেকে ব্যূহমধ্যে অভিমন্যুর মতো মনে হয় বুদ্ধদেবের।

মানুষগুলো সমানে চেঁচাচ্ছিল দরজার বাইরে। বুদ্ধদেব তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে করে নিঃশব্দে চলে আসে বাইরে। তখন নিঃশেষে আগুন ঝরছিল আকাশ থেকে। সেই বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভিজতে ভিজতে হাঁটতে থাকে বুদ্ধদেব, তরল আগুনের ফোঁটাগুলো ফুটন্ত গুড়ের মতো লেপটে যায় তার শরীরে, মনে....।

২৮. হলুদ রঙের লপসি এবং পোলাও

ঠায় দুপুরে তিনখানা সুসজ্জিত গরুর গাড়ি এসে থামে সিংহগড়ের সুমুখে।

গাড়ি থেকে নামেন হরিসাধন বটব্যাল, এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। নামানো হয় তাঁদে যাবতীয় মালপত্তর, ফাইল, দলিল-দস্তাবেজ, মৌজা ম্যাপ, জরিপের চেন এব আনুষঙ্গিক যাবতীয় সামগ্রী। নামেন পেশকার, আমিনেরা। রতিকান্তর নির্দেশে সবকি চলে যায় কাচারি ঘরের একদিকে, আর সাহেবরা অন্যদিকে। সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষ করছিল গাড়ুভর্তি জল, নতুন গামছা, পাখা হাতে মাকুন্দ শিকারি, ঘোলের ঠাণ্ডা সরবত রেকাবিভর্তি পান, মসলা, পাশিং-সো সিগারেট...। হরবল্লভ স্বয়ং বসেছিলেন এস নৈবেদ্যাদি সাজিয়ে। গাড়ি পৌঁছুতে দেরি হচ্ছিল দেখে ক্রমশ উতলা হয়ে উঠছিলে তিনি। কানাঘুষোয় শুনছিলেন, হরিসাধন নাকি আসবেন না। তিনি নাকি ছুটিতে যাবেন তাঁর বদলে নাকি বদন ঘোষ আসবেন। বদন ঘোষ টেঁটিয়া আদমি। তাঁর খাঁইও বিশাল এবং তা ঘন্টায় ঘন্টায় বদলায়। হরিসাধনবাবুর আচারে-ব্যবহারে, এমন কি উৎকোচ নেবা মধ্যেও এক ধরনের বনেদিয়ানা রয়েছে। বদন ঘোষ যেমন আদেখ্‌লার মতো ঝাঁপি পড়ে গোগ্রাসে খায়, দেখতে দেখতে হরবল্লভের মনে পড়ে যায় ফি-বছর দুর্গাপূজা অষ্টমীর রাতে কাঙালি-ভোজনের দৃশ্যখান। বন্ধ করে দিয়েছেন এবছর থেকে। শাল অকারণে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। তাছাড়া, লোকও কী হারে বাড়ছে দিন দিন! এক একা বাউরি-বাগদি পাড়ায় ইদানীং যেন গিজগিজ করে মানুষ। জমিদারি চলে গেল। আয় উপায় কমছে। জিনিসপত্রের দামও আর আগের জায়গায় থেমে নেই। অরুন্ধতী অনেকদি ধরেই বন্ধ করে দিতে বলছিলেন। হরবল্লভ তাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন মূলত বাপ প্রতাপলালে কথা ভেবে। বুড়ো বয়সে তাঁর গুমোরে ভারি লাগত। গেল-বছর প্রতাপলাল মারা গেলেন সেই বছরই হরবল্লভ বন্ধ করে দিয়েছেন ঐ ভূত-ভোজনের ব্যাপারখানা। পাড়ায় পাড়া জানিয়ে দিয়েছেন, এবচ্ছর আর অষ্টমীর রাতে পংক্তি ভোজন হব্যেক নাই। তাও বহু মানুষই এসেছিল আশায় আশায়। আজীবনকালের অভ্যেস অত সহজে কি যায়? ব্যবস্থ যা দেখে গেছে, সামনের বছর নিশ্চয়ই আরও কমবে। তখন মূলত থাকবেন আমন্ত্রি ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা থাকবেন। যে সব আমন্ত্রিতদের ডাকা হয়, কোন না কোনও স্বার্থে সম্পর্ক থাকে তাঁদের সঙ্গে। থানা, বিডিও অফিস, জেলারো অফিস, এস-ডিও অফিস ইদানীং যুক্ত হয়েছে সেট্‌ল্‌মেন্ট অফিস। বিষ্টুপুর থেকে আসেন সিদ্ধেশ্বর হাজরা, রামকমল চক্রবর্তী, পল্টু হাজরার মতো নেতারা, সেটাও এক কিসিমের স্বার্থ। চারপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে আসেন মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ, সেটাও এক কিসিমের দুর্গরক্ষার স্বার্থ। কিছু ফালতু মানুষকে অকারণে নেমন্তন্ন করা হয় পুরুষানুক্রমে। হরবল্লভ বুঝতে পারেন না, এদের দিয়ে কী উপকার হয় সিংহগড়ের। সামনের বছর থেকে বন্ধ করে দেবেন ওদের নেমন্তন্ন

হরিসাধনকে মাঝ উঠোনে দেখে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ান হরবল্লভ। স্মিতহাস্যে এগিয়ে যান উঁচু বারান্দার প্রান্ত অবধি। হরিসাধন প্রায় গদগদ হেসে উঠোন থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, কেবল চুয়ামসিনা বলেই 'না' করতে পারলাম না। কেবল আপনার কথা ভেবেই

নইলে...। হরবল্লভ প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতার হাসি হাসেন। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে আসেন হরিসাধন। হরবল্লভ আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন দু'হাত, আসুন, আসুন, খুবই কষ্ট হয়েছে। ঘেমে গিয়েছেন।

বৈঠকখানার গা ঘেঁষে তিনখানা ঘর তকতকে পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিলেন হরবল্লভ। চৌকি-টৌকি পেতে, বিছানা-টিছানা দিয়ে একেবারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। পাগল শিকারিরা হাতাহাতি করে বাবুদের মালপত্তর গুছিয়ে গাছিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে। হরিসাধনবাবুরা আবাম করে বসেন ভারি কেদারায়। মাকুন্দ শিকারি হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে মাথাব ওপর। দইয়ের শববত ধরে দেয় রতিকান্ত। শরবত পান করতে করতে ওরা মেতে ওঠেন খরা পরিস্থিতি নিয়ে।

গেল-বর্ষায বলতে গেলে বৃষ্টিই হয় নি। আমন চাষ হয়েছিল নামমাত্র। মাঘ-ফাগুনেও তিলেকের তরে আকাশের বুক ফাটেনি। ধন্যরাজাব পুণ্য দেশ, যদি বরষে মাঘের শেষ। সেই বর্ষণ ঘটেনি রাঢ়ভূমে। ফলে এই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে রাঢের বুকে শুরু হয়েছে দাবানল। সারা জেলা খরার প্রকোপে ধুঁকছে। গরীব-গুরবোদেব বাড়িতে একদানাও খাদ্য নেই। ভিখিবির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে দশগুণ। হা-অন্ন, হা-অন্ন রব তুলেছে রাঢেব মানুষ।

হরবল্লভ লাজুক হেসে বলেন, আমার পুরো ফেমিলিটাই তো খরা সামলাচ্ছে। ছেলে একখানা লঙ্গরখানা খুলেছে ক্লাবঘরে। স্ত্রী চালাচ্ছে বাড়িতেই। দিনভর খিচুড়ি রাঁধা চইল্ছে। নিজেদের খাওয়া-দাওয়া লাটে উঠেছে।

'করতে তো হবেই।' হরিসাধন বটব্যাল কাঁচাপাকা চুলে সযত্নে আঙুল চালাতে থাকেন, 'দেশের দুর্দিন বলে কথা।'

দুপুরের ভুরিভোজটা ভালই হল।

উচ্চগ্রামে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে রান্নাবান্নার ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে যখন সদরে এলেন হরিসাধনরা, তখন দেউড়িব গা ঘেঁষে উদোম কঙ্কালের দল পাত পেড়ে বসে খিঁচুড়ি গিলছে। মাথার ওপর গনগনে সূর্যকে অগ্রাহ্য করে শ'দেড়েক লোক সাপটে খেয়ে চলেছে হলুদ রঙের লপসি। বাতাসে একটা সমবেত সুপ্সাপ্ আওয়াজ উঠেছে।

হরিসাধন শুধোন, এসব কি গম্মেন্টের সাপ্লাই?

হরবল্লভ সামান্য সময় চুপ করে থাকেন। একসময় মৃদু গলায় বলেন, গম্মেন্ট আর কতটুকু দেয়! ওতে কবে কি আর এই রাবণের গুষ্টিকে গেলানো যায় দিনের পর দিন?

তা বটে। হরিসাধন পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন। গম্মেন্ট থেকে এসব দেওয়া-থুয়া তো এই সেদিনের কথা। তার আগে এমনি সব দৈব দুর্বিপাকের দিনে দেশের রাজা-জমিদারেরাই তো বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখত গরীব প্রজাদের।

মুখের সামনে এমন প্রশংসাবাক্য শুনে লজ্জায় বুঝি রাঙা হয়ে ওঠেন হরবল্লভ। নরম গলায় বলেন, কীই বা শক্তি আমাদের! কতটুকুই বা সামর্থ—।

হরিসাধন তখন অতীতের দিনগুলোর মধ্যে বিচরণ করছেন। চোখ মুদে গভীর আয়েসে বলতে থাকেন, আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পানিপারুলের জমিদাব। যেবার দেশে দুর্ভিক্ষ হল,

নাইন্‌টিন ফট্টি-থ্রিতে, উনি একাই—। হরিসাধনবাবু তারিয়ে তারিয়ে বলতে থাকেন পূর্ব-পুরুষের কীর্তির কথা। কেমন করে গড়-বাসুদেবপুরের রাজাদের কাছে নিজের তালুক বন্ধক রেখে তাঁরা খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রজাদের।

এই মুহূর্তটিকেই যথাযথ বিবেচনা করে হরবল্লভ উত্থাপন করেন আসল কথাটি। বলেন, সেই জমিদারিটাই তো তুলে দিলেন আপনারা। সামান্য দু'দশ বিঘা জমিন, তাও কেড়ে কুড়ে লিতে চাচ্ছেন।

আমরা? হরিসাধনবাবু নিঃশব্দে মাথা নাড়াতে থাকেন ডাইনে-বাঁয়ে। আপনার ব্যথাও যেখানে, আমার ব্যথাও সেখানে। এসব হলো ওপরমহলের সিদ্ধান্ত। আমরা তো উপলক্ষ মাত্র।

হরবল্লভ বুঝি শুনেও শোনেন না হরিসাধনের কথাগুলো। তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেন প্রসঙ্গের মূলটিকে। বলেন, আমি তো বলে দিয়েছি সক্কলকে, এই শেষ খানা খেয়ে লাও তোমরা। সেট্‌ল্‌মেন্টের কাজটা শেষ হলেই তুয়ারা যা, আমিও তাই। একই ঝাঁকের কই মাছ। বলে দিয়েছি, এবার দেশে-গাঁয়ে খরা-দুর্ভিক্ষ-খাটারশাল হলে আর আমার থিকে কিছু আশা কইর্‌বি নাই। সোজা চলে যাবি গমমেন্টের ঘরে। তখন আমাকে বলে কে খেতে দেয়।

হরিসাধন বোধ করি হরবল্লভের বুকের ভাঁপনখানা বুঝতে পারেন। সাহস জোগানোর ভঙ্গিতে বলেন, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা তো আছি। কোতাকার জল কোতায় গিয়ে থামে, দেখুন।

হরবল্লভ জবাব দেন না। খুব কৃতজ্ঞভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকেন হরিসাধনবাবুর দিকে।

২৯. মেঘ না চাইতেই জল

গণদরখাস্তে যখন সই-সাবুদ নেওয়া চলছে গোপনে, অনাথবন্ধু যখন ডি-এম'এর কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দুটি ঘটনা ঘটে যায় প্রায় একই সময়ে। একটি সুখকর, অন্যটি বিস্ময়কর। সুখকর ঘটনাটি হল, সুকুমার জামিনে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে। দ্বিতীয় ঘটনাটিও সুখকর, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর।

একদিন হরবল্লভ আচমকা কয়েকশো ক্ষেতমজুর নিয়ে ব্লক অফিসে হাজির হন কাজের দাবিতে। এবং কী আশ্চর্য, পরের দিন বুদ্ধদেবের ডাক পড়ে বিডিও সাহেবের চেম্বারে।

বিডিও সাহেব বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, তোমার এরিয়ায় যে এত ডিসট্রেস, তা তো কও নাই আমারে? কেবলই ভোটের মিছিল করিয়া বেরাইলে চল্‌ব? শুনি ত দিনরাত ক্যাবলই ভোটের পোস্টার লিখত্যাছ। খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন বিডিও সাহেব। তারপর বলেন, হরবল্লভবাবু এসেছিলেন কাল। ইমিডিয়েট্‌লি একটা কাম শুরু করা দরকার। উপর থিক্যা অর্ডার।

বুদ্ধদেবের কাছে এটা অবশ্যই সুখবর। এলাকায় সত্যি সত্যিই কাজকর্ম বলতে কিছুই নেই। ভূমিহীন মানুষগুলো প্রায় অনাহারে-অর্ধাহারে রয়েছে। সুকুমার থাকলে এ্যাদ্দিনে ব্লক অফিসের সামনে ঝুড়ি-কোদালের মেলা বসিয়ে দিত। কিন্তু তার অবর্তমানে তেমন কাজ

করবার মানুষ নেই সারা তল্লাটে। তাও বুদ্ধদেব বার কয় বিডিও সাহেবকে জানিয়েছিল ব্যাপারটা; তার কথা তিলমাত্র গুরুত্ব পায় নি। বিডিও সাহেব কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলেছিলেন, কাজ নাই ত আমি কী করুম? আমার তো টাকার গাছ নাই যে নারাইয়া দিলেই ঝনঝনাইয়া টাকা পড়ব। গম্‌মেন্টের কাছে প্রপোজাল গ্যাসে। টাকা আইলে কাজ হইব।

সেই বিডিও সাহেবের আজ অতখানি উদ্বেগ দেখে বিস্মিত হয় বুদ্ধদেব। খুশিও হয়।

বিডিও সাহেব বলেন, করালীরে কইসি, একখান্ স্কীম বানাইয়া দিক চট-জলদি। ডি-এম-এর ইস্পেশ্যাল ফান্ড থেকে কিসু টাকা মিল্‌ব। কথাবার্তা হইয়া গ্যাসে গা। সামনের হপ্তায় কাজটা শুরু কইরা দাও। আর হাঁ—দ্যাখো, যেন টাকাটা পিলফারেজ না হয়। সামান্য টাকা, তাও যদি দশভূতে লুইট্যা লেয় তো গরীব মানুষগুলা বাঁচে ক্যাম্‌নে?

ভূতের মুখে রামনামের মতো শোনাচ্ছিল কথাগুলো। তাও বুদ্ধদেব ভারি গদগদ হয়ে বলে, একটা পয়সাও নষ্ট হতে দেব না স্যার। কথা দিচ্ছি।

—গুড্। বিডিও সাহেব খুবই খুশি হন। কাজটার যাবতীয় ভার তোমার হাতেই দিত্যাসি। মোহরার, হেল্পার, জলকুলি সবই তুমি লোক্যালি সিলেক্ট কইরা লও। আর শোন, এ ব্যাপারে হরবল্লভকে নাক গলাতে দিবা না। বুঝলা? উয়ার সম্পর্কে যা সব শুনতে পাইত্যাসি, সুবিধার লোক নয়। আন্ডারস্টুড?

হঠাৎ কাজের ঘোষণাটা যেমন বিস্ময়কর, তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ঠেকে হরবল্লভের সম্পর্কে বিডিও সাহেবের মূল্যায়ন শুনে। কিন্তু তার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

বুদ্ধদেব শুধিয়েছিল, কাজটা কোথায় হবে স্যার?

—চুয়ামসিনা থেকে জয়রামপুর ভায়া সাস্তালপাড়া যে রাস্তাটা ভাইঙা-ভুইঙা গেসে গা। জলদি সারানো দরকার।

বুদ্ধদেব আবারও বিস্মিত। চুয়ামসিনা থেকে জয়রামপুর অবধি যে রাস্তাটা সাঁওতাল পাড়া হয়ে গিয়েছে, ওটা তো ইদানীং কেউ ব্যবহারই করে না। পদম পুকুরের পাড় দিয়ে সোজাসুজি মোরাম রাস্তাটা জয়রামপুর অবধি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সবাই ঐ রাস্তাটিকেই ব্যবহার করে। সাঁওতাল পাড়ার রাস্তাটা এখন পরিত্যক্তই বলা যায়। দু'পাশের জমির মালিকেরা রাস্তাটার অর্ধেক কেটে কেটে মিশিয়ে নিয়েছে নিজেদের জমির সঙ্গে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তাও ভেঙেচুরে একাকার। ঐ রাস্তাটাকে নতুন করে বানিয়ে কার কি লাভ হবে! মানুষ কেনই বা এতখানি ঘুরপথে হাঁটতে যাবে! বুদ্ধদেব সে কথা বলতেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন বিডিও সাহেব। অত কথায় তোমাগো কাম কি? বল্‌সিটা কী তবে? উপরের অর্ডার। বুদ্ধদেব তাও ভাবতে থাকে। ওপরের অর্ডার, তবে কি ডি-এম কোনও জরুরি নির্দেশ পাঠিয়েছেন? খুরশিদ সাহেব চলে গিয়েছেন। তার বদলে নতুন যিনি এসেছেন, তাঁকে এখনও চাক্ষুষ দেখেনি বুদ্ধদেব। শুনেছে, একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ। কর্মচারী সমিতি থেকে প্রণয়দারা কিছু দাবি-দাওয়ার কথা বলতে গিয়েছিল, পত্রপাঠ ভাগিয়ে দিয়েছে।

খুরশিদ সাহেবের চলে যাওয়াটা শুধু জেলার মানুষেরই ক্ষতি নয়, বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত

ক্ষতিও। এমন একটা মানুষ মাথার ওপর থাকলে, যে কোনও কাজ ঝুঁকি নিয়ে করা যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব বেশ কিছুদিন যাবৎ বুঝতে পারছিল, ডি-এমকে তাড়ানোর পরিকল্পনা পুরোদমে চলছে। এ জেলাব নেতারা ওঁকে তাড়ানোর জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছিলেন। চুয়ামসিনার মাঠে হাড়েব গুঁড়ো ছড়ানোর অনেক আগেই তলেতলে তার প্রস্তুতি চলছিল ঐ ঘটনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাল ব্রজরাজ সামন্তর দল। ডি-এম যে জাতে মুসলমান, তিনি যে কৌশলে এ জেলার হিন্দুদের জাতধর্ম মারতে চাইছেন, তিনি যে জেলার সমস্ত জমিনে গরুর হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে পরোক্ষে জেলার মানুষেব পেটে অখাদ্য, অস্পৃশ্য, নিষিদ্ধ বস্তুগুলি সেঁধিয়ে দিতে চান, কারণ হাড়ের গুঁড়োর নির্যাসেই তৈরী হবে ধানের মধ্যেকার চাল, সেই চালেব ভাত খেলে আর জাতধর্ম বলে কী থাকবে এই জেলার হিন্দুদেব। —এই কথাগুলো চতুর্দিকে মুখেমুখে রটিয়ে দিতে থাকে ওরা। এই ডি-এম জেলায় থাকলে যে জেলার সমস্ত হিন্দুদের মুসলমান বানিয়ে ছাড়বে, এমন আশঙ্কাও ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। আরও কিছু অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, ইদ ও বিজয়া দশমীর প্রতিমা ভাসান একদিনে পড়ায় বাঁকুড়া শহরে যে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাতেও যে ডি-এম-এর প্রচ্ছন্ন মদত ছিল এটা কেমন করে জানি ছড়িয়ে যায় হাওয়ায়।

আসলে, অনেক কারণেই এ জেলাব নেতাদের রোষ জমছিল ওঁর প্রতি। ওদেব স্বার্থসিদ্ধির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক ছিলেন তিনি। তাই, জেলায় যখন খরা হল, ত্রাণ সামগ্রীর বিলি-বন্টন এবং খরা পবিস্থিতির মোকাবিলা করবাব ব্যাপারে খুরশিদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছিল ব্রজবাজ সামন্তর দল। পঁয়ষট্টির যুদ্ধ, খরা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে রাজ্যব্যাপী তীব্র খাদ্যসঙ্কট,—সমস্ত পর্যায়েই খুরশিদ সাহেবকে তারা পদে পদে হেনস্তা করবাব চেষ্টা করেছে। অবশেষে, যখন দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতে লাগল, তখন ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে এই বলে যে, এই ডি-এম থাকলে নির্বাচনে দলে অশেষ ক্ষতি হবে। কারণ, এই ডি-এম ভেতরে ভেতরে কম্যুনিস্ট। জেলায় আসা অবধি বিভিন্ন সময়ে কম্যুনিস্টদেরই মদত দিয়ে এসেছেন তিনি। নির্বাচনেও তিনি কম্যুনিস্টদেরই সাহায্য করবেন। আর, সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন এমন একটি জীবন-মরণ সমস্যা যে, কোনও দলই তিলমাত্র ঝুঁকি নিতে চায় না। তার ওপর দল থেকে আচমকা অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়ার মতো ব্যক্তিত্বগুলি বেবিয়ে গিয়ে বাংলা কংগ্রেস গড়ায় এবং প্রকাশ্যে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আঁতাত করায় এবারের ভোটে সারা রাজ্যে, এমনকি বাঁকুড়ার মতো জেলায়ও, যাকে অনাথবন্ধু ঠাট্টা করে বলেন 'বলদভূম', সেই বলদভূমেও নির্বাচনটা একটা বড়সড় অগ্নি পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের তখন আর মাস ছয়েক বাকি। ডি-এম সম্পর্কে যদি এমনই মূল্যায়ন হয় দলের জেলাস্তরেব নেতাদের যে, এই ডি-এম থাইক্‌লে এবারের ভোটে জেলা থেকে একটা ক্যান্ডিডেটও জিতবেক নাই, 'বলদভূম' রাতরাতি 'লালগড়' হয়ে যাব্যেক, তো তাঁর কাজ ও সততার জন্য যতই সুনাম থাকুক রাজধানীতে, রাজ্যস্তরের নেতারা তাঁকে না সরিয়ে পারেন না।

খুরশিদ সাহেব চলে গেলেন। ব্রজরাজ সামন্তব দল প্রকাশ্যে উল্লাস প্রকাশ করল,

সিংহগড়ে খাসি কেটে, হ্যাজাক জ্বালিয়ে ভোজ দিলেন হরবল্লভ। বিদায়কালে বুদ্ধদেব তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করতে গিয়েছিল। তিলমাত্র দুঃখিত মনে হয়নি খুরশিদ সাহেবকে। তাঁর মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ ছিল বলে মনে হয়নি বুদ্ধদেবের। বরং বেশ হালকা ঝরঝরে, লাগছিল। বুদ্ধদেবের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, হ্যালো, ব্রেভ ইয়ং ম্যান! যদি কখনও আমাকে প্রয়োজন হয়, সোজা চলে যেও আমার কাছে। ডোন্ট হেসিটেট।

বুদ্ধদেব সেদিন খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। কথা বলতে গিয়ে গলাটা ধরে আসছিল তার। কোন গতিকে বলে, ওরা আপনাকে থাকতে দিল না স্যব।

সে কথায় তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা যায় না খুরশিদ সাহেবের মুখে। প্রায় মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন, ও—দিজ ইজ আ পার্ট অব্ দ্য গেম। বাট ওয়ান থিং—। খুরশিদ সাহেব খুব সুনির্দিষ্টভাবে তাকিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের দিকে, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মেশো না। কম্যুনিস্ট্স্ আর ব্যাড পিপ্ল্। ইয়েস, আই মিন ইট।

বিডিও সাহেব খুব খাটো গলায় বললেন, আদার বেপারি আমরা, জাহাজের খোঁজে কাম কি? ভোট আইত্যাসে, কোন রাস্তাটি বানিয়ে দিলে কার কি উপকার হইব, সে গবেষণায় কাম কি আমাগো? হুকুম পাইসি, তামিল করতে হইব, ব্যস।

বুদ্ধদেব আর কথা বাড়ায় না। রাস্তাটা কোনও কাজে লাগবে না মানুষের, তবে একটা কথা ভেবে ভাল লাগছিল, মানুষগুলো দিনকতক কাজ পেয়ে যাবে। ওদের সদাসর্বদা মেঘে ঢাকা মুখগুলোতে সামান্য চিকসানি ফুটবে খবরটা শুনে। বলে, পে-মাস্টাব, মোহরাব কে হবে?

— সে, তুমিই ঠিক কর। আমি কিসু বলসি না। তুমি যারেই ঠিক কর্বা, তারেই এ্যাপয়েন্ট করুম আমি। তবে, তুমি থাকবা অফিসার-ইন্-চার্জ। দাঁড়িযে থেকে কামটা ভাল কইর্যা কবাও দেখি। ভোটের আগের কাম ত, খারাপ হইলেই বিরোধীরা হল্লা তুলব।

বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ মনেমনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সুকুমাবকে পে-মাস্টার, তিলককে মোহরার কববে। গোবিন মিস্ত্রি আর হঠাৎ মুর্মু জল জোগাবে কুলিদের।

বিডিওসাহেব বলেন, করালীর সাথে কথাবার্তা পাক্কা কইর্যা লও। দু'তিন দিনের মধ্যে কাম শুরু কর।

সেদিন একবাশ বিস্ময় নিয়ে ব্লক অফিস থেকে বেরিয়েছিল বুদ্ধদেব। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা খটকা। হাজার কান্নাকাটিতে মানুষের অভাবের দিনে একটা কাজ সহজে শুরু করানো যায় না, কতই না কাঠখড় পোড়াতে হয়, আব দুম করে বলা নেই কওয়া নেই রাতারাতি একটা কাজ মঞ্জুর হয়ে গেল। এবং এমন সে স্কীম যার কোনও দরকারই নেই এলাকায়! তার ওপর আবার স্কীমের সবকিছু দায়দায়িত্ব বিডিও সাহেব এক কথায় সঁপে দিলেন বুদ্ধদেবের ওপর! এবং বুদ্ধদেব যখন সুকুমাব আব তিলক বাউরির নাম বলল, সঙ্গে সঙ্গে, 'বেশ ত, সুকুমার তো পোলা খারাপ নয়।' এবং গলা নামিযে 'কম্যুনিস্টবা কখ্খনো ডিজোনেস্ট হয় না' বলে বিনা দ্বিধায় মঞ্জুর করে দিলেন প্রস্তাবটা! কেমন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় সবকিছু। বিডিওসাহেবের এমন আকস্মিক হৃদয় পরিবর্তনে বুদ্ধদেব হতচকিত, বিহবল।

রাস্তায় পা দিয়ে বুদ্ধদেব দেখে কাতারে কাতারে লোক চলেছে রসিকগঞ্জের মাঠে। আজ ওখানে চোদ্দ দলের জনসভা। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নতুন পার্টি বাংলা কংগ্রেস। নতুন হলে কি হয়, এ পার্টির সংগঠন ভালই গড়ে উঠেছে জেলায়। তারা মিলেছে চোদ্দ দলের সঙ্গে। অজয় মুখার্জি আর জ্যোতি বসুর নামেই মানুষের ঢল নেবেছে। গেল হপ্তায় ঐ একই মাঠে জনসভা করেছিল সিদ্ধেশ্বর হাজরা, রামকমল চক্রবর্তীরা। হাজার পাঁচেক লোক হয়েছিল। রাস্তায় মানুষের ঢল দেখে বুদ্ধদেবের ধারণা হয় আজকের জনসভায় দশহাজারের কম লোক হবে না। অনাথবন্ধু বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আজকের জনসভায় তাঁর উপস্থিত থাকবার কথা। বুদ্ধদেব জনসমুদ্রে অনাথবন্ধুকে খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে তাঁকে দেখতে পায় মঞ্চে। নেতৃবৃন্দের পাশটিতে হীরকখণ্ডের মতো শোভা পাচ্ছেন তিনি।

রসিকগঞ্জেব মাঠে বিশাল মঞ্চ। তার সামনে কাতারে কাতারে মানুষ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কম্বুকণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন, চারণকবি বৈদ্যনাথ ঃ

দাসত্ব যদি না হল শেষ
এ তবে কেমন স্বাধীন দেশ
না হল বন্ধ চোরা কারবার ঘুষ-সেলাম
তবে বল এই স্বাধীন হয়ে কি ফল পেলাম
বসন্তে যদি শুকোল ফুল, ম'ল কোকিল
হাসলই যদি শকুনি চিল
তবে বল আজ এ বসন্তের কি দরকার
হে সরকার।
প্রশ্ন তাই, জবাব চাই,
জবাব না পেলে লেখনি বন্ধ
করব নাই...।

সেদিন ভরসন্ধ্যা অবধি নেতাদের বক্তৃতা শুনল বুদ্ধদেব। মাঝরাতে যখন বাসায় ফিরল, বুকের মধ্যে স্বপ্নটা ফের বুঁজকুড়ি কাটতে শুরু করেছে।

৩০. মাকুন্দ হল মুকুন্দ

পাগল শিকারি ছেলের নাম রাখতে চেয়েছিল সুধন্য। বউ রাখতে চেয়েছিল, শ্যামাপদ। হরবল্লভ সে সব নাম বাতিল করে রাখলেন মাকুন্দ। পাগলের ব্যাটা মাকুন্দ। নিস্‌পটরবাবু সে নাম বদলে দিলেন। বললেন, মাকুন্দ আবার নাম হয় নাকি? কে রেখেছে এমন নাম? ওর মা-বাপ? ওর নাম মুকুন্দ। হাজিরা খাতা কেটে মুকুন্দ করে নেবেন। শ্যামপণ্ডিত সুবোধ বালকের পারা মাথা দোলায়। সেই সুবাদে খাতায়-কলমে মাকুন্দ হয়ে গেল মুকুন্দ। ব্যবহারিক জীবনে যথাপূর্বং তথা পরম্। আদি-অকৃত্রিম মাকুন্দ। পাগলের ব্যাটা মাকুন্দ।

মাকুন্দর নামও 'সুধন্য' রাখতে পারেনি পাগল শিকারি। কাজেই বসুদেব-দেওকি আর

হতে হয়নি নিজেদের। তাই নিয়ে তার আজীবনের আক্ষেপ। টাকা-নয়, কড়ি নয়, হাতি নয়, ঘোড়া নয়, একটা মাত্র নাম, সেটাই শরীরে ধারণ করতে পারল না বলে এক বাকসিদ্ধ সাধুর ভবিষ্যতবাণী সফল হল না দু'পুরুষ ধরে। শুধু একটা নামের জন্যই পূরণ হল না আজীবন লালিত স্বপ্নখানা। শুধু একটা নামই তাকে একেবারে মেরে রেখে দিল পুরুষাণুক্রমে। সুধন্য। নামটার কী এমন মহিমা যে, ওটাকে নিজের শরীরে মাদুলির মতো ধারণ করলেই পাগল শিকারির জীবনে ঘটে যেত এমন সব অলৌকিক ঘটনা, যা কেবল ওদের জীবনে স্বপ্নেই আস্বাদন করা সম্ভব? পাগল শিকারি ভেবে পায় না। কী আছে ঐ নামটার মধ্যে? নামটার মানে কি? পাগল শিকারি এখনও অবধি সুযোগ পেলেই একে ওকে শুধোয়, হাঁ বাবু, সুধন্য মানে কী বটে? পড়ালিখা বাবুরা সব আমতা আমতা করে। অভিধান হাতড়ে বেড়ায়। অভিধানে সুধন্য শব্দটাই নেই।

মহাদেব কয়াল ইস্কুলের মাস্টাব। পণ্ডিত মানুষ। একদিন দয়া পরবশ হয়ে বলেন, সুধন্বা বলে একটা নাম পাচ্ছি বটে পুরাণে। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। প্রহলাদের ছেলে বিরোচন আর অঙ্গিরার ছেলে সুধন্বা, দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই নিয়ে মহাকলহ বাধে রূপবতী বাজকন্যা কেশিনীর স্বয়ংবর সভায়। যে শ্রেষ্ঠ তার গলাতেই মালা দিবেক কেশিনী। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠ নয় তাকে বধ করা হবেক, এমন চুক্তিও হয় পাশাপাশি। প্রহলাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের ভার পড়ে। একদিকে নিজের পুত্রের জীবন, অন্যদিকে সত্য, প্রহলাদ পড়েন ফাঁপরে। অবশেষে, মিথ্যের আশ্রয় কিছুতেই নিতে পারেন নি তিনি, ব্রাহ্মণপুত্র সুধন্বাকেই শ্রেষ্ঠ বলে রায় দেন। ফলে রাজকন্যা কেশিনীও সুধন্বার গলায় বরমাল্য দেন। সুধন্বা অবশ্য প্রহলাদের ছেলে বিরোচনকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন। পাগল রে, সুধন্য নয় কথাটা সুধন্বা হবেক।

পাগল শিকারি সমানে বিড়বিড় করতে থাকে, বাপ যে বলল্যাক, সুধন্য। সাধু ত উই নামটাই বলেছিল্যাক। মহাদেব বলেন, তুয়ার বাপটা ত চিরকালই কানে খাটো ছিল্যাক। ধান শুইন্‌থে পান শুইন্‌থ। উ শালা নির্ঘাৎ সুধন্বাকে সুধন্য শুন্যেছে।

বাপ আর বেঁচে নেই। কাজেই, আজ আর ইচ্ছে থাকলেও পাগল শিকারি বাপকে শুধিয়ে নিতে পারবে না, সাধুর মুখ থেকে ঠিক কী শুনেছিল সে। সুধন্য, নাকি সুধন্বা, এই নিয়ে প্রবল ধন্ধে পড়ে যায় পাগল। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে সুধন্যতেই স্থির থাকে। বলা যায় না, সাধু হয়ত সুধন্যই বলেছিল। বইতে, পুরাণে নাই বা রইল সে নাম। বইতে, পুরাণে কি সবকিছুই রয়েছে এ দুনিয়ার! হরিণমুড়ির নাম ত বইতেও নাই, পুরাণেও নাই, তা বলে নদীটা কি নাই? তেমনি পারা কোনও সৃষ্টিছাড়া, পুরাণছাড়া নাম হইতেও পারে ইটা, সুধন্য, হয়ত বা সাধু স্বপনে পেইয়েছিল্যাক নামটা, যেমন করে স্বপনে কতই না দৈবী ওষুধ পেয়ে যায় কত পুণ্যাত্মা, ভাগ্যবান মানুষ।

পাগল শিকারি সুধন্যতেই স্থির থেকে, এগোচ্ছে।

নিস্‌পটর বাবু বিদায় কালে বলে গিয়েছেন শ্যামপণ্ডিতকে, ছেলেটার দিকে স্পেশাল নজর রাখবেন। আমি নিয়মিত খোঁজ নেব। ওর পড়াশোনার বই-পত্তরের দরকার থাকলে আমাকে বলবেন।

শ্যামপণ্ডিত নিদারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছে। একদিকে এলাকার ভাগ্য-নিয়ন্তা হরবল্লভ, অন্যদিকে প্রবল-প্রতাপান্বিত ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব। সে শ্যাম রাখে না কূল রাখে! মাকুন্দব পড়াশোনার দিকে নজর রাখলে, হরবল্লভ ক্ষেপবেন। কিনা, তাঁর পুকুরের মাছের নাকে নোলক পরানো! আবার নজর না দিলে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবের রোষানলে পড়বে। এক কলমের খোঁচায় রাইপুর কিংবা রানীবাঁধ টান্‌স্‌ফার। এই ইন্‌স্‌পেক্টরের সে এলেম রয়েছে।

দুটো পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে একটা রফা করবার উদ্দেশ্যে শ্যামপণ্ডিত সন্ধের দিকে সিংহগড়ের দিকে হাঁটা দেন।

হরবল্লভ দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। এইমাত্র রেডিওতে খবর পড়া শেষ হল। আবার বোধ করি একটা যুদ্ধ বাধবে দেশে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের জোর কথা কাচাকাচি চলছে। দু'পক্ষই হুঙ্কার দিয়ে চলেছে সমানে। নেহেরু মারা যাওয়াব পর ভারতের কী হাল হবে, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। শেষমেষ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হলেন প্রধান মন্ত্রী। ছোটখাট মানুষটি, কিন্তু তেজ রয়েছে খুব। একেবারে ধানী লঙ্কা। হুঙ্কারে কিছুমাত্র কম যান না তিনি। মামলা জমে উঠেছে। ওইসব নিয়েই গাঢ় ভাবনায় মগ্ন ছিলেন তিনি। যুদ্ধ যদি বাধে, কী ফল হতে পারে, ঐ নিয়ে, নিজস্ব অলস গবেষণায় ডুবে ছিলেন হরবল্লভ। বাষট্টিতে চীনের কাছে গোহারান হেরে গেছে ভারত। সে গ্লানি এখনও ঘোচে নি। দুঃস্বপ্নের মতো লাগে, ঐ সময়টার কথা ভাবলে। আবার যুদ্ধ হলে ফলাফল কী হবে, কে জানে? হরবল্লভ বৈঠকখানাব বারান্দায় দোলনায় বসে বসে ঐ নিয়ে একা একা সাত-সতের উবুর-ডুবুর খেলা খেলতে থাকেন। আসলে, একা একা থাকলে ভারি ঘুম পায় ইদানীং। উমা আব দেবিদাস তো বিষ্টুপুরে থাকে। হরবল্লভ নতুন বাড়ি বানিয়েছেন হাজরাপাড়ায়। দোতলা বাড়ি। ওখানে থেকে পড়াশোনা করে ওরা। ঠাকুর-চাকর সব মোতায়েন করেছেন সেখানে। অরুন্ধতীও মাসের মধ্যে পনের দিন থাকছেন ওখানেই। দিনদিন তার শহরে বসবাসের সময়কাল বাড়ছে। দু'চারদিনের জন্য এলেও ইদানীং 'উমা-দেবিদাস কী কইর্‌ছে, কে জানে' বলতে বলতে এক ধরনের উতলা হয়ে ওঠার মুদ্রা রচনা করেন তিনি সারা মুখে। তারপর বাবুলাল বাগদির রিক্সায় চড়ে চলে যান। একখানা রিক্সা কিনেছেন হরবল্লভ। ইন্দ্র বাগদির ব্যাটা বাবুলাল সেটা চালায়। চালায় বলতে ভাড়ায় খাটে নামমাত্র। তার পুরো সময় চলে যায় অরুন্ধতীদের পেছনে। উমা-দেবিদাসকে স্কুলে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে। অরুন্ধতী যতক্ষণ বিষ্টুপুরে থাকেন, বেরোতে হলে তিনি রিক্সা ছাড়া এক পাও হাঁটেন না। যখন চুয়ামসিনায় আনাগোনা করেন দু'চারদিন অন্তর, বাবুলালই আনে, ফিরিয়ে নিয়ে যায়। প্রায় পুরো পরিবারটি বিষ্টুপুরে বসবাস শুরু করায় হরবল্লভ খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন দিনদিন। প্রভঞ্জন অবশ্য চুয়ামসিনাতেই থাকে। তবে তার থাকা না থাকা সমান। দিনভর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, নয়তো তাস-ক্যারাম খেলে ক্লাবঘরে। মাঝেমাঝে সেও চলে যায় বিষ্টুপুরে। পণ্টু হাজরার সঙ্গে ফুর্তি করে, ঘুরে বেড়ায়। সিংহগড়ে ইদানীং রতিকান্ত, বামুন মাসি, ইন্দ্র বাগদি আর পাগল শিকারির বউ, আরও কিছু ঝি-চাকরকে নিয়ে হরবল্লভ প্রায় একাই বসবাস করেন। আর রয়েছেন প্রতাপলাল। তবে তাঁরও

থাকা না থাকা সমান। থুরথুরে বুড়ো, চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, মস্তিষ্ক প্রায় অসাড়, ইন্দ্রিয়ের প্রায় সব দ্বারই শিথিল। থেকে থেকে বিছানাতেই বাহ্যি-পিসাব হয়ে যায়। ইন্দ্র বাগদির বউ ছাড়াও তার জন্য মোতায়েন রয়েছে দু'তিনটে লোক। তারা ওঁকে ওঠায়, বসায়, বাহ্যি-পিসাব করায়, সিনান করিয়ে গা মুছিয়ে দেয়, খাওয়ায়-দাওয়ায়, গা-মালিশ করে দেয়...। তাঁর সঙ্গে গল্প-গুজব করা তো দূরের কথা, দু'একটা প্রয়োজনীয় কথা বোঝাতে চিল্লিয়ে গলা ফাটাতে হয়। সন্ধে নাগাদ কোনও কোন দিন গাঁয়ের মাতব্বররা আসেন। মহাদেব কয়াল, ঝাড়েশ্বর নায়ক, কামদেব দত্ত, প্রমথ গাঙ্গুলি...। চা খান, রেডিওতে খবর শোনেন, দেশ-গাঁয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন, নিজেদের হাজারো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে শলা করেন । যে কোনও কারণেই হোক আজ কেউই আসেন নি। কাজেই হরবল্লভ সারো সন্ধে জুড়ে একা। নিঃসঙ্গ। ভারত-পাকিস্থানের সম্ভাব্য যুদ্ধ নিয়ে উবুর-ডুবুর খেলা ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নেই।

শ্যামপণ্ডিতকে দেখে মুখ তোলেন হরবল্লভ। দুপুরে স্কুলে ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনা ইতিমধ্যেই কানে এসেছে তাঁর। তবুও শ্যামপণ্ডিতের মুখে নতুন করে শোনার জন্য প্রস্তুত হন।

মাকুন্দকে নিয়ে আজ যা যা ঘটে গেছে ইস্কুলে, তার জন্য মূলত তিনিই দায়ী। স্কুলের বাড়তি ছাত্রসংখ্যা পূরণ করবার জন্য রতিকান্ত যখন তাঁরই নির্দেশে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তিনিই আচমকা খাল কেটে কুমীরটিকে পয়দা করলেন স্বয়ং।

দু'ঘড়ি নাগাদ বেলায় মাকুন্দ শিকারি সিংহগড় থেকে গরুর পাল নিয়ে রওনা হচ্ছিল বত্রিশভাগীর জঙ্গলের দিকে। সদরমহলের বারান্দায় বসে দড়ির দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন হরবল্লভ। আচমকা মাকুন্দর ছোট্ট শরীরখানার ওপর আটকে যায় চোখ। তন্দ্রামতো ভাবখানা কেটে যায় নিমেষে। দোলনার ওপর নড়েচড়ে বসেন হরবল্লভ।

আচমকা বাজখাঁই গলায় ডাক পাড়েন মাকুন্দকে, এই পাগলের ব্যাটা মাকুন্দ, ইদিগ আয়।

মাকুন্দ হকচকিয়ে যায়। সারা মুখে ফুটে ওঠে অনাগত আশঙ্কা। বুকের মধ্যে বাঁশপাতার কাঁপন শুরু হয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হরবল্লভের সামনেটিতে গুটিসুটি দাঁড়ায় সে।

হরবল্লভ স্থির পলকে দেখছিলেন মাকুন্দকে। আচমকা ডাক পাড়েন, পাগল—।

পাগল শিকারি মাটি কোপাচ্ছিল গোয়ালঘরের পেছনের সবজি-ক্ষেতে। মালিকের ডাকে দৌড়তে দৌড়তে হাজির হয়।

হরবল্লভ বলেন, আজ তুই গরু লিয়ে চরাতে যাবি।

পাগল শিকারি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে।

হরবল্লভ পুনরায় বলেন, মাকুন্দ আজ ইস্কুলে যাবেক। পইড়তে।

বাপ-বেটা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মালিকের কথার মাথামুণ্ডু বোধগম্য হয় না ওদের। আশঙ্কা গাঢ় হয় ওদের মুখের প্রতিটি রেখায়।

হরবল্লভ এবার রতিকান্তকে ডাক দেন। বলেন, এ শালাকে সিনান-টিনান করিয়ে,

রিলিফের একটা পেন্ট আর একটা গেঞ্জি দিয়ে ভর্তি কইর‍্যে লাও তুমার ইস্কুলে। সাকুল্যে ক'টা হইল্যাক?

মাকুন্দ শিকারি দুর্ভাবনায় কালো মুখ করে চলে যায় রতিকান্তর পিছু পিছু।

বেরোবার মুহূর্তে দুটো মূল্যবান নির্দেশ পায় মাকুন্দ শিকারি। এক, মাকুন্দ নয়, তার নাম মুকুন্দ। সাহেব নাম জিজ্ঞেস করলে সে যেন মুকুন্দই বলে। এবং দুই, সে যেন ক্লাসের একেবারে শেষ সারিতে বসে এবং সাহেবের কোনও প্রশ্নের উত্তরই যেন আগ বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করে।

মালিকের দুটো নির্দেশই মনের মধ্যে ভাঁজতে ভাঁজতে ইস্কুলের দিকে পা বাড়ায় মাকুন্দ শিকারি। কেন জানি, ইস্কুলে আজ এক সাহেব আসার সুবাদে আচমকা একদিন হাড়ভাঙা খাটুনির থেকে ছুটি হয়ে গেছে তার। সেই খুশিটুকু সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

মাথা খাটিয়ে আরও একখানা বুদ্ধি বের করেছিলেন হরবল্লভ। মধ্যাহ্নভোজ করিয়ে তবেই সাহেবকে স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তেতে পুড়ে এলে ঠাণ্ডা মানুষও কারণে-অকারণে গরম হয়ে ওঠে, আর এ সাহেবটি তো এমনিতেই গরম। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেও দুর্বাশার মতো ক্ষেপে উঠতে পারেন । উদর ঠাণ্ডা তো দুনিয়া ঠাণ্ডা।

সকাল থেকে গরুর গাড়ি গিয়েছে বিষ্টুপুর। হরবল্লভ ইন্দ্র বাগদিকে কান কামড়ে বলে দিয়েছেন, ধীরে সুস্থে গাড়ি চালাবি। যেন দুপুরের ভাতের টাইমের আগে কিছুতেই না গাড়ি চুয়ামসিনায় ঢুকে। আর সাহেবকে সোজা লিয়ে আইস্‌বি সিংহগড়ে।

ইস্কুলে গিয়ে হরবল্লভের দেওয়া দুটি নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল মাকুন্দ শিকারি। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হয় নি। কারণ, বই-পুস্তকের থেকে মাদুলি দু'চারটে প্রশ্ন করেই 'নিসপটরবাবু' বেরিয়ে পড়েন বই-পুস্তকের বাইরে। সোজা চলে যান সাধারণ বাস্তবজ্ঞান এবং উপস্থিত বুদ্ধির রাজ্যে।

শুধোন, বল তো, দক্ষিণ দিক কোনটা?

সবাই যখন দক্ষিণ দিক খুঁজতে হাবার মতো এদিক-ওদিক তাকায়, মাকুন্দ তখন কেবলই উশখুশ করতে থাকে। তার দু'চোখের তারায় ঘনঘন বিজুরি চমকায়। নিসপটরবাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় সেই আকুলি-বিকুলি। বলেন, বলতে পার তুমি?

মাকুন্দর তো কিছু বলবার কথা নয়। কোনও কথার জবাব পারতপক্ষে না দেবারই কথা তার। সে রকম নির্দেশ জারি করেই তাকে পাঠানো হয়েছে ইস্কুলে। অথচ নিসপটরবাবু নাছোড়বান্দা, বলতে পারবে তুমি, দক্ষিণ দিক কোন দিকে? ভয়ে ভয়ে শ্যামপদ মাস্টারের দিকে তাকায় মাকুন্দ। চোখে চোখ রাখে। অনুমতি চায় চোখের তারায়। শ্যামাপদ মাস্টার বাধ্য হয়ে বলে, জানলে, বলে দে। জানিস? মাকুন্দ ঝটিতি মাথা দোলায়। আঙুল তাক করে দক্ষিণ দিকে।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিসপটরবাবুর চোখ। বলেন, কী করে জানলে?

—জানি।

—কী করে জানলে, সেটাই তো জানতে চাইছি।

মাকুন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে আঁকচিরা কাটতে থাকে মেঝেয়।

—কেউ বলেছে তোমায়?

মাথা নাড়ে মাকুন্দ। আঁকচিরা কেটেই চলে।

—তার মানে আন্দাজে ঢিল মেরেছ তুমি।

নিসপটরবাবুর কথাটা মাকুন্দর বুকে গিয়ে বেঁধে। একটা খিঁচব্যথা শুরু হয়। আন্দাজে ঢিল মেরেছে সে! দক্ষিণ দিক চেনে না? যখন দক্ষিণা-ঝাড়ে, কোন্ দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসে তার ঝুপড়ির ভাঙা বেড়া টপকে মেঝেখানি ভিজিয়ে দেয় মাঝরাতে, সে জানে না? কিন্তু মাকুন্দ তাও চুপ করে থাকে। অধিক কথা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে তার জন্য।

আরও গুটি কয়েক সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব পেয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব চমৎকৃত হন। বলেন, নাম কি? মাকুন্দ ঘেমে নেয়ে উঠতে উঠতে বলে ফেলে, মুকুন্দ। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ক্লাসের বাচ্চারা।

—হাসলে যে? ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু শুধোন।

—উয়ার নাম মুকুন্দ লয়। মাকুন্দ।

ইন্‌স্‌পেকটরবাবু শ্যামপণ্ডিতের দিকে তাকান, মাকুন্দ আবার নাম হয় নাকি? ওর নাম হবে মুকুন্দ। হাজিরাখাতা কেটে মুকুন্দ লিখে নেবেন।

বলেন, এই ছেলেটি নিয়মিত ইস্কুলে আসে?

—নিয়মিত মানে,—গাঁ-ঘরের মজুরবাড়ির ছেলে, এদের বাচ্চা বয়েস থেকে খাটাখাটনিও করতে হয়, তারই মধ্যে—যতটা সম্ভব—। বলতে বলতে ঘেমে নেয়ে ওঠে শ্যামাপদ পণ্ডিত।

ইন্‌স্‌পেক্টর পুনরায় তাকান মাকুন্দর দিকে। দু'চোখে চাপা বিস্ময়। বলেন, ছেলেটির প্রতি নজর রাখবেন মাস্টার মশাই। খুবই ইনটেলিজেন্ট। আমি ছেলেটির ব্যাপারে খুব ইনটারেস্টেড রইলাম।

ইন্‌স্‌পেক্টর স্কুলবাড়ির বাইরে পা রাখতেই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে মাস্টারদের। এতক্ষণে শ্যামাপদ পণ্ডিতের যাবতীয় রোষ গিয়ে পড়ে মাকুন্দর ওপর। শালা, তুই তো আর একটু হইলে আমার চাকরিটাই খেয়ে লিচ্ছিলু রে! যদি কোনও গতিকে শুধিয়ে বসতো, মুকুন্দ, তুমি রোজ ইস্কুলে আস তো? তুই শালা, নির্ঘাৎ বল্‌তু, লয় আইজ্ঞা, আমি সিংহবাবুদ্যার গরু চরাই। আজই মাত্তর আঁইছি ইস্কুলে। কিরে, বলতু কিনা? শালা, দিচ্ছিলু আমার চাকরিটা চৌপট করে!

মাকুন্দ পিটপিট করে তাকায়। নিসপটরবাবুর সব প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব দিয়ে সে যে এক মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছে, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না তার।

শ্যাম পণ্ডিতের মুখে সবকিছু শুনে বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকেন হরবল্লভ। এক সময় বলেন, ত, তুমি কী বইল্‌তে চাও? গরু চরানো বাদ দিয়ে উ শালাকে রোজ ইস্কুলে পাঠাতে হব্যেক?

শ্যাম পণ্ডিত আমতা আমতা করে। রোজ না হলেও অন্তত মাঝে মাঝে না পাঠালে যে সে বিপদে পড়ে যাবে, সেটাই প্রাণপণে বোঝাতে চায় হরবল্লভকে। হরবল্লভ মনযোগ দিয়ে শোনেন। একসময় গলা ফাটিয়ে হাঁক পাড়েন, পাগল, এ্যাই পাগল, ইদিক আয়।

পাগল শিকারি প্রতাপলালের ঘরে ছিল। এসময়টা প্রতাপলালের সেবার নিযুক্ত থাকে সে। সরষের তেল গরম করে ওঁর কোমরে, পিঠে, বুকে আচ্ছা করে মালিশ করে দেয়। হরবল্লভের হুঙ্কারে তড়িঘড়ি বাইরে আসে সে। সামান্য তফাতে গুটিশুটি মেরে দাঁড়ায়।

প্রতাপলাল ওকে দু'চোখ দিয়ে ফালাফালা করতে থাকেন কিছুক্ষণ। একসময় বলে ওঠেন, তুয়ার ব্যাটাকে ত সক্কলে জজ-ব্যারিস্টর কইব্‌তে চাচ্ছে। তুয়ার কি মত?

মাকুন্দর যাবতীয় ঘটনা, যা ইস্কুলে ঘটেছে আজ, পাগল শিকারি জেনে ফেলেছে বিকেলের মধ্যেই। সেই থেকেই তার মনে যুগপৎ আতঙ্ক ও উল্লাস। আতঙ্ক হরবল্লভের রোষের কথা ভেবে। উল্লাস, ভরভরন্ত সোনালি ধানের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে তার দেখা অবাস্তব স্বপ্নটা ডিম পেড়েছে। তা দেওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসতে পারে শাবকটি। সেই স্বপ্নে, পাগল শিকারি, সেই বিকেল থেকে, একটু একটু করে ডুবতে লেগেছে।

হরবল্লভের প্রশ্নে পাগল শিকারি বুঝি সীমাহীন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। বিড়বিড় করতে থাকে সমানে, আপনি মালিক, আপনার ইচ্ছাই সব।

—মালিক! হরবল্লভ বাঘের ঝাপট নেন, তুযার এখন কত মালিক পযদা হয়েছে বাজারে। হরবল্লভ দোলায় বসেই চিরিক করে থুথু ছুঁড়ে দেন উঠোনে, শুন্ শালা, ব্যাটাকে যদি ইস্কুলে পাঠাতে চাউ, তো পয়লা হিসাবপত্তর কাটান্-ছিড়াঁন কইরে লে। গাদাগুচ্ছেক দাদন লিয়ে বুইসে আছিস, ইদিগ, তুয়াব ব্যাটা লাইচ্‌ছে ইস্কুলে যাব্যেক।

পাগল বাউরি এতক্ষণে মুখ খোলে, ইস্কুলে যেইতে উ চায নাই আইজ্ঞা। হুজুর, আপনিই উযাকে পাঠাইছেন ইস্কুলে...।

—সে তো একদিনের তরে। ঠ্যাকা চালাতে। গাছে না উইঠ্‌তেই সে যে কাঁদি লিবার চায়! ইস্কুলে নাকি না জিগাতেই উ হুড়ুম-দুড়ুম জবাব দিয়েছে। দিগ্‌গজ!

পাগল শিকারি ঠায় খাড়া থাকে নিরুত্তর। কিন্তু তার কেমন জানি মনে হয়, কত্তাবাবু মাকুন্দকে নিয়ে কিঞ্চিৎ দোটানায় পড়েছেন। সম্ভবত শ্যাম পণ্ডিতের চাকরি এবং নিজের সুনামের কথা ভেবে একধরনের মধ্যপন্থার কথা ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে পাগল শিকারির মনের মধ্যে একধরনের অচেনা নৃত্য শুরু হয়। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, চোখ দুটি খোলা রেখেই আবার গাঢ় স্বপ্নে ডুবে যায় সে।

৩১. অগ্নির মুঠোর মধ্যে সরু সাপ

আজ বাবুদ্যার অন্য ছগরাগুলান আসে নি। বাইরের খুপরিতে বসে শুধু মদ খাচ্ছে।

প্রভঞ্জন আর গজেন। বকবক করছে সমানে। পাশের ঘরে বসে বসে সেসব শুনছে অগ্নি। জ্যোৎস্নায় ফিং ফুটেছে বাইরে। ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরের নরম আলো দেখতে পাচ্ছে অগ্নি। প্রভঞ্জন জড়ানো গলায় বলছিল তার দুঃখের কাহিনী। বুঝলি গজেন, তুয়ার যেমন দুঃখু আছে মনে, আমারও একটা দুঃখু আছে। বুঝলি, একটা মোটর সাইকেল কিনবার বড় সাধ আমার। রাজদূত। পল্টুদাকে দেখেছু ত, কেমন একটা কইরে মেয়া পিছে লিয়ে হুঁকুবে চলে যায়। শালা, রাজদূতে চইড়্লে একটা জোস্ আসে মনে। পিছনে যদি একটা মেয়া বুইসে থাকে ত আর বইল্‌তে লাগে না। বাবাকে বইল্‌লে, বাবা খালি কয়, আয়-উপায় কর্, ফের যা খুশি চড়, বাপের পইসা ফুটিয়ে লবাবী কইর্‌তে হব্যেক নাই। বড় দুঃখুবে, গজেন, মনে আমার একতিল সুখ নাই। বলতে বলতে কেমন যেন মিইয়ে যায় প্রভঞ্জন।

একসময় জড়ানো গলায় ডাক পাড়ে, অগ্নি, কুথা গেলি? ইদিগ আয় তো।

অগ্নি ঠায় বসে থাকে।

—অগ্নি—। গজেনের গলাখানি অস্থির, বাবু ডাকছেন, শুনতে লারিস?

অগ্নি উঠে দাঁড়ায় অন্ধকারে। পায়ে পায়ে গিয়ে প্রভঞ্জনদের খুপরির দরজায় দাঁড়ায়। ভেতরে ডিবরি লম্ফখানা টিমটিম করে জ্বলছে। তার লম্বা শিস্ উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। সারা খুপরি জুড়ে মাছভাজা, দেশি মদ আর পোড়া কেরোসিনের গন্ধ মিলেমিশে একাকার। অগ্নির বমি আসে।

অগ্নির শরীরখানাকে ঢুলু-ঢুলু চোখে মেপে নেয় প্রভঞ্জন। জড়ানো গলায় বলে, উ'ঘরে ভূতের পারা বুইসে বইছিস ক্যানে?

—হ্যাঁ, বুইসে রইছিস ক্যানে?

—আয়, পাশে এইসে একটু-চার বস্ দিখি।

—হ্যাঁ, বস না ইখ্যেনে। বাবু বইল্‌ছ্যান।

—আরে, তুযাদ্যারকে ভালবাসি বলেই না আসি।

—হ্যাঁ, বটেই তো, বাবু আমাদ্যাবকে ভালবাসেন বলেই না আসেন।

—লচেৎ সিংহবাবু বংশের ছেইলা হয়ে বাউরি ঘরে বুইসে মদ খায, অমন কথা শুনেছু কুথাও ভূ-ভারতে?

—বটে তো। অমন কথা শুনেছু কুথাও ভূ-ভারতে?

—বাবা জাইন্‌থে পারলে, জুতাপিটা করবেক। প্রভঞ্জন দোষীদোষী ভাব ফুটিযে হাসে। বলতে বলতে সহসা ক্ষোভে ভরে যায় প্রভঞ্জনের সারা মুখ। বলে, তুযারা বটে ভালবাসার মূল্য দিতে জানিস নাই।

—বটে তো, ভালবাসার মূল্য দিতে জানা চাই।

—কী না কচ্ছি তুয়াদ্যার তরে? কুন্ অভাবটা রেখেছি তুয়াদ্যার?

—বটে তো, বাবু আমাদ্যার কুন্ অভাবটা রেখেছেন?

বলতে বলতে গজেন আচমকা প্রভঞ্জনের পা দুটো জড়িয়ে ধরে, অমন একখান বাবু, কে কবে পেইছে এ দোনিয়ায়?

অগ্নি সেটা জানে। প্রভঞ্জন বহুৎ কিছু দিচ্ছে। বহুৎ টাকা ঢালছে গজেনের সংসারে। গজেন ওকে শাড়ি, শাযা, বেলাউজ এনে দিয়েছে। তা বাদে গন্ধ সাবান, পাউডার, সোনো, মাথার টিপ, ফিতা, কাঁটা ..। পয়লা চটকায় বুঝতে পারে নি অগ্নি। ভেবেছে, মাস-মাইনা পাচ্ছে, তা বাদে, টুকটাক দালালি-টালালি করে, তালগাছে উঠে তাল পেড়ে দেয়, মৌচাক ভেঙে দেয়...এসব বাবদও কিছু আসে। মানুষটা ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়েছে, এমন ধারণা থেকেই অগ্নি এসব ভাবত। কিছুদিন বাদেই তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। অগ্নি বুঝতে পারে, গজেন নয়, এসব প্রভঞ্জনই কিনে এনে গজেন মারফৎ জুগিয়ে চলেছে। কেন জুগিয়ে চলেছে? অগ্নির মনে পড়ে, প্রভঞ্জন একদিন গজেনকে খুব বকাঝকা কবেছিল অগ্নির বেশভুষা নিয়ে। বউটাকে অমন মলিঙ্গি, ঝাঁপড়াভূতেব মতন রেইখেছু ক্যানে রে? লিজের বউ, একটু সাজাই গুছাই বাইখ্‌তে লারিস? এই ত উযার সাজগোজের বইস। তারপর থেকেই গজেন আনতে লাগল অগ্নির জন্য শাড়ি, শায়া, বেলাউজ, এবং যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রী। খুশি হয়েছিল অগ্নি। কিন্তু এখন সে বোঝে, গজেন নয়, প্রভঞ্জনই তাকে সাজাতে চায়। কেন সাজাতে চায? কারণটা ভাবতে গিযে মনেব মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে অগ্নি।

ইদানীং আর প্রভঞ্জন অত বাখঢাক করে কথা বলে না। পেটে দু'চার ফোঁটা পড়লেই তার মুখ খুলে যায়। তখন প্রকাশ্যে অগ্নির রূপেব প্রশংসা করতে শুরু করে। বলে, যা বল্ গজেন, বউটি তুয়ার ফাস-কেলাস! বামুন-কায়েতেব ঘরেও অমন একটা 'ফিগাব' পাওয়া দুষ্কর। শালা তুয়াব কপালটি ভাল। শুনতে শুনতে নেশায় চুর গজেন অবোধ হাসি হাসে। বলে, উই লিয়েই ত শালীব অত দেমাক। মাটিতে পা পইড়্‌তে নাই চায়।

অগ্নি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। প্রভঞ্জন অগ্নির দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকে। এক সময় ফিক করে হাসে, বুঝলি গজেন, যদি কুনোদিন রাজদূতটা কিনি তো পখমেই অগ্নিকে পিছে লিয়ে চইলে যাব বিষ্টুপুর। এ আমার একখান সাধ। আগাম জানাই রাখল্যম তুয়াকে। গজেন লম্বা এক ঢোক খেয়ে নিয়ে বলে, বটে ত। শুনতে শুনতে অগ্নিব শরীরে, মনে বিষ চারাতে থাকে নিঃশব্দে। বিষের জ্বালায় অস্থিব হয়ে ওঠে সে। রাত বাড়ে।

অনেক রাতে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ায় প্রভঞ্জন। উঠোনখানি পেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। পেছন পেছন হাঁটতে থাকে গজেন। রোজই ওকে খানিক পথ এগিয়ে দিয়ে আসে সে।

অগ্নিও তার শ্রান্ত, বিধ্বস্ত, শরীরখানি কোনও গতিকে টানছিল। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের খুপরিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে. সারা শরীর অসাড় হয়ে আসছিল। চোখ দুটি জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল অনেক জাতের সরীসৃপ। মগজের মধ্যে অসহ্য গুমোট। সরীসৃপগুলো গুমোট সইতে না পেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। তা সত্ত্বেও শরীরের ও মনের প্রবল কষ্টকে উপেক্ষা করে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ-দুটি মুদে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে চাইছিল অগ্নি, সহসা চমক খায় মানুষের হাতের ছোঁয়ায়। চোখ খুলে দেখে খুপরির মধ্যেকার ডিবরি লম্ফখানি নেভানো, এবং একজোড়া শক্ত-সবল হাত তার শরীরখানাকে প্রবল শক্তিতে জাপটে ধরেছে। নিকষ অন্ধকারের মধ্যেও

অগ্নি টেব পায় মানুষটি গজেন নয়। গজেনের শরীর এবং শরীরের গন্ধ তার চেনা। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীবে সতর্কতার ঘন্টা বেজে যায়। শরীবের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ছাড়িয়ে নিতে চায় নিজেকে। সমস্ত শরীরকে ভয় পাওয়া কেন্নোর মতো গুটিকে কুণ্ডলি পাকিয়ে নিতে চায়। কিন্তু হাত দুটোর অধিকারী এতখানি শক্তিশালী যে, অগ্নি যতই ছাড়িয়ে নিতে চায় নিজেকে, ততই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যেতে থাকে। লোকটা ক্রমশ অগ্নির বুকের ওপর স্থাপন করতে থাকে আপন রোমশ শরীর। অগ্নি টেব পায পুবোপুরি উদোম সে শরীর,অন্তত কোমর অবধি তো বটেই। প্রবল ত্রাসে, আক্রোশে, অগ্নি ওর পিঠখানায় খামচাতে থাকে দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে। ওর মাথার চুলগুলোকে মুঠো কবে ধরতে চায়। আর তখনই সে টের পায় দেশি মদের ঝাঁঝালো গন্ধসহ একতাল ভারি নিঃশ্বাস তাব মুখের ওপর স্থায়ী হতে চাইছে ক্রমশ। অগ্নি মরিয়া হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। পা দু'খানি হাঁটু থেকে ভাঁজ করবার আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে থাকে। এক সময় শরীরের সুমদয় শক্তি জড়ো করে ফেলে দু'পাযে। এবং কোনও গতিকে পা' দুটিকে হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে তুলে ধরতে পারে সামান্য। পরমুহূর্তে প্রবল বেগে জোড়া পায়ের লাথি কষিয়ে দিতে পারে, লোকটার দু'পায়ের সন্ধিস্থল নিশানা করে।

হুড়মুড়িয়ে ছিটকে পড়ে লোকটি। নিমেষের মধ্যে অগ্নি বেতস লতাব মতো সোজা দাঁড়িয়ে তীরের মতো বেরিয়ে আসে বাইরে। এক লাফে গাং-দিয়ালি পেবিয়ে উঠোনে নামে। তখন তার সারা শবীর ভিজে গিয়েছে ঘামে। বুকখনা খেলনা বাঁদরের মতো নাচতে লেগেছে। নাভিমূল থেকে উঠে আসছে প্রবল হিক্কা। সাবা শরীব ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তারই মধ্যে অগ্নি দেখে, চারপাশে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। ঝোপঝাড় দিয়ে ঘেরা তার গোলাকার উঠোনখানিতে যেন কেউ সোনালিরঙের জাল ফেলেছে। ঐ জালের মধ্যে একমাত্র অগ্নি ছাড়া আব কেউই নেই। চকিতে উঠোন পেবিয়ে বাইরে চলে আসে অগ্নি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পায়, পদমদীঘিব ঢালু পাড়খানা যেখানে গিয়ে রুখা ডাঙার সঙ্গে মিশেছে, সেইখানে, ন্যাড়া খেজুর গাছটার তলায কেউ একজন দাঁড়িয়ে। অগ্নির সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। জ্যোস্নার আলোয় মুখখানা স্পষ্ট দেখা না গেলেও লোকটির অবয়বখানি ফুটে ওঠেছে অস্পষ্ট। অগ্নি বুঝতে পারে, গজেনই দাঁড়িয়ে রয়েছে খেজুরগাছের তলায়। অগ্নি দ্রুত পায়ে চলে যায় খেজুবতলায। একেবারে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। এবং সবিস্ময়ে লক্ষ করে গজেনের মুখে একচিলতে সেযানা হাসি স্থায়ী হয়েছে।

অগ্নির চোখে চোখ রেখে গজেন শুধোয, কী হইল্যাক? ছুটে আইলি যে বড়? ডরাইঁ গেইছিস?

অগ্নি রোযে ভেঙে পড়ে। তার চোখদুটি জুনিপোকেব পাবা জ্বলে ওঠে। সাপেব মতো হিসহিসে গলায় বলে, ক্যানে ছুইট্যে আইলাম, তুমি জান নাই?

গজেন তখনও হাসছিল। সহসা উঠোন থেকে ভেসে আসে মদে-জড়ানো গলা, গজেন-গজেন-।

অগ্নি এক ঝলক পিছু ফিরে তাকায়। জ্যোৎস্নার আলোয় টলমল পায়ে উঠোন ভাঙছে লোকটি।

অগ্নির দু'চোখে ফুটে ওঠে হরিণীর ত্রাস। গজেনের দিকে গাঢ় সন্দেহে তাকায় এক ঝলক। তারপর রুখা কল্লাচ ডাঙা ভেদ করে ছুটতে থাকে অশরীরীর মতো। মাঝডাঙায় পৌঁছেই তার খেয়াল হয়, বাঁ হাতের মুঠোয় কিছু শক্ত করে ধরা রয়েছে। সরু সাপের মতো অবয়ব সে বস্তুর। তখন মুঠি খুলে দেখবারও বুঝি সময় নেই তার। ত্রস্ত হরিণীর গতিতে সে ছুটে চলে শালকাঁকি বাউরিপাড়ার দিকে।

৩২. ত্রাণমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা

সারা বিষ্টুপুর শহর তোলপাড়। সর্বত্র সাজো সাজো রব। ত্রাণমন্ত্রী জেলার খরা পরিস্থিতি দেখতে আসছেন। সেই উপলক্ষে রসিকগঞ্জের মাঠে বিশাল জনসভা। এটি তাঁর নির্বাচনী জনসভাও বটে। রাজনৈতিক নেতাদের সমস্ত সভাই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী জনসভা। মন্ত্রীর সফর বলে কথা, রামকমল চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর হাজরারা তো রয়েছেনই, সমগ্র জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীও বেজায় চাঙ্গা। ইতিমধ্যেই ডি-এম একটা মিটিং করেছেন জেলার অফিসারদের নিয়ে। আপ-টু-ডেট রিপোর্ট সংগ্রহ চলছে। নানা মন্ত্রণা, জল্পনা-কল্পনা, রাতের ঘুম ছুটে গেছে সকলের। কোন্ কোন্ এলাকায় খরা এ্যাকিয়ুট, কত মানুষ বিপন্ন, কত জমি অনাবাদী, কত গ্রামে জলকষ্ট, কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আরও কী কী চাই,—সব কিছু খতিয়ে দেখা চলছে। মন্ত্রীকে কোন্ কোন্ জায়গা দেখানো হবে, সেটা স্থির করতেই অনেকটা সময় ব্যয় হল। সাকুল্যে খান তিনেক জায়গায় মন্ত্রীমহোদয় যেতে পারবেন দুপুর অবধি। বিকেলে তো আবার জনসভা। সারা জেলার ডজন খানেক এম-এল-এ, সবাই চায়, তার এলাকায় মন্ত্রীর সফর হোক। প্যাঁচপোঁচ করে নিজের এলাকার আগুনকুমারী গ্রামটাকে মন্ত্রীর সফরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন সিদ্ধেশ্বর হাজরা। অনেকেই মুখভার করে ফিরে গেছে।

বিষ্টুপুর শহরের রাস্তাঘাট সাফ-সুতরো করা শুরু হয়েছে। পি-ডব্লু-ডি'র লোকেদের সঙ্গে বিডিও এবং ওভারসিয়ার করালী সোম জীপে চড়ে হরদম ছোটাছুটি করছেন। পল্টু হাজরার দলও বেরিয়ে পড়েছে। মন্ত্রীমহোদয়ের আসন্ন সফর বাবদ শহরের প্রতিটি দোকান থেকে চাঁদা তুলছে ওরা। গত দু'দিন ধরে মাইকে অবিরাম প্রচার চলছে। মন্ত্রীমহোদয় আসছেন! তিনি আসছেন!

দু'দিন আগে এস-ডি-ও স্বয়ং গিয়ে দেখে এসেছেন আগুনকুমারী গ্রামখানা। সঙ্গে ছিলেন বিডিও সাহেব এবং সিদ্ধেশ্বর হাজরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন সবকিছু। তথ্য-পরিসংখ্যান জোগাড় করেছেন প্রচুর। গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একপ্রস্থ ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন। মন্ত্রী এলে কেমন করে দাঁড়াতে হবে, কোন্ প্রশ্নের কেমন উত্তর দিতে হবে, কোন্টা ওরা বলবে, কোন্টা বলবে না,— সবকিছু পাখি পড়ানোর মতো করে বলে এসেছেন। এদিকে বিষ্টুপুর পি-ডব্লু-ডি ডাকবাংলোয়ও বিশাল আয়োজন। মন্ত্রীমশাই সেখানে ঘন্টাকয়েক বিশ্রাম নেবেন।

তার জন্য বাংলোর খোল-নলচে প্রায় বদলে দেবার উদ্যোগ চলছে। সারা বাংলোটাকে নতুন করে রঙ করা হয়েছে। বাগানের ঝোপালো গাছগুলোকে পরিপাটি করে ছাঁটা হয়েছে। প্রতিটি বড় গাছের পায়ে মোজা পরানো হয়েছে। সাদা, সবুজ ও গেরুয়া রঙ দিয়ে তেরঙ্গা মোজা। প্রতিটি ঘরের পর্দা, বিছানা-বালিশের খোল-ওয়াড়, বদলে দেওযা হয়েছে। মেজেতে পাতা হয়েছে নতুন কার্পেট ও পাপোশ। বাথরুম গুলোকে ঘসেমেজে ঝকঝকে করা হয়েছে। ফোল্ডিংগার্ডেন-চেয়ারগুলোতে নতুন ফিতে পবানো সারা। পুরোনো আসবাবগুলোর শবীরে নতুন বার্নিস চড়েছে। বাগানের মধ্যিখানের অকেজো ফোযারাটিকে চালু করবার চেষ্টা চলছে।

বাঁকুড়া থেকে বিষ্টুপুর পর্যন্ত পীচরাস্তাটিকে মেরামত কবা হচ্ছে। দিনরাত কাজ চলছে সেই বাবদ। রাতেব বেলায় হ্যাজাক জ্বালিযে কাজ চালানো হচ্ছে। বেডিওগ্রামে টাকা চাওয়া হচ্ছে, টেলিগ্রামে এ্যালটমেন্ট আসছে রাতারাতি। সর্বত্র একেবাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি।

বিষ্টুপুর স্টেশন মোড় থেকে পরপর চারটি গেট হবে। প্রতি গেটেই শঙ্খহাতে দাঁড়িয়ে থাকবে সারবন্দী কিশোরীব দল। বিষ্টুপুবের সমস্ত স্কুলেব ছেলেবা সারবন্দী দাঁড়াবে রাস্তার দু'ধারে, স্টেশন রোড থেকে রসিকগঞ্জ অবধি। বসিকগঞ্জ মাঠে বিশাল প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। কাঠের পাটাতন দিয়ে মজবুত মঞ্চ। মাইকের চোঙ ঝোলানো হয়েছে এক ডজন। খবব পাওয়ার গেছে, প্রতিবারেই মন্ত্রীমশাই এসে সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শহরেব পুরাকীর্তিগুলি একবাব দেখে নেবার লোভ সামলাতে পারেন না। ফলে মন্দিব চত্বরগুলিতেও আযোজনের ক্রটি নেই। জেলা পাবলিশিটি অফিসেব নেতৃত্বে মন্দিব চত্বর ঝাড়পোছ কবা চলছে। ঝোপঝাড়গুলি কেটে-টেটে সাফ কবছে ব্লকের কর্মীরা। মন্দিরগুলোর ব্যাপারে যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রশ্নের যাতে জবাব দেওয়া যায় চটপট, সেই কাবণে জেলা পাবলিসিটি অফিসার রীতিমতো রাত জেগে পড়াশুনো শুরু করেছেন। মূল সভার আগে সামান্য গান-বাজনা, সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান। যতই খরাপীড়িত হোক, গান বাজনায় বিষ্টুপুরেব দেশজোড়া নামডাক। গান-বাজনা-মতিচুর, তিন নিয়ে বিষ্টুপুর। মন্ত্রীকে তার কণামাত্র হলেও দেখাতে হবে বৈকি। বারবার এমন সুযোগ আসে না। খানাপিনার আয়োজনও সারা। বাঁকুড়া সার্কিট হাউস থেকে ধনঞ্জয়কে আনা হয়েছে রান্নার জন্য। টাটকা গলদা চিংড়ি আনার জন্য ব্লকের একজন কর্মচারীকে টি-এ, ডি-এ দিয়ে পাঠানো হয়েছে কাঁথি। শুধু চিংড়ি নয়, সে কাঁথির কাজুবাদামও নিয়ে আসবে সের-দুই। মতিচুর তো আর পাওয়া যায় না আজকাল, কিন্তু বাঁকুড়ার বিখ্যাত নিখুঁতি মিষ্টি স্পেশ্যালভাবে বানানো হচ্ছে এক্সপার্ট হালুইকব দিয়ে। আর এসবের জন্য, দিনরাত গাড়ি-ঘোড়া যা ছুটছে, পেট্রেল-ডিজেল যা পুড়ছে, তা আর কহতব্য নয়।

পার্টি অফিসে বসে এসব নিয়েই আলোচনা করছিলেন দিবাকর দত্ত, বিমল সরকাররা। বিমল সরকার বলে ওঠেন, দ্যাখো হে, স্বাধীন দেশের মন্ত্রী আসছেন খরা পরিস্থিতি দেখতে, তার জন্য যা আয়োজন চলছে, যত টাকা খরচ হচ্ছে সে বাবদ, ঐ টাকায় জেলার খরা

পবিস্থিতি অনেকখানিই সামলে দেওয়া যেত।

শুনেই ক্ষেপে ওঠেন দিবাকর দত্ত, স্বাধীন? কে বইল্ল্যাক স্বাধীন? তুমি বিশ্বাস কব এদেশ স্বাধীন হয়েছে? উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন তিনি, কোলকাতায় ছিলেন লাটসাহেব, একজন। তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর মেটাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হত। এখন সারা রাজ্যে সাকুল্যে যোলজন বড়লাট। ছোটলাটও অগুনতি। সঙ্গে সহ-লাট, উপ-লাট। আজকাল মন্ত্রীরাই তো লাটসাহেব।

—কিন্তু মাঝেমাঝেই এমন রাজকীয় ভ্রমণ চললে তো দেশে শ্যাল-শাগনা কাঁদবেক।

—কে যেন সেদিন বললেক, সাদা মানুষ গেল, এখন দেশে সাদা হাতীর দৌরাত্ম্য।

—সাদা সাহেবরা অনেক কিছু ইগ্‌নোর করত, কিন্তু এরা সব ব্যাপারে ষোলআনার জায়গায় আঠাব আনা সতর্ক। সর্বদাই ভয়, এই বুঝি দেশি-মন্ত্রী বলে তাচ্ছিল্য করা হল। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেব দরুণ এরা সামান্য কারণেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পান থেকে চুন খইস্‌বাব উপায় নাই।

মন্ত্রীমশায়ের গাড়ি ওন্দা ছাড়াল।

খবরটা পাওয়া মাত্রই চঞ্চল হয়ে ওঠে পুলিশ বাহিনী। ভোঁ-ভোঁ করে খানকয়েক জীপ ছুটে গেল বিড়াইয়ের দিকে।

গনগনে আকাশের তলায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। স্টেশনের পাশে প্রথম গেটের মুখে দলবলসহ অপেক্ষা করছেন রামকমল চক্রবর্তীর দল। শহরের সমস্ত স্কুলেই ছুটি দেওয়া হয়েছে আজ। সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। মাস্টার মশাইবা ছুটোছুটি করে যে-যার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার তদারকি কবছিলেন। প্রাণপণে লাইন ঠিক রাখছিলেন ওঁরা।

বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল, ভাঁপছিল, সেদ্ধ হচ্ছিল। ব্যান্ড বাজছিল তালে-তালে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিড়াই নদীর বাঁক পেরিয়ে সাইরেন-ভ্যানের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যায়। একটা উন্মত্ত শকুন যেন অবিরাম ডেকে চলেছে, ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—। সবাই চোখ মেলে দেখে, সামনের পীচরাস্তা ধরে একটা গাড়ির মিছিল তীব্র বেগে ছুটে আসছে। মুহূর্তে বেজে ওঠে ব্যান্ডে দেশাত্মবোধক সুর। চল্-চল্-চল্, ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধবণীতল...।

প্রথমে মোটর সাইকেল, পরপর দু'খানা। তারপর সাইরেন-ভ্যান, সিকিউরিটি কার, পুলিশ কাব, তাবপর জাতীয় পতাকা পতপতিয়ে ওড়া মন্ত্রীর দুধসাদা গাড়ি। পেছনের গাড়িগুলোতে একে একে ডি-এম, এস-পি, সি-ও-এম-এইচ, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, সবার শেষে এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এবং ওয়্যারলেস-ভ্যান।

গাঁক-গাঁক করে বেজে ওঠে এক ডজন শাঁখ। দু'ধারে সারবন্দী ছেলে-মেয়েরা গলার শিবা ফুলিয়ে উচ্চস্বরে গান ধরে, স্বাগত-স্বাগত- স্বাগত, স্বাগত হে আজি শুভ অতিথি...।

সমবেত সংগীতের মধ্যে গাড়িগুলো হুশ হুশ করে বেরিয়ে যায়। ফুলের মালা এবং চন্দনের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলো বোকার মতো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সারবন্দী কয়েকশো ছেলে-মেয়ে কোরাস গাইতে গাইতে রওনা দেয় রসিকগঞ্জের দিকে, স্বাগত- স্বাগত- স্বাগত, স্বাগত হে আজি শুভ অতিথি....।

রামকমল চক্রবর্তীর বিশাল বাড়ির হলঘরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জমায়েত। দুপুরের চাঁদিফাটা গরমে গলগলিয়ে ঘামছেন বাবুভায়ার দল।

অন্নদা চক্রবর্তী এ জেলার প্রবীনতম নেতা। কিন্তু তিনি এখন বলতে গেলে অথর্ব। হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ। ইদানীং তাঁর হয়ে যাবতীয় কাজকর্ম রামকমলই করেন।

হলঘরে পা দিয়েই মন্ত্রীমশাই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বল, বল, যা বলার আছে জলদি বল। আমার একদম সময় নেই। ফিরতে হবে আজকেই। ঘনঘন ঘড়ি দেখতে থাকেন মন্ত্রীমশাই। উপস্থিত সবাই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এসেই অমন 'যাই যাই' করছেন কেন মন্ত্রী? অত জলদি কি সাজিয়ে গুছিয়ে সবকিছু বলা যায়?

তিনপাশে তিনটে তাকিয়া ঠেস দিয়ে জুত করে পেস্তাবাদামের শরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন মন্ত্রীমশাই। বনবনিয়ে পাখা ঘুরছিল মাথার ওপর। পেছনে একটা টেবিল ফ্যানও। ক্রমশ বাছাবাছা লোকেরা চারপাশে ঘন হয়ে আসে।

—বল না হে, দেরি করছ কেন? আমার যে সময় নেই। মন্ত্রীমশাই একেবারে উতলা হয়ে ওঠেন।

বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হয় সবাইকে।

—তামা আর দস্তার ইমপোর্ট লাইসেন্সটা রিনিউ করতে পাঠিয়েছি, মাসখানেক আগে। এখনও হল না দাদা। ঐ যে শিবশৈলম না কী যেন নাম অফিসারটাব, বড্ড গোল বাধাচ্ছে। ওটাকে তাড়াও জলদি। স্পোর্টস-স্টোট্স্ কোথাও ফেলে রাখ ওকে।

—আমার রাইস মিলের ক্যাপাসিটিটা বাড়াতে চাইছি। লাখখানেক টাকা দরকার। তা, ব্যাঙ্ক এমনই বেগড়বাই করছে...।

—বালুচরী শাড়ি বুনবার জন্য একটা ছোটাসা পাওয়ার-লুম বসাতে মাগছি। স্মল ইস্কেল ইনডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট কিছুতেই পারমিশন দিচ্ছে নাই। বলছে কি, তাঁতীরা নাকি সব বেকার হয়ে যাবে।

—আরে, এসব কী বলছ তোমরা? মন্ত্রীমশাই বিরক্ত হন, খরা দেখতে এসেছি। খরার কথা বল। আমার হাতে সময় বড়ই কম।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। খরা তো হয়েছেই। ফি-বছরই হয়। সবাই দেখে। দেখছেও। এ নিয়ে আর বলার কী আছে?

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে মন্ত্রীমশাই শুধোন, খরার অবস্থা কেমন?

রামকমল চক্রবর্তী তড়িঘড়ি জবাব দেন, ভাল, ভালই।

—ভাল মানে? মন্ত্রীকে বিমূঢ় দেখায়। খরার প্রকোপ কমেছে, না বেড়েছে?

রামকমল চক্রবর্তীর মাথায় অনেকক্ষণ যাবৎ খরার ব্যাপারটা ছিলই না। তাঁর মাথায়

তামা আর দস্তা ঘুরছিল। একটা জুতসই জবাব না খুঁজে পেয়ে তিনি ঘেমে নেয়ে লাল হয়ে ওঠেন। অবস্থা সামাল দিতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে পল্টু হাজরা। এসব সুড্ডাদের কম্মো লয়। দিনকাল বদলাচ্ছে।

—খরা বাড়া-কমার ব্যাপারটা জানতে চাইছেন তো? পল্টু হাজরা একেবারে জলবৎ বুঝিয়ে দিতে চায়, উটা সকালের দিকে কম থাকে, দুপুর নাগাদ ভীষণ বেড়্যে যায়, আবার সন্ধ্যার পর কম্যে যায়।

মন্ত্রীমশাই কটমট করে তাকান পল্টুর দিকে। রামকমলের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধোন, এটি কে?

—এ? রামকমল চক্রবর্তী সামান্য গদগদ হন, আমাদের কামেশ্বরদার ছেলে। সিদ্ধেশ্বরের ভাইপো। পল্টু।

পল্টুর পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেন, লকেটের বদলে একখানা মাদুলি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কেমন দুর্বিনীত চোয়াড়ে চেহারা। বেশ খানিকক্ষণ ওর দিকে স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকেন মন্ত্রীমশাই। তারপর কর্কশ গলায় বলেন, তোমার ঐ একগাড়ি চুলভর্তি মাথায় গান্ধীটুপি ঢোকে কী করে?

পল্টু বিজোড় দাঁত বের করে হাসে। ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকেন রামকমল চক্রবর্তীর দল। সিদ্ধেশ্বর হাজরা বুঝি একেবারে মরমে মরে যান। সবাই চলে-টলে গেলে একান্তে পল্টুর নামটা পি-ডব্লু-ডির কন্ট্রাক্টরিতে এনলিস্টেড কববার জন্য আর্জি জানাবার কথাটা ভেবে রেখেছিলেন। একেবারে গুবলেট করে দিল ছেলেটা। রামকমল চক্রবর্তী অপ্রসন্ন মুখে তাকান পল্টুর দিকে। আজকাল এইসব ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে পার্টি করা এক ঝকমারি। বিনয়, নম্রতা কিছুরই ছিটেফোঁটা নেই এদের মধ্যে। কোনওরকম সংযম নেই। বয়স্কদের সামনে তুড়ি মেরে চলতে চায়। এদের গেলাও যায় না, ওগরানোও যায় না। সারা দেশের রাজনীতিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে দিনদিন। এখন দলের প্রভাব বাড়াবার জন্য বুড়োরা আর তেমন কার্যকরী নয়। এখন নাকি দলে তাগড়া জোয়ান চাই প্রচুর। তেমনি দিনই নাকি আসছে।

খানিকবাদে উঠে দাঁড়ান মন্ত্রীমশাই। বিদায় নেবার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। আগুন কুমারীতে আজ আর তিনি যেতে পারবেন না। তাঁর টাইম নেই একেবারেই।

পি-ডব্লু-ডি'র ডাকবাংলোতে ভুরিভোজ সেরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেন মন্ত্রীমশাই। বাইরে একপায়ে খাড়া থাকে পুলিশ, অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অগণিত মানুষ। আজকাল অল্প পরিশ্রমেই কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েন মন্ত্রীমশাই। সুগার বেড়েছে, প্রেসার বেড়েছে। কিন্তু এসব কথা প্রকাশ্যে উঠলে লজ্জা পান। বলেন, বয়েস তো কম হল না। ষাট পেরিয়ে গেছে কবে।

—এ আর এমন কি বয়েস দাদা? রামকমল চক্রবর্তীর দল হৈ-হৈ করে ওঠেন।

—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শরীরের ওপর তো কম অত্যাচার হয় নি হে। সে সব যাবে কোথায়? এখন বুড়ো শরীর পেয়ে শোধ নিচ্ছে।

সেটা অবশ্য ঠিক। দুনিয়ার মানুষ জানে, আজন্ম সত্যাগ্রহী এই মানুষটির কৃচ্ছ্র সাধনের

কথা।

—কম জেল তো খাটিনি এই ছোট্ট জীবনে। একবার গান্ধীজীর সঙ্গে। একবার যতীন সেনগুপ্তর সঙ্গে। শরৎ বোসের সঙ্গেও একবার ঢুকেছি। অনশন সত্যাগ্রহও করেছি একবার নাগাড়ে বাইশ দিন।

—তবে? এসবে শরীরের ক্ষয় হয় না?

বেলা চারটে নাগাদ সেজেগুজে রসিকগঞ্জের মাঠে বক্তৃতা দিতে চলেন মন্ত্রীমশাই।

বিশাল প্যান্ডেল আর মঞ্চ বানানো হয়েছে এস-ডি-ও'র বাংলোর গা ঘেঁসে। মঞ্চখানার জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মঞ্চের মাঝ বরাবর পুরু গদির ওপর কাশ্মিরী জাজিম পাতা। তিনদিকে তিনখানা মোটাসোটা তাকিয়া। মন্ত্রীমশাই বহুকষ্টে ওঠেন মঞ্চের ওপর। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেন। বাছাকাছা জনাকয়েক বসেন ওঁর পেছনে। মঞ্চের সামনে অনেক মানুষ। গাঁ-গঞ্জ থেকে আনা হয়েছে তাদের। শহরের স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাস্টার মশাইরা তো উপস্থিত রয়েছেন সেই দুপুর থেকেই। আশেপাশের গ্রামগুলোর ইস্কুল থেকেও ছাত্রদের নিয়ে হাজির হয়েছেন মাস্টার মশাইরা। চারপাশের গাঁগুলো থেকে জোতদাররা সব হাজির হয়েছে দলে দলে। প্রত্যেকেই সঙ্গে এনেছে কিছু চাষাভুষো উদোম বশংবদ মানুষকে। মূলত খিঁচুড়ির লোভেই এসেছে ওরা। এই দারুণ খরার দিনে গাঁ-গঞ্জের অধিকাংশ গরীব মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে বেঁচে রয়েছে। এ সময়ে দু'হাতা হলুদ রঙের খিঁচুড়ি অনেক মায়া জাগায় ওদের মনে।

উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইলেন প্রমথেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীমশায়ের সামনে গাইছেন বলে একটু গলা কাঁপিয়ে ক্লাসিক্যাল টাচ দিলেন। 'পারাবত সাংস্কৃতিক চক্র' পরিবেশন করল অনেক নাচ। শহরের বাছাবাছা বাড়ির লালটুশ মেয়েরা মাথায় ময়ূরের পেখম গুঁজে সাঁওতালি নাচ দেখাল। 'দারুণ অগ্নিবাণে রে—।' গানের তালে তালে নাচল রামকমল চক্রবর্তীর নাতনি মণিদীপা। মন্ত্রীমশাই পিটপিট করে সবকিছু দেখতে থাকেন। বিস্ফারিত নয়নে দেখে গ্রাম থেকে আসা কয়েকশো উদোম ভাজাভাজা মানুষ। মণিদীপার গোলাপি ঘাঘরায় লাল-নীল-সবুজ আলো পড়ে বিচিত্র বর্ণালির মায়া সৃষ্টি হয়।

এবার বক্তৃতার পালা। মন্ত্রীমশাই বসে বসেই বক্তৃতা দেবেন। সেইমতো মাইকের মাউথপীসখানা সেট করা হয়। বেশ জুত করে বসে গলাটা বারদুই মোলায়েম ঝেড়ে নিয়ে মন্ত্রীমশাই শুরু করেন, গান্ধীজী নে সেহি বাত বোলা, আরাম হারাম হ্যায়।

—আরে, করছেন কি দাদা? রামকমল চক্রবর্তী পেছন থেকে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, এটা বেঙ্গল।

অকস্মাৎ বাধা পেয়ে বিরক্তি মাখানো মুখে পেছনে মুখ ফেরান মন্ত্রীমশাই।

রামকমল ফিসফিসিয়ে বলেন, বাংলায় বলুন, বাংলায়। সাদামাঠা বাংলায়। সম্ভব হলে দু'চারটে বাঁকুড়ি ভাষার ফোড়ন দিন।

আসলে, গেল ক'দিন বিহার ও পুরুলিয়া এলাকায় একাধিক ভাষণ দিয়ে আজই বাঁকুড়ায় ঢুকেছেন মন্ত্রীমশাই। হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে দিতে ঐ ঘোরটা কাটেনি এখনও।

সামলে নিয়ে বাংলোতেই শুরু করেন।

...আজ এই জেলার অগণিত খরাক্লিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে, তাঁদের দুঃখেব শরিক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই যে আমার সামনে গ্রাম-গঞ্জের অগণিত মানুষ, এরা আমার ভাই। এরা আমার বন্ধু। এরা আমার স্বজন। আত্মার আত্মীয়। আমাব বুকের এই—এই—এইখানটাতেই ওঁদের স্থান। এই দুর্দিনে ওঁদের পাশে এসে দাঁড়ানো, প্রাণকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়া, এই জন্যই আমার রাজনীতিতে আসা। এই যে, বাঁকুড়া জেলায় নিদারুণ খরার প্রকোপ চলছে, এই যে হাজার হাজার মানুষ অশেষ দুর্দশা ভোগ করছেন, এ সবই আমার বুকে শেল হয়ে বেজেছে। তাইতো আমি ছুটে এসেছি, আপনাদেব পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য। আমি কথা দিচ্ছি, এ জেলার মানুষকে নিদারুণ খরার হাত থেকে বাঁচাতে এমন কোনও কাজ নেই যা আমি করব না। এমন কোনও ক্লেশ নেই যা আমি সইব না। এমন কোনও দায়িত্ব নেই যা আমি বইব না। এইযে নিদারুণ খরা—। এইযে আপনাদের ক্লেশ—, এই যে আপনাদের ..।

রামকমল চক্রবর্তী মনে মনে নিদারুণ বিরক্ত হচ্ছিলেন। একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে কাঁহাতক মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনবে! পেছন থেকে ফিসফিসিয়ে বলতে থাকেন, নতুন কথা বলুন, দাদা, নতুন কথা বলুন। আগামী ভোটে কাকে ভোট দিতে হবে, সে কথা বলুন। দল থেকে যারা বেইমানি করে বেরিয়ে গিয়েছে, আগামী নির্বাচনে তাদের মুখের মতো জবাব দিতে হবে, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে, সে কথা বলুন...।

৩৩. খরার ফসল পাকল

পরপর সাতদিন কাজ চলেছিল।

বুদ্ধদেবের ইচ্ছা, আরও দিন-সাতেক হলে পর বিডিও সাহেবকে নিয়ে আসবে স্কীমে।

এতদিন কাজ হল, করালী সোম একদিনের তরেও দেখতে আসে নি। এমনিতে সে মাটি-কাটার স্কীমে বড় একটা যায় না। ব্লকে অনেক সময় একসঙ্গে আট-দশখানা স্কীম চলতে থাকে। একজনের পক্ষে এত কাজ ঘুরে ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। মাটি-কাটার কাজ ছাড়াও ব্লকে চলছে অন্য ধরনের কাজ। পুল-কালভার্ট, পাকা-বাঁধ। এসব হল উঁচুজাতের কাজ। সবদিক থেকেই। করালী অষ্টপ্রহর ঐ সব কাজেই ব্যস্ত থাকে। মাটি-কাটা স্কীমের যাবতীয় কাজকর্ম সে অফিসে বসে করে দেয়। ছকে ফেলা কাজ সব। মোহবার মাটি মাপবে, সেইমতো পে-মাস্টার মজুরি দেবে, অফিসার-ইনচার্জ দেখেশুনে সই দেবে। সমস্ত কাগজপত্র দেখে করালী কেবল 'ভেরিফাইড এন্ড ফাউন্ড কারেক্ট' লিখে সই করে দেবে মাস্টার-রোলের তলায়। ব্লকে বসেই এইসব সই-সাবুদ সারে সে। সাতদিনের কাজে একদিনেই সই মারে। আসলে, সই মারাটা ওর কাছে কোনওকালেই কাজের উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে না। মধু থাকে অন্যত্র। স্কীমের মোট টাকার শতকরা দশ ভাগ দিয়ে যেতে হয়। তবেই স্কীমের কাগজে হাত ছোঁয়ায় সে। এলাকায় কিছু খানদানি পে-মাস্টার তৈরি হয়ে গিয়েছে, তারা এসব গূঢ় তত্ত্ব জানে। তারা একফাঁকে এসে পুজো চড়িয়ে যায় নিঃশব্দে। কাক-পক্ষীতেও টের পায় না। পরের দিনই বিডিও সাহেবের টেবিলে করালীর সুপারিশ সমেত পে-মাস্টারেব পরবর্তী এ্যাডভান্স-এর আবেদনপত্রখানি ঠিকঠাক পৌঁছে যায়।

ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বার-কয় তাগাদা দিয়েছে করালীকে, চলুন করালীদা, রাস্তাটা কেমন হচ্ছে, দেখে আসবেন চলুন।

করালী রহস্যময় হাসে, কী আর দেখব? তুমি যেখানে স্বয়ং সুপারভাইজ করছ—।

'না, না, তবুও একবার দেখা দরকার।'

'যাব, যাব। সময় হলেই যাব'। বলতে বলতে ঘন করে আলমোড়া ভাঙে করালী। কপালোর বলিরেখাগুলিতে সারবন্দী ঢেউ খেলিয়ে চোখদুটিকে রোমান্টিক করে তোলে। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে খুব নাটকীয় গলায় বলে, সময় আসিলে আপনি আবার যাইব তোমার কুঞ্জে।

বিডিও সাহেব একটা ফাইল পড়ছিলেন মনোযোগ সহকারে। বুদ্ধদেব ঘরে ঢোকে।

অপাঙ্গে একটিবার ওকে দেখে নিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বলেন বিডিও সাহেব। তারপর পুনরায় ডুবে যান ফাইলে।

বুদ্ধদেব সামান্য বিস্মিত। বিডিও সাহেব ওকে নিজের থেকে বসতে বলেন নি কোনও দিনও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাউকেই বলেন না তা। আজ হঠাৎ এমন বিপরীত ব্যবহারে সামান্য হকচকিয়ে যায়। বসে।

একটু বাদে ফাইল থেকে চোখ তোলেন বিডিও সাহেব। চোখ থেকে চশমা খুলে মুছতে থাকেন রুমালে।

—কাজটা চল্‌তাসে?

—হ্যাঁ, স্যর। আপনাকে একবার দেখতে যেতে হবে। সবাই চাইছে।

বুদ্ধদেবের কথাগুলো বিডিও সাহেব শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। টেবিল থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে এগিয়ে দেন বুদ্ধদেবের দিকে।

—এটা পড়।

বুদ্ধদেব পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে তার মুখের রেখাগুলো ভাঙতে থাকে অজান্তে। নাকের পাটা ফুলতে থাকে। কপাল টানটান হয়ে যায়। কানদুটো গরম হতে থাকে।

স্কীমটার বিরুদ্ধে পাবলিক পিটিশন। সরাসরি চুরির অভিযোগ এবং তদন্তের দাবি। সাকুল্যে দশ-বারোখানা টিপসই।

হাতের লেখাটা খুবই চেনাজানা ঠেকছে। কিন্তু উপস্থিত মনে পড়ছে না ঠিকঠিক। টিপ-সইগুলোর মধ্যে রয়েছে রতন শিকারি, কেবল লায়েক, অধর ঝারমনিয়া, ইন্দ্র বাগদি, পোস্তো লায়েক, এমন কি দুধের বাচ্চা মাকুন্দ শিকারিরও নাম। বাবু-ভায়াদের নাম নেই একজনারও।

বুদ্ধদেব কাগজ থেকে মুখ তুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিডিও সাহেবের মুখের দিকে।

'বুঝলা কিছু?' বিডিও সাহেব যেন খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, 'এ কী শুনি? কাম শুরু না হইতেই যে চুরির কমপ্লান! কেমন সুপারভাইজ কর্‌লা তুমি?'

বুদ্ধদেবের কানদুটো নিঃশব্দে পুড়ছিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে তার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাবদাহ শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তাও কোনমতে উচ্চারণ করে, আপনি এটা বিশ্বাস করেন, স্যার।

--আরে, আমাগো বিশ্বাস করনে, না করনে কী আসে যায়। পাবলিক তো বিশ্বাস কর্‌ল। আমাদ্যার হইল গিয়া পাবলিক লৈয়া কাম।

অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বুদ্ধদেব।

এক সময় বলে, বেশ, আপনি তাহলে তদন্ত করে দেখুন।

—আরে, তদন্ত তো হইবোই। করালী কাল সক্কালেই যাইবো গা। কিন্তু লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা যায়। অতঅত কাম চল্‌সে ব্লকে, কোনও কমপ্ল্যান ত আসে নাই এখনো অবধি। ডিস্ট্রিক্ট অফিসে এ ব্লকের কত নাম! হেই নামটাই ডুবাইয়া দিলা তোমরা?

বুদ্ধদেবের বুকখানা ফালাফালা হচ্ছিল নিঃশব্দে। তাও কোনমতে বলতে পারল, এখনও তো কিছু প্রমাণ হয়নি, স্যর। তদন্ত করলেই বুঝতে পারবেন সবকিছু। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বুদ্ধদেব।

বিডিও সাহেব বলেন, আর, শোন, ইনকুয়ারি না শেষ হওয়া অবধি কাজটা বন্ধ রাখ। আর, যে ক'দিন কাম হইসে, তার মাস্টাররোলগুলা জমা দিয়ে দাও। আজ অবধি মাস্টাররোল জমা দাও নাই ক্যান? পেমেন্টের পর পরই মাস্টাররোল জমা দেওয়া লাগে। মাস্টাররোল নিজের কাছে বেশিদিন রাখলেই সন্দেহ হয় মাইন্‌ষের। কিনা, ঘরে বইসা কিছু ম্যানুফ্যাকচার কর্‌ত্যাসে বুঝি।

মাস্টাররোলগুলো নিজের কাছে রেখেছে বুদ্ধদেব। করালী সোম বলেছে রেখে দাও, এক সঙ্গে দিও। আমার এখন দেখে নেবার সময় নেই। বলে নাওযা খাওয়ার সময় পাচ্ছি না।

বিডিও সাহেবকে আর এতকথা বলে না বুদ্ধদেব। বলেছে, কালই ওগুলো জমা দিয়ে দেবে।

একখানা ভারি পাথর মাথায় চাপিয়ে বুদ্ধদেব বেরিয়ে আসে বিডিও সাহেবের ঘর থেকে। না, তদন্তে কী বেরোবে, এই আশঙ্কায় নয়, কাজটা যে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, সেই কারণে। অতগুলি মানুষের দৈনন্দিন রুজি-রোজগারের উপায়, ক্ষুধার খাদ্য, বেঁচে থাকবার অবলম্বন, কয়েকটা মাত্র কালির আঁচড়ে একেবারে নাকচ হয়ে গেল! কাল থেকে আবার ওদের উপোস। কাল থেকে আবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে বাঁচতে হবে ওদের। মালিকের লাল খাতায় টিপ দিতে দিতে ওদের শুরু হবে. শেষ হবে, এক একটি দিন।

কিন্তু পরের দিন তদন্তে আসে না কেউ। দুপুর অবধি স্কীমের ধারে বসে বসে ফিরে আসে বুদ্ধদেব, সুকুমার আর হঠাৎ বাউরি।

বিকেল নাগাদ ব্লকে এসে শোনে, পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। করালী সোম

তদন্তে যেতে আপত্তি জানিয়েছে। বিডিও সাহেবকে লিখিতভাবেই জানিয়ে দিয়েছে সে। তদন্তে অন্য কেউ যাক, সে যাবে না কিছুতেই। যুক্তি হিসেবে বলেছে, কিছুদিন আগে করালীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল বুদ্ধদেব, অবশ্যি প্রমাণ করতে পারে নি কিছুই, তবুও এক্ষেত্রে করালী তদন্ত করে যাই রিপোর্টই দিক না কেন মনঃপূত হবে না বুদ্ধদেবের। যদি, বাই চান্স, রিপোর্ট চলে যায় বিরুদ্ধে তো বুদ্ধদেবের মনে হবে করালী তার অপমানের শোধ নিল। কাজেই, করালী, সবদিক ভেবে চিন্তে প্রস্তাব দিয়েছে, পি-ডব্লু-ডির এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে অনুরোধ করা হোক, তিনি যেন তাঁর কোনও এস-এ-ই'কে দিয়ে তদন্ত করিয়ে রিপোর্ট দেন।

এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখেছেন বিডিও সাহেব।

বিকেল নাগাদ চুয়ামসিনায় ফিরছিল বুদ্ধদেব। সারা পথ অনেক ভাবনা ভিড় করেছিল মাথায়। হরিণমুড়ির পুলের কাছাকাছি পাশ দিয়ে গাঁক্‌গাঁক্‌ করে রাজদূত ছুটিয়ে চলে গেল প্রভঞ্জন। পেছনে প্রমথ গাঙ্গুলির মেয়ে মীরা।

মাস দু'তিন একখানা মোটর সাইকেল কিনেছে প্রভঞ্জন। দীর্ঘদিন যাবৎ একখানা মোটর সাইকেলের স্বপ্ন দেখে চলেছিল সে। পল্টু হাজরাকে দেখতে দেখতে স্বপ্নটা গাঢ় হয়েছে। সবাই বলছে, লঙ্গরখানা চালানোর সুবাদেই এটা সম্ভব হয়েছে। বারবার বলা সত্ত্বেও লঙ্গর খানার কোন হিসেবই প্রভঞ্জন দেখায় নি বুদ্ধদেবকে। অনেকদিন অশান্তি করেও কোনও লাভ হয়নি। কত টাকা সরাতে পেরেছে, তা সম্যক জানা নেই বুদ্ধদেবের। তবে বুদ্ধদেব দেখেছে, লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ার পরপরই স্বপন গাঙ্গুলি একখানা ঝাঁ চকচকে সাইকেল কিনে নিয়ে এল। হারক্যুলিশ। সাইকেলে ডায়েনামো অবধি লাগানো। আর, তার ঘন্টিখানা সাধারণ সাইকেলের মতো ক্রিং-ক্রিং বাজেনা, বোতামে চাপ দিলে ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ বেরোয়। রতিকান্তর ছেলে ভৈরব গোস্বামী কিনেছে একখানা ট্রানজিস্টার রেডিও। তাতে, গুটিয়ে ফেলা যায় এমন এরিয়েল রয়েছে। চামড়ার কভারের সঙ্গে ফিতে লাগানো। দিন কতক বাঁধে রেডিও ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াল সে। আর, তার দিনকতক বাদে চুয়ামসিনাকে আলো করে প্রভঞ্জনের রাজদূত। প্রভঞ্জন দাবি করে, পদম পুকুরে মাছের চাষ করে সে যা লাভ করেছে, তার থেকেই কিনেছে রাজদূতখানা। মানুষের সন্দেহ হয়েছে তাতেই। যদি সে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ওটা কিনেছে বলে দাবি করত, তবে অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করত সে কথা। কারণ, হরবল্লভের মতো মানুষ ইচ্ছে করলে যখন তখন একখানা রাজদূত কিনে দিতে পারেন প্রভঞ্জনকে। কিন্তু পদমদীঘির মাছ বিক্রি করে রাজদূত? মাছ সে বেচল কবে? চারা অবস্থা থেকেই তো ভেজে ভেজে খেয়ে ফেলল। পদমদীঘির মাছ যদি কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে বেচে থাকে তো সে গজেন। অনেকেই তাকে শেষরাতে মাছ নিয়ে বিষ্টুপুর যেতে দেখেছে। কাজেই, রাজদূত কেনার গল্পের মধ্যে পদমদীঘির মাছ চলে আসায়, আজ আর কারোর মনেই সন্দেহ নেই যে লঙ্গরখানা থেকে চুরি করেই তিন-মূর্তি কিনে ফেলেছে তিনখানা সখের সামগ্রী, এবং ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিমাণ যে সামাজিক কৌলিন্য, প্রভাব ও প্রতিপত্তির নিরীখে স্থির হয়েছে, তা তিনটি সামগ্রীর জাত

দেখলেই মালুম হয়।

প্রভঞ্জনের রাজদূত হারিয়ে যায় ঠাকরান পুকুরের বাঁধের আড়ালে। মীরার শাড়ির আঁচল উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মীরাকে পেছনে বসিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব জানে, ওকে কস্মিনকালেও বিয়ে করবে না প্রভঞ্জন। সেটা সে এক দুর্বল মুহূর্তে আচমকা কবুল করে ফেলেছিল বুদ্ধদেবের কাছে, যখন প্রথম দিকে সারাক্ষণ লেপটে থাকত ওর সঙ্গে। বলেছিল, বাবা বলেন, উষাপদ স্যাঁকরাকে দ্যাখ্, গয়না গড়াতে গেলে প্রথমেই জিগাবে, ঘরের জন্যে, নাকি কারুকে দিবেন? দেওয়া-থোওয়ার সামগ্রী হলে কেবল ওজনটাই জেনে নেয়। আর, বাড়ির জন্য শুনলে, তখন বের করে ডিজাইনের খাতা। তখন সবক্ষেত্রেই হরেক বিচার তার। মাল অনেক বেশি দেবে, কোথায় কোথায় পাথব বসালে খুলবে, তাই নিয়ে ভাবতে বসবে। বলে, সবদিনের ব্যাভারের চিজ, যেমন-তেমন কইর্‌লে চলে?

লিজেদ্যার ব্যাভারের চিজ সদা-সর্বদা পোক্ত কইরে বানাতে লাগে।

হরবল্লভ এই কথাটাকে জীবনেব সর্বক্ষেত্রেই মান্য করে চলেন। নিজের চিরদিনেব ব্যাভারের চিজটিকে সর্বদা দেখেশুনে কিনতে হয়।

ছেলের বউ নির্বাচনের ব্যাপারেও তার ব্যত্যয় হবে না। প্রভঞ্জন সেটা ভাল করেই জানে। এবং মানে।

বলেছিল, ফুর্তি করা এক চিজ, আর বিযা করা অন্য। পন্টুদা যে দিনরাত অতঅত মেয়াকে লিযে ঘুরে বেড়ায়, সক্কলকে বিযা কইর্‌বেক নাকি উ? তাইলে ত উয়ার ঘরে একটা হারেম হবেক! নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছিল প্রভঞ্জন।

পন্টু হাজরার লাম্পট্যের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে ভাবতে কুন্তীর মুখখানা ভাসতে থাকে। কুন্তীও কিছুদিন এন্তার ঘুবে বেড়িয়েছিল পন্টুর সঙ্গে। পন্টু ওর সর্বনাশ করেছিল। কুন্তীর পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল। কনকপ্রভা অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছেন সেই পরিস্থিতি। সেই থেকে খুবই ম্রীয়মান হয়ে গেছে মেয়েটা। ওপড়ানো লতার মতো ঝামরে গিয়েছে। কিছুই নজর এড়ায় না বুদ্ধদেবের। মেয়েটা নিতান্ত বোকার মতো আটকে গিয়েছিল পন্টুর হাতের মুঠোয়। তখন লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াত ওরা। দু'দিন অন্তর পন্টু তার রাজদূত হাঁকিয়ে আসত, বুক চিতিয়ে কনকপ্রভার মহলে ঢুকে যেত, একটুবাদে কুন্তীকে তুলে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যেত শতজনের সুমুখ দিয়ে। ইদানীং পন্টু আর আসছে না।

কুন্তী যখন ঝড়ের বেগে সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছিল, বার দুই ইঙ্গিতে, এবং একবার সবাসরি কথাটা কনকপ্রভার সামনে তুলেছিল বুদ্ধদেব। কনকপ্রভা তেমন করে বাজেননি। বরং কুন্তীর পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, তাতে কি? পন্টু ত আমাদের পর নয়। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের দু'তিন পুরুষের ওঠাবসা। কত বড় বংশের ছেলে। বাপ কত বড় একজন মানুষ! সেই ব্রিটিশ আমলের কন্ট্রাক্টর। তার ওপর আবার স্বাধীনতার সংগ্রামী। কাকা এম-এল-এ। কুন্তী তো কোনও খাটো ঘরের ছেলের সঙ্গে মিশছে না।

বুদ্ধদেব বুঝতে পাবে না, মা হয়ে কনকপ্রভা কী বিবেচনায় কুন্তীকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। পল্টুর সঙ্গে মেয়ের মেলামেশার সূত্র বেয়ে বেয়ে তিনি কি এই এলাকাব সবচেয়ে শক্তিমান পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিলেন? নাকি, পল্টুকে নিয়ে তাঁরও কোনও গোপন স্বপ্ন বাসা বেঁধেছিল মনে। পল্টুরা জাতে এক নয়। কনকপ্রভা কি পল্টুর সঙ্গে কুন্তীব বিয়েটাকে মঞ্জুর করে বসেছিলেন মনে মনে? সামাজিক নিয়মকানুন থেকে কি এতটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কনকপ্রভা। যদি আসেনও, বুদ্ধদেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পল্টু কখনোই কুন্তীকে বিয়ে করবে না। বিয়ে করবার জন্য মিশতই না সে। বুদ্ধদেবের কোনই সন্দেহ ছিল না, কুন্তীকে চুষে চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে পল্টু। কনকপ্রভা যখন নিজের মারাত্মক ভুলখানা বুঝতে পারলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

রাগে, অভিমানে, আকণ্ঠ বিরূপতায অনেক আগেই কুন্তীকে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছিল বুদ্ধদেব। তাছাড়া, শেষের দিকে কুন্তীর আর লেখাপড়ায় মন ছিল না। এবং অবাককাণ্ড, কনকপ্রভাও আর ঐ নিয়ে পীড়াপীড়ি করেন নি বুদ্ধদেবকে।

বুদ্ধদেব ইদানীং আর কনকপ্রভাব মহলে যায় না। দীপমালাও আনাগোনা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। সুযোগ পেয়ে নিকুঞ্জপতি, রতিকান্ত, পান্নালালের দল পুনবায় পূর্ণ উদ্যমে মৃগযায নেমে পড়েছে।

কনকপ্রভা দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছেন। চৈত্র-বৈশাখেব গ্রীষ্মে যেমন করে শনৈশনৈ নেমে যায় কুয়া-ইঁদাবার জল, ঠিক তেমন করেই ক্রমশ তলানির দিকে ভীমবেগে এগিয়ে চলেছেন কনকপ্রভা।

শুধু একটা বিষয়ে রহস্যের কূলকিনারা পায় না বুদ্ধদেব। কনকপ্রভা যখন ওর কাছে কুন্তীব বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, বুদ্ধদেব ওর মতামতটা জানাবার জন্য সময় চেয়ে ছিল। কিন্তু তার আগেই কুন্তী স্পষ্টভাষায় 'না' করে দিল। কেন? প্রথম যৌবনেব রঙিন নেশায় পল্টুর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত মেশামেশি করলেও বুদ্ধদেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কুন্তী বুদ্ধদেবকেও মনেমনে ভাল বাসত। পল্টুর প্রতি যেটুকু আকর্ষণ, তাতো ইতিমধ্যেই কেটে যাওয়ার কথা। তবুও কেন, এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণে বুদ্ধদেবকে প্রত্যাখ্যান করল কুন্তী? এ রহস্য ভেদ করা বুদ্ধদেবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কুন্তীকে সে বিয়ে করবে কি করবে না, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর হলেও, বুদ্ধদেবের খুবই ইচ্ছে করছিল, কুন্তীকে একান্তে কথাটা শুধোয়। ইদানীং কুন্তী বড় একটা বেরোয় না। তাকে একা পাওয়া দুষ্কর। তবুও বুদ্ধদেব প্রাণপণে সুযোগ খুঁজছিল। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে কুন্তী তার মর্যাদায় বড়সড় আঘাত হেনেছিল। নিজেকে খুবই অপমানিত মনে হযেছিল বুদ্ধদেবের। মনে মনে খুব মরিয়া হয়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব। সন্ধে নাগাদ কনকপ্রভার মহলে গিয়ে একফাঁকে কুন্তীকে কথাটা জিজ্ঞেস করে নেবে, এমন সিদ্ধান্তই নিয়েছিল সে। কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলাতেই মাথায় বাজ পড়েছিল বুদ্ধদেবের।

বাসায় ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। সমিতির একটা জরুরি মিটিং ছিল। শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বুদ্ধদেব যখন চুয়ামসিনায় পৌঁছল, সন্ধে নেমে এসেছে।

অনাথবন্ধু বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, দীপমালার সঙ্গে তোমাব দেখা হয়েছে? বুদ্ধদে
মাথা নাড়ে, ওঁর বাসায় যাওয়ার সময় পাইনি। অনাথবন্ধু বললেন, দীপমালা তোম
ডেকে পাঠিয়েছে। বাঁশি বাউরির হাতে খবর পাঠিয়েছে। কী যেন জরুরি দরকার। বুদ্ধদে
নিজের কুঠরিতে ঢোকে। জামা-কাপড় বদলে, মুখ-হাত ধোয়। অনাথবন্ধু বলেন, তোমা
দুধ গরম করে রেখেছি। দুধ দিয়ে চিঁড়ে খাও।

জলখাবার খেয়ে নিজের হ্যারিকেনখানা জ্বালায় বুদ্ধদেব। মাস্টার রোলগুলো গুছি
বেঁধে রাখতে চায় আজই। কালই ওগুলো ব্লক অফিসে জমা দিয়ে আসতে হবে। বইয়ে
তাকে অনেক কাগজপত্রেব সঙ্গে বান্ডিল বেঁধে ওগুলো রেখেছে বুদ্ধদেব। কিন্তু তাকে
কাগজপত্রে হাত দিয়েই ভীষণ রকম চমকে ওঠে সে। বান্ডিলগুলো কোথায় গেল? তাকে
মধ্যে কিছু পুরোনো খবরের কাগজ, কৃষি দপ্তরেব কিছু পুরোনো ফোল্ডার, পোস্টার, ডি
আর এবং লোনবিলির কিছু পুরোনো বাতিল তালিকা..., বুদ্ধদেব সেইসব কাগজের মধ্যে
মাস্টার-রোলের বান্ডিলগুলোকে আঁতিপাঁতি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে বান্ডিলগুলে
বেমালুম উধাও। বুদ্ধদেব মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রতিটি র‍্যাকের বইপত্তর, কাগ
ইত্যাদি নামিয়ে ঝেড়েঝুড়ে দেখে। কিন্তু বান্ডিলগুলোব কোনও হদিশই পায় না। ততক্ষ
বুকেব মধ্যে দুরমুশ পেটাতে শুরু করেছে। বুদ্ধদেব বালিশের-তোষকের তলা তুলে দেখে
খাটের তলায় রাখা স্টীলের ট্রাঙ্কখানা এক ঝটকায় খুলে ফেলে। যাবতীয় কাপড়-চোপ
এবং টুকিটাকি ব্যবহার্য জিনিষপত্র সবিয়ে সরিয়ে দেখতে থাকে। ততক্ষণে, ঐ শীতে
সন্ধ্যায় সে গলগলিয়ে ঘামতে শুরু কবেছে। ট্রাঙ্ক টানাটানি, বইপত্তর তোলা-নামানো
ইত্যাদির আওয়াজে বাবান্দা থেকে অনাথবন্ধু এসে দাঁড়ান দবজাব মুখে, কী করছ?

তখন কোনও জবাব দেবার অবস্থায় ছিল না বুদ্ধদেব। তাও বিড়বিড়িয়ে বলে, মাস্টা
বোলগুলো বইয়েব তাকে বেখেছিলাম, পাচ্ছি না। অনাথবন্ধু খুবই হালকাভাবে নেন কথাট
খুঁজে দ্যাখ। আছে কোথাও। বুদ্ধদেব তখন পাগলের মতো হাতড়ে চলেছে কুঠরির মধ্যেকা
সবকিছু। বেশ অস্থির গলায় বলে, কোথাও পাচ্ছি না। বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়া
বুদ্ধদেব, আজকালের মধ্যে কেউ এসেছিল, আমি যখন ছিলাম না, সুকুমার, তিলক কিংব
অন্য কেউ? অনাথবন্ধু বেশ স্বাভাবিক গলায় জবাব দেন, তোমাব ঘরে তো সারাক্ষণ
ওরা আসে। সুকুমার, তিলক, হঠাৎ, বাঁশি, গোবিন, সবারই তো অবারিত দ্বার তোমা
ঘরে। আজও তো তিলক এসেছিল দুপুরের একটু আগে। সহসা গায়ে জামাখানি গলি
নেয় বুদ্ধদেব, একখানা চাদর জড়িয়ে নেয়, তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটা দেয় শালকাঁকি
দিকে। অনাথবন্ধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তিলকের উঠোনে সুকুমার, হঠাৎ, বাঁশি, সবাই ছিল। বুদ্ধদেবকে দেখে হৈ-হৈ ক
ওঠে সবাই। বুদ্ধদেব কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বলে ওঠে, তোমরা কে
আমার ঘর থেকে মাস্টাররোলগুলো নিয়ে এসেছ?

—মাস্টাররোল! সুকুমারের ভ্রূসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে, মাস্টাররোল আপনি আপিসে জ
দ্যান নাই?

মাথা নাড়ে বুদ্ধদেব, নাহ্। করালীদা বলেছিল কাজ শেষ হলে একসঙ্গে নেবে।

সুকুমাররা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, আপনার ঘরের মধ্যে নাই উগুলান?

অকস্মাৎ বুদ্ধদেব অস্বাভাবিক রূঢ় হয়ে ওঠে, থাকলে কি জিজ্ঞেস করতাম?

সুকুমার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বুদ্ধদেবের দিকে। ওর কথার মাথামুণ্ডু বোধগম্য হয় না তার। মাস্টাররোল তো কোনও সোনাদানা নয়, কিম্বা নোটের বাণ্ডিলও নয় যে ওগুলো নিয়ে কারো কোনও লাভ হবে? বলে, উত্তেজিত হবেন নাই। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। আচ্ছা, আপিসে কুনোদিন লিয়ে যান নি তো? ধরুন, আপিসে লিয়ে গেলেন, করালী সোম বললেক পরে লিব, আপনি উগুলান লিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কারো টেবিলে রাখলেন, উঠবার বেলায় সঙ্গে লিতে ভুলে গেলেন। কিংবা ধরুন অফিসের পর মল্লিকার কিংবা দীপাদির বাড়িতে, কিংবা সমিতির অফিসে .। বুদ্ধদেব ততক্ষণে অস্থিরভাবে মাথা নাড়াতে শুরু করেছে। সুকুমার থেমে যায়। বজ্রাহত বুদ্ধদেব একখণ্ড পাথরের মতো কাঠ হয়ে বসে থাকে। তার মনের মধ্যে তখন অজস্র ভাবনা, হাজার সম্ভাবনা, লক্ষ সঙ্কেত ভেসে আসছে তরঙ্গমালার মতো। মগজ জুড়ে কিলবিল অসংখ্য মুখ, কথা, ভঙ্গি, অভিব্যক্তি, অল্পজলে জিয়োল মাছের মতো চরে বেড়াচ্ছে অবিরাম। করালী সোম, বারংবার বলা সত্ত্বেও, মাস্টার রোলগুলো নিতে রাজি হল না কেন? বিডিও সাহেবই বা কেন মাস্টাররোল জমা না দেবার ওপর অতখানি জোর দিচ্ছিলেন আজ? ভাবতে ভাবতে ক্রমশ পেছোতে থাকে বুদ্ধদেব। পেছোতে পেছোতে অনেকখানি পেছনে পৌঁছে যায়! কেনই বা তাড়াতাড়ি এমন একখানা রাস্তার কাজ শুরু করলেন বিডিও সাহেব, যে রাস্তার কোনও গুরুত্বই নেই! কেনই বা বুদ্ধদেবকেই তড়িঘড়ি ডেকে পাঠালেন স্কীমটার দায়িত্ব নেবার জন্য। এতাবৎকাল তো সব সময়েই চেষ্টা করেছেন যাতে বুদ্ধদেব এলাকার কোনও রিলিফের কাজে কিছুতেই নাক গলাতে না পারে। এই স্কীমটার ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হল কেন? পে-মাস্টার, মোহরার, এবং জল-কুলি নির্বাচনের যাবতীয় ক্ষমতা এক কথায় বুদ্ধদেবের হাতে দিলেন কেন? কোনও এলাকায় একটা রিলিফের কাজ মঞ্জুর হলে পে-মাস্টার আর মোহরার হওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেক মহলে অনেক অঙ্ক কষাকষি চলে। করালী সোম তার পেয়ারের লোকগুলিকে কাজ পাইয়ে দেবার জন্য প্রকাশ্যে ও আড়ালে বহুৎ কলকাঠি নাড়ে। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবকে ঐসব কাজে লোক নির্বাচনের অবাধ ক্ষমতা কেন দিলেন বিডিও সাহেব? ভাবতে ভাবতে বুদ্ধদেবের মগজে হরেক রকমের ইঙ্গিত ভেসে আসে। সহসা সে অনুভব করে, কখন অজান্তে একখানা লোভনীয় টোপ-লাগানো তগীতে আটকে গিয়েছে সে। ভেতর থেকে বারংবার বিপদের সঙ্কেত আসছে। পুরো ব্যাপারটাই কি তবে আগাগোড়া পরিকল্পনা মাফিক সাজানো!

সুকুমারকে তার আশঙ্কার কথা জানায় বুদ্ধদেব। শুনেই মুখ কালো হয়ে যায় সুকুমারের। গম্ভীর গলায় বলে, ষড়যন্ত্র উয়ারা করতেই পারে। কিন্তু মাস্টাররোলগুলান যাবেক কুথা? কাগজগুলানের তো আর পা নাই যে হেঁটে যাবেক? পাখনা নাই যে উড়ে যাবেক? আমরা বাদে আপনার ঘরে আর কার আনাগুনা আছে? বুদ্ধদেব গলগলিয়ে ঘামছিল। ঠোঁট দুটো

থরথরিয়ে কাঁপছিল তার। বলে, তোমরা ছাড়া আর তেমন কেউ তো বড় একটা আ
না। মল্লিকা, দীপাদি, কদাচিৎ ত্রিভঙ্গ, পরীক্ষিতদা, একআধবার অগ্নিও...ব্যস। সুকুমা
এতক্ষণে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে গেছে। সত্যিসত্যি কোনও ষড়যন্ত্র হলে, সেও যে জড়ি
পড়েছে অজান্তে, তা বুঝতে তিলমাত্র অসুবিধে হয় না। কারণ, সে হল পে-মাস্টা
তিলক হল মোহরার। হঠাৎ আর গোবিন মিস্তিরি হল জলকুলি। সবাই একই পার্টির লোক
ভাবতে ভাবতে পুরো বিষয়টা সুকুমারের দৃষ্টিতে এক ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায়। নির্বাচনে
প্রাক্কালে তবে কি এক ঢিলে দুটি পাখি মারবার স্বপ্ন দেখছে হরবল্লভরা! বুদ্ধদেবকে উচি
শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের আগে পার্টিকেও চোব সাজিয়ে দেওয়ার মতলব! সুকুমা
মুখ ফেবায় বুদ্ধদেবের দিকে, অনাথদার কাছে কারা আসে? ওদের দলের লোকজন
বুদ্ধদেব বিড়বিড়িয়ে বলে, আসে তো অনেকেই, তবে তারা আমার ঘরে ঢোকে না

সুকুমার আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস কবছিল, কিন্তু তখন বেশি কথা বলতে ইচ্ছে
করছিল না বুদ্ধদেবের। কারণ সে তখন তার মগজের মধ্যে একখানা তগীর প্রবল টা
অনুভব কবতে শুরু করেছে।

বুদ্ধদেব যখন বাসাব দিকে বওনা দিল, রাত তখন অনেক। মগজেব মধ্যে নিদারু
কোলাহল। একটা ফাঁসের মধ্যে যে তাকে নিপুণ কৌশলে আটকে দেওযা হয়েছে, সেট
মর্মে মর্মে উপলব্ধি কবছে সে। এবং ফাঁস থেকে বোবিয়ে আসার কোনও উপায়ই এ
মুহূর্তে জানা নেই তার। শালকাঁকির ডাঙাব এক কিনাব দিয়ে হাঁটছিল বুদ্ধদেব। সপ্তমীব
আধখাওয়া চাঁদ মাথাব ওপর সরসর করে ভেসে চলেছে। চাঁদটাকে দেখতে থাকে বুদ্ধদেব
দেখতে দেখতে দু'একবাব হোঁচট খায়। একটা পাযে চলা সরু পথ, পদমদীঘির পাশাপাশি
এসে মোরাম বাস্তাব যে জাযগাটায় মিশেছে, ওখানে একটা তিনঠ্যাংযে কয়েৎ বেলে
গাছ। আপন মনে মোরাম রাস্তাটাব দিকেই হেঁটে যাচ্ছিল বুদ্ধদেব, আচমকা তার মনে
হয়, কেউ একজন গা লুকিয়ে দাঁড়িযে রয়েছে গাছেব গুঁড়িব আড়ালে। বুদ্ধদেবের সার
শরীরে সতর্কতাব ঘন্টা বেজে ওঠে। থমকে থেমে যায় সে। অস্ফুট গলায বলে ওঠে
কে? সে কথায় ছায়ামূর্তি বেরিযে আসে গুঁড়ির আড়াল থেকে। পায়ে পায়ে হেঁটে আসে
বুদ্ধদেবের দিকে। ভয় করছিল। বুদ্ধদেব একটু একটু কবে পেছোতে থাকে। আগন্তুক খুব
দ্রুত পায়ে হেঁটে আসে ওব কাছে। এবং বুদ্ধদেব সবিস্ময়ে দেখে, মাকুন্দ।

বুদ্ধদেবের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় মাকুন্দ, আপনার তরেই খাড়াই ছিল্যম।

—কেন? বুদ্ধদেবের চোখ ছোট হয়ে আসে।

—একটা কথা বইল্বার লেগে। মাকুন্দর গলায বাড়তি সতর্কতা।

—কী কথা?

—কুনো কাগজ চুবি গেছে আপনার ঘর থিক্যে?

সহসা সারা শরীর ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। বুদ্ধদেব মাকুন্দর শরীরে আরও ঘন হয়।
প্রবল উৎকণ্ঠায় বলে ওঠে, হ্যাঁ, চুরি গেছে। তুই জানলি কী করে?

—সে কাগজ জমা পইড়েছে সিংহগড়ের বড়কর্তার হাতে।

—কবে?

—দিন দুয়েক আগে।

—কে দিয়েছে?

মাকুন্দ কয়েক মুহূর্ত গুম মেরে থাকে। বলে, নাম বইল্লে বিশ্বাস করবেন?

—কে? অগাধ জলে ডুবুডুবু বুদ্ধদেব কোনওমতে শুধোতে পারে।

ওর চোখের ওপর সরাসরি দৃষ্টি বিঁধিয়ে মাকুন্দ খুব স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করে, গোবিন মিস্তিরি।

১৪. জিয়ন গাছটা কাটা হবে

যন্তর আইছে দেশে। মানুষ আর হাতে কিছো কইর্‌বেক নাই। পাগল শিকারি বলে, ইবার যন্তর দিয়েই সব হবেক। হাই দ্যাখ, ধানকুটা মিসিন লিয়ে আনছি হে। ঢেঁকির দিন গেল ইবার।

দুটি গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে মিসিন আসছে বিষ্টুপুর থেকে। হরিণমুড়ির পুল পেরিয়ে ঢালোতে হুড়মুড়িয়ে নেমে যায় গাড়ি। পাগল শিকারি বলে, হাই দ্যাখ, ইয়ার নাম ধানকুটাই কল। হাস্‌কিন্ মিসিন। পাগল শিকারি দেমাকের চোটে বাঁযাটার পিঠে দু'চাবুক কষিয়ে দেয়, হাট্-হাট্। পেছনের গাড়িতে ইন্দ্র বাগদি। নামোর মুখে সতর্ক ছিল। তার ডাঁযাটার গায়ে আবার বহুৎ জোর, সব সময় নিজের দিকে খিঁচ মারে। যদি কোনও গতিকে নামোর মাথায় ডাইনে খিঁচ মারে তো তৎক্ষণাৎ গাড়ি পড়বে খাদে, কেন না পুলটি পেরোলেই রাস্তাটা বামে কুলুই-মোচড় খেয়েছে।

বৈদ্যার পঞ্চু ধল্ল, শশধর ধল্লর বাপ, কী কাজে যেন হাঁটা দিয়েছে রাধানগরের দিক থেকে। পাগল শিকারির গাড়ির পাশেপাশে হাঁটছে সে। সত্তরের ওপর বইস, একটু রোগার ওপর শরীরের বাঁধুনি, মাড়িতে একটাও দাঁত নেই, মাথার চুল সবই সাদা, কিন্তু এখনও রস চোখে-মুখে, এখনও মজলিশে-জমায়েতে রঙ-তামাশায সবাইয়ের ওপরে যায়। লম্বার ওপর ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙটি কটা-ফর্সা। বেশ চাঁচাছোলা তেকোনা মুখ। আর, ওই মুখে এমন অনর্গল রসের কথা, বউ-ঝিরা কাত হয়ে যেত পয়লা চটকায়। বাস্তবিক, যৌবনে কলির কিষ্টোই ছিল লোকটা। এই তল্লাটে কত মেয়ার সঙ্গে যে লটরপটর ছিল তার। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর অবধি চালিয়ে গেছে। ইদানীং একেবারে ভাঁটার দিকে। মানুষজন বোঝে, এ হল উড়তে না পেরে পোষ মানা। বয়সকালে, মাড়িতে যদি একটাও দাঁত অবশিষ্ট না থাকে, তো কেমন করে মাংস খায় মানুষ। পঞ্চু ধল্লর হল সেই বিত্তান্ত। সত্তর বছর বয়স, কম নয়। এখন আর হাতে-কলমে পাবে না, সেই কারণে বোধ লেয় পঞ্চুর কাঁচা মুখখানা খুলে গেছে চতুর্গুণ। জমিনের আলের মূল ঘাইটি বেঁধে দিলে যেমন ভাসলের মুখ খুলে যায়। হরেক কিসিমের রসের কথা চিরকালই তার ঠোঁটের ডগায় থাকে, তাতে শরীর সংক্রান্ত বিষয়ই ছিল অধিক। মানুষ তো তাই চায়। মানুষ তো

শুকনো বসে তত মজে না। তো, ইদানীং পঞ্চুর রঙ - তামাশায় যৌনতা আর অশ্লীলত
পরিমান বেড়ে গেছে বহু গুণ। ছিল ঝাল-পাঁপর, তায় ছড়িয়েছে লঙ্কার গুঁড়ো। কনকপ্রভ
মহলে খুব যাতায়াত আছে পঞ্চু ধল্লর। নিকুঞ্জপতির সঙ্গে খুব পাতায়-পাতায় ভাব। পঞ্চু
সাম্প্রতিক মুখখানার হাল দেখে ফুট কাটে নিকুঞ্জপতি, রোজ গঙ্গাজলে মুখখান ধুই
খুড়া। একান্ত মহলে বলে, যুদ্ধটা আর পারে না তো, তাই মুখেন মারিতং জগৎ। সে
বলে না, এ্যাক্‌কে পারে না, আর্‌কে ধায়/হাগ্‌তে পারে না, দাঁত কিড়মিড় খায়। এ হইল
হাগতে না পেরে দাঁত কিড়িমিড়ি অবস্থা পঞ্চু খুড়ার। সম্প্রতি ব্যাটা শশধর ধল্ল, বৈ
গ্রাম সভার অধ্যক্ষ হওয়ায় গুমোর বেড়ে গেছে পঞ্চুর। আবার সমস্যাও বেড়েছে। সর্ব
সামলে-সুমলে থাকতে হয়। মুখে মুনোত। কিনা, তুমি অধ্যক্ষের বাপ। তুমার বেচাল হও
চইল্‌বেক নাই।

পাগলের হাঁক-ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায় পঞ্চু ধল্ল। ঠোঁটের ডগায় চুইয়ে প
বস। বলে, দু'গাড়িতে দুটা মিসিন নাকি হে?

—দুটা লয়। পাগল হাসে. দুটা মিলেই একটা। উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে পাগল মু
হয়। মন দিয়ে বোঝাতে থাকে হাসকিন-মিসিন নামক রহস্যময় যন্ত্রটিব হরেক কার্যকারিত
হুই দ্যাখ, ইঁদ্‌রার গাড়িতে যিটা রয়েছে, উট্যা ইঞ্জিন, অর্থাৎ কিনা কলিজা। উট্যা চইল্‌লে
মিসিন জয়ন্ত। উট্যা থামলেই মিসিন মরা। আর, আমার গাড়িতে এই দ্যাখ, ইটাকে ক
হলাব। মিসিন ইট্যা দিয়ে খাবেক, আর হু-ই উটা দিয়ে হাগবেক, আর হু-ই উট্যা দি
মুতবেক। হলাব দিয়ে ধান চাললে, ইদিক দিয়ে চাল বাবাবে, উদিক দিয়ে কুঁড়া।

পঞ্চু ধল্ল বেশ মজা পেয়ে যায়। মনে মনে মানব শবীবের সঙ্গে তুলনীয় করে তো
যন্ত্রটাকে। বলে, মুখ, গুহ্যদ্বাব আব পিসাবদ্বার, এ তিনটা ত বুঝল্যম, আর ফুটাগুল
কুথা হে? মিসিনেব নাক কুথা? মিসিন দম লেয় না?

—লেয় না কেব! মিসিনেব নাকও বইযেছে খুড়া। হাওয়াব বদলে সিখ্‌নে তেল ঢাল
হয়। মিসিন যখন থামে, এক্কেবে হাঁপানি রুগীর পাবা সাঁই-সাঁই আবাজ তুলে। আমি নিজে
কানে শুন্যেছি।

—আর চোখ?

—উট্যাই নাই ইযাব। মিসিনের চোখটাই কেবল নাই খুড়া, চোখ থাইক্‌লেই উ'শা
মানুষ।

পঞ্চু ধল্ল মনে মনে আবও একখানা ছিদ্রের কথা ভাবছিল। কিন্তু অধ্যক্ষর বাপ
তাকে ইদানীং সামলে চলতে হয়। লচেৎ দিনান্তে ব্যাটার থিকে বাখান খেতে হয়। প
ধল্ল হাঁটতে হাঁটতে মেসিনটাকে চিল-নজরে দেখতে থাকে।

অনেকদিন ধবে হাওয়ায় কথাটা ভাসছিল। ধান কুটবার মিসিন বসাবেন হরবল্লভ
একদিন সেটা অবশেষে এল। পাগল শিকারি আর ইন্দ্র বাগদি দুটো গরুব গাড়িতে বোঝ
কবে নিয়ে এল সে মিসিন। হাস্‌কিন্‌ মিসিন।

ধান কুটবাব কল, অর্থাৎ কিনা হাসকিং মেসিনটা পুরোপুরি অজানা নয় এলাকার মানুষে

কাছে। প্রায় একদশক আগে দিনকতকের জন্য তাকে দেখেছিল মানুষ, অযোধ্যার বাঁড়ুজ্জাদেব কাচারি ঘরের লাগোয়া জমিনে। সেই প্রথম দেখল তল্লাটের মানুষ। রত্নেশ্বর বাঁড়ুজ্জ্যা প্রথম এনে বসিয়েছিল সেই কল। দমে কুট্‌তে লাগল ধান। একবেলার ধান এক ঘন্টায় কুটে দেয়। দেখেশুনে, যারা ভাচাতি ভেনে পেট চালাত, তাদের প্রাণ উড়ে যায় ভয়ে। নাভিলের চতুর্দিকে সুড়সুড় করে ঘুরে বেড়ায় একটা ভয়-তড়কা ইঁদুর। সক্কলে যদি মিসিনেই ধান কুটে নেয়, ভাচাতির দল আর বাঁচবেক দেশে-গাঁয়ে? হায় গ, কী মিসিন আইল্যাক দেশে! এ যে গরীব-মাবা কল হে!

মিসিনের সাথ সাথ হেড-মিস্ত্রি এল। তার বাহারি নাম মিসিন-ম্যান। হলারে ধান ঢালা এবং কুটাইয়ের কাজের তদারকির তরে এল আর একজন, তার নাম হলার-ম্যান। ইস্টোভের বাতি জ্বালিয়ে আধা-ঘড়ি কাল গরম করতে লাগত মেসিন। তারপব হ্যান্ডল গুঁজে কয়েক পাক ঘুবিয়ে দিলে গর্জে উঠত তার গোটা শরীরখানা। সে কী বিকট আওযাজ তাব। ভকভকিয়ে কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলত আকাশ। ইঞ্জিনের সঙ্গে হলার-মিসিনটি যে ফিতা দিয়ে জোড়া, মিসিন চললেই সেই ফিতা ঘুবত বনবনিয়ে। তখন হলারের মধ্যে ঢেলে দাও ধান। একদিকে চাল বেরোবার নল, অন্যদিকে কুঁড়ো বেরোবার। গরগর করে চলছে মেসিন, গলগলিয়ে চাল উছলাচ্ছে নল দিয়ে, বস্তা পেতে ধবে লাও। দৃশ্যখানা দেখবাব তরে লোক জমে যেত চারপাশে। ভুলভুল চোখে দেখত ওরা ধানকুটাই কলের কাণ্ড-কারবার। চারপাশের গাঁ-ঘর থেকে নিত্যিদিন মিসিন দেখতে ঝেঁটিয়ে এল শয়ে শয়ে মানুষ। সকাল থেকে সন্ধেতক্ক, মানুষ আসবার বিবাম নেই। একদল আসে, দ্যাখে, ফিরে গিয়ে সোরগোল তোলে যে-যার পাড়ায়। শোনা মাত্র অন্যদলটি আগলবাগল হয়ে দৌড় মারে। চারপাশের গাঁ-ঘরেব ঝি-ঝিউড়ি দু'দিনের জন্য বাপের বাড়ি এলেও বিকেলের দিকে সেজে গুজে, সিঁথিতে ডগোমগো সিঁদূব লাগিয়ে, অঙ্গে যথাসাধ্য গহনা চড়িয়ে, মিসিন দেখতে বেবোয়। শ্বশুব বাড়িতে ফিবে গিয়ে ওবা সাতকাহন করে বর্ণনা কবে মিসিনের রূপ, গুণ এবং হাজার মহিমাব কথা।

তখন শীতকাল। রত্নেশ্বর বাঁড়ুজ্জ্যাব একমাত্র ছেলে চাদব গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেসিনের কাছাকাছি। বছব বারো-তেরো বয়েস তার। অবাক নয়নে দেখছিল, কেমন কবে ওপরের হাঁ-তে ধান ঢেলে দিলে তলার নল দিয়ে চাল এবং পেছনের ফুটো দিয়ে কুঁড়ো বেবিয়ে আসে। হেড-মিস্ত্রি আব হলাব-ম্যান যে যাব কাজে ছিল। আচমকা চাদরের একটি খুঁট ফিতের শরীর স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে ধবে নেয় ফিতে। বাপ বলতে সময দেয না। ইঞ্জিন অবশ্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিয়েছিল মিসিন-ম্যান। কিন্তু থামতে থামতে হাড়গোড় ভেঙে, শরীরখানা চাকার সঙ্গে দলা পাকিয়ে...। শোকে পাগল হয়ে গেল রত্নেশ্বব বাঁড়ুজ্জ্যাব বউ। সেই পাগল-পাগল ভাবখানা তার সারা জীবনেও গেল না। মাসটাক বাদে জলের দামে বিক্রি হয়ে গেল মিসিন। বিষ্টুপুবেব শান্তাপ্রসাদ আগরওয়াল একদিন পাকাব চাতাল খুঁড়ে তুলে নিয়ে গেল। যারা তখনও মিসিনকে দর্শন করতে আসাব সময় করে উঠতে পাবে নি, তাদের কী আফশোস, হায় গ, চক্ষের দেখাটা দেইখ্‌তে পেল্যাম নাই! শত্রুপক্ষ

আড়ালে হাসাহাসি করল, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কইর‌্ল্যাক এঁড়্যা কিনে। হাজার-দু'হাজার বিঘা জমিন তুমার, আট গোলা ধান, খেয়ে ছড়িয়ে শেষ হবার লয়, পোকা লাইচ্‌ল্যাক তুমার মাথায়, মিসিন কিনে বেবসায় নামতে গেলে। সেই বলে না, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। বেবসা কি সবার দ্বারা হয়? মুরুব্বিরা গম্ভীর মুখে ভাষ দেয়, মিসিনই একদিন পাগল বানাবেক পুরা মানুষ জাতকে। এক্কেরে চিঁবাই খাবেক। ভাচাতি-ভানা মেয়েগুলো আড়ালে জাঁক করে, গরীব মাইন্‌ষের শাপান্তি। ফইল্‌বেক নাই ফের! খালি পেটের শাপান্তি। সেই মরসুমেই গান বাঁধল টুশু-গাইয়ের দল ঃ

ধান কুটাই কল আইল্যাক দেশে গ—
ধান কুটাই কল।
ও কলে ভঁকভঁকাইছেঁ ধুঁয়া, আর ঝকঝকাইছেঁ চাল
গরীবের কপাল ভাইঙছে/ভাচাতিরা ভোখে মইর‌্ছে
কল হয়োঁছে যাঁতাকল...।

ঐ প্রথম। তারপর আর ধান-কুটাই কল আসে নি এ তল্লাটে। সম্প্রতি আবার নিয়ে এলেন হরবল্লভ সিংহবাবু। মেসিন-ঘর তৈরির কাজে হাত দেবেন জলদি। মাটির দেয়াল দিয়ে, টিনের চালাঘর হবে। মেসিনম্যান আর হলারম্যান আসবে গড়বেতা থেকে। দমে কুটবে ধান। তখন গর্জনে কান পাতা দায় হবে। চাল হবে ঝকঝকে। এক পালিশে যেমন তেমন, ডবল পালিশে মুক্তার দানা। এ মিসিনে আবার ফ্যান লাগানো রয়েছে। চালের গায়ের বাড়তি কুঁড়ো উড়িয়ে সাফ করে দেয়। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাছ্‌ড়াবার দরকার নেই। কেবল ধুয়ে নিয়ে ছেড়ে দাও ফুটন্ত জলে। শুনে মুরুব্বির দল হেসে কুটিপাটি। মিসিনই যদি সব কাজ কইর‌্যে দিব্যেক তো মাইন্‌ষের হাত-পা ইসব কুন কম্মে লাইগ্‌বেক বাপ? কাজ বিহনে ত খইসে পড়বেক মাইন্‌ষের হাত-পা। হাত পা বিহনে কাছিমের মতন হব্যেক মানুষ। কূর্ম্ম-অবতার।

বাস্তবিক, একের পর এক যেভাবে মেসিন আসছে দেশে, মানুষের হাত-পায়ের কাজ ত কমে আসছে ক্রমশ। দেশে মোটর গাড়ি এল, নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে হুঁকুরে ছুটে যায় নির্দিষ্ট সময়ে। উঠে পড়, পয়সা গুনে দাও, নেমে পড় নির্দিষ্ট জায়গায়। মানুষের হাঁটাহাঁটি কমিয়ে দিয়েছে অনেক। যারা পায়ে কিংবা গরুর গাড়িতে সকাল বেলায় রওনা দিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিষ্টুপুর পৌঁছত, তারা মোটরে চড়ে, মজাসে বসে বসে দু'ঘড়ির মধ্যেই পৌঁছে যায়। ভারি ভারি বোঝা বইতে কত মুঠে লাগত, কাড়াগাড়ি..., এখন টেরাক-গাড়ি নেমেছে বাজারে, পঞ্চাশজনের মাল একলা বয়ে দেবে পঞ্চাশ ভাগের একভাগ সময়ে। তাবাদে, সাইকেল এসেছে বাজারে, দু'চাকার ভুটভুটি, পয়সা থাকলে পা, দুটোর ছুটি। শোনা যায়, হাল করার মেসিন বেরিয়েছে, জল সিঁচবার মেসিন, ধান কাটার, ঝাড়ার মেসিন। চুয়ামসিনা, বাধালগরের মানুষ অবশ্যি এখনও অবধি চর্মচক্ষে দেখেনি সে সব চিজ। তবে বিষ্টুপুরের সরকারি খামারে নাকি এসে গেছে সব। আর, হাওয়া-খাওয়ার কল, সেলাই-কল, চলে যাও বিষ্টুপুরে, কত দেখবে, দেখে এস।

হরবল্লভ শুনে ইলচি করেন। বলেন, মিসিন হয়্যে আমাদ্যার কুন্ কচুপুড়াটি? বেল পাইক্‌লে কাগের কি? যত সুবিধা, হয়ে যাচ্ছে গরীবদের। যদি বল, কেমন করে? তো, বলি। পাল্কি বয়ে লিয়ে যেতে কষ্ট হইতো বেহারাদের। দিনভব সওযাব-ভর্তি পালকি-পবীযানটি ঘাড়ে লিয়ে কত দূর-দুরাণ্ডে যেত্যো হইত উয়াদ্যার, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই.. হুড়ুম-দুড়ুম রাস্তা, এক হাঁটু কাঁদার দঁক, খাল-বিল-নদী পারাতে হইত্যো ভারি বোঝা ঘাড়ে লিয়ে। হেঁইযো.. হেঁইয়ো... ডাক পাড়ত আর কুত্তার পারা হাঁফাতো। মোটরগাড়ি হয়ে উয়াদ্যার দুঃখেব কতখানি লাঘব হইল্যাক, ভেবে দ্যাখ। ঢেঁকি চালাতে কত কষ্ট, হাল চযতে, ধান কাটতে, জল সিঁচতে, মানুষকে পাখার হাওয়া করতে, জাম বাবাই যায় গরীব মাইন্‌ষেব। উসবেব মিসিন হইলে, কত কষ্টেব লাঘব হব্যেক উয়াদ্যার। আমাদ্যাব আব কি? তখনও হাঁটথ্যাম নাই, এখনও হাঁটি না। তখনও হাওয়া খেত্যম, এখনও খাব। তখনও হাল চযাথম, জল সিঁচাথ্যাম, এখনও উসব হব্যেক। মানুষই করুক কিংবা মিসিন, উযাতে আমাদেব কুনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আবাম যেটুকু গবীবদেরই হয্যেছে।

তো, ধানকুটাই কলটা যখন চলবে পুরোদমে, চারপাশেব গাঁ-ঘর থেকে অবস্থাপন্ন মানুষজন গরুর গাড়ি বোঝাই করে ধান আনবে মিশিন-ঘবে। কুটিয়ে নিয়ে ফিবে যাবে এক বেলায়। এক পালিশের রেট কম, ডবল পালিশেব রেট বেশি। আর ফ্যান দিয়ে কুঁড়ো ঝাড়ালে তার মূল্য আলাদা। পযসা ফেল, মিসিন তুমার সব কাজ কবে দিবেক। পা অবধি টিপে দিবেক হে। তেমন মিসিন বারাই যাবেক; জলদি। তবে পয়সা লাগবে। পযসা ছাড়া মিসিন কথা কয না। পয়সা যাব, মিসিন তার বাপের চাকর। ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পব বট-অ? মুরুব্বিবা বলে, এক পালিশ, দু'পালিশ, ঝকঝঁকাইছে চাল, আসল চিজ কুঁড়ার সাথে ফুড়ুৎ। অযুধ্যাব বাঁড়ুজ্জ্যাদ্যার মিসিনে দেইখেছি তো। বাস্তবিক, মিসিনে-ছাঁটা চালে নাকি পুষ্টি নাই এক তিল। সেদিন বিষ্টুপুরের অভয় ডাক্তার সর্ব-সমক্ষে বলে গেল। বাণেশ্বব বাড়ুজ্জ্যার বউকে প্রসব করাতে এসেছিল ভুটভুটিতে চড়ে। সেও যন্তরপাতি দিয়ে প্রসব করাল। মিসিন দিয়ে তাইলে এয়োতিব পেটে বাচ্চা বাধানোও সম্ভব। বল খুড়া? আজ নাইলেও কাল সম্ভব। কী যুগ আইল্যাক হে! তো, অভয় ডাক্তার পষ্ট বলে গেল, পুয়াতিকে ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত দিতে হবে। মিসিনে-ছাঁটা চালে কিছোটি নাই। বল তবে! টুকচাব আরাম দেয় বটে ঢ্যামনা মিসিন, কিন্তু হরণ কইরে লেয মাইন্‌যের কত কিছু। এখনই তো ছগরাগুলান হাঁটতে খুঁজে না। কথায় কথায় বলে, মোটরে যাব। আরে, যদি নাই হাঁটবি, তবে জনমকালে কোমরের তলায় পা দু'খান কেনই বা গুঁজে দিল্যাক ভগবান? অমনি অমনি? কুনো হেতু নাই তার?

পঞ্চু ধল্ল বলে, এ মিসিন কুথায় বইস্‌বেক হে?

—বইস্‌বেক জিয়োন গাছতলার জমিনে। পাগল জবাব করে, যা আওয়াজ! গাঁ থিকে তফাতে না বসালে তার গর্জনে কাক-চিল বুইস্‌তে লারবেক ঘরের চালে!

—জিয়োন গাছটার কি হব্যেক তেবে?

—উট্যা কেইট্যে ফেলাবেক বড় কত্তা। হিংজুড়ির করাতিদ্যার সাথ কথাবার্তা পাকা।

বলতে বলতে পাগল শিকারি কেমন বিমর্ষ হয়ে যায়।

পঞ্চু ধল্লও নিমেষের মধ্যে মুষড়ে পড়ে, কেট্যে দিব্যেক? অমন মহাত্মা গাছ, কেইট্যে দিবা কি লেহ্য হবেক?

পাগল শিকারি জবাব দেয় না। সতর্ক হয়ে গিয়েছে সে। জিযোন গাছটা কাটবাব বিরুদ্ধে পাগল শিকারি কথা বলেছে, এমন কতা বড়কর্তার কানে গেলে মহাবিভ্রাট হবে। পঞ্চু ধল্ল আক্ষেপ করলেও, ঠিক সময়ে যাবতীয় দোষ পাগলেব ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হবে। পঞ্চু ধল্ল হল অধ্যক্ষের বাপ। পয়লা চটকায় পিছলে যাবে সে। গরীবের তো পিছলে যাওয়ার জো নেই। তেল কুথা উয়াদ্যার গায়ে। খসখইস্যা গা, পিছলানো কঠিন।

৩৫. অগ্নির জানুর জড়ুল

সে রাতে প্রবল জ্বর এল অগ্নিব।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে যখন নিজেদের বাড়ির উঠোনে পা রাখল, তখন সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছিল। নিশান বাউরি দরজাটা খুলে দিতেই মেঝের ওপর একখানা তালাই পেতে শুযে পড়ে অগ্নি। তারপর কুঠরির নিকষ অন্ধকারে সারারাত প্রায়-বেহুঁশ অবস্থায় অগ্নির চোখেব সামনে কত দৃশ্য, কত মানুষ, জন্তু, গাছ-গাছাল, পদম পুকুরের থইথই কালো জল. .মগজে কত অজীর্ণ, অদাহ্য স্মৃতি. .। ঘুমের ঘোরে কত মানুযের সঙ্গে কথা বলল অগ্নি, পবীক্ষিত বাউরির কোলে মাথা রেখে কত কাঁদল। শুশুনিযা পাহাড়েব উঁচু চূড়োয উঠে দাঁড়াল, আচমকা পা ফসকে শূন্যে, অতল শূন্যে নামতে নামতে ভয়ে, ত্রাসে, আর্তনাদে. . , প্রায় সাতদিন প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন ছিল। অনাথবন্ধু বাড়ি বয়ে এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। তিলক সাবু এনে ফুটিয়ে খাইয়ে দিয়ে গেছে। বাতাসী মাথা ধুযে মুছিয়ে দিয়ে গেছে। জ্বর ছাড়ল যখন, অগ্নিব উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি নেই শবীবে।

নিশান বাউরি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে। খুঁটিযে খুঁটিয়ে নিরীখ করে অগ্নিব মুখ, চোখ...। কিছুই জিজ্ঞাসা করে না বুড়ো। এক সময ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, থাক্, সোয়ামীর ঘর কইর‍্যে আব লাভ নাই তুযার। তুয়ার ললাটে উট্যা নাই বটে! অথচ অগ্নি কিছুই ভেঙে বলেনি নিশানকে। জ্বর ছাড়লে পর, অগ্নি যখন উঠে দাঁড়াল, অল্প অল্প হাঁটাচলা শুরু করল, নিশান কয়েক গাছি সুতো এনে এগিযে দেয অগ্নির দিকে, ইট্যা তুয়ার হাতেব মুঠার মইধ্যে ছিল।

হাওয়ার ভাসছে এক মুখরোচক বটনা। গভীব রাতে গজেন অগ্নির এমন এক রূপ দেখে ফেলেছে, যা নাকি কহতব্য নয়। কিন্তু কী সে রূপ, সেটা কিছুতেই ভেঙে বলেনি কাউকেই। কেবল বলেছে, যা দেইখ্ল্যাম। সে আমাব মনেই থাক্। উ মেয়াকে আর ঘবে লিব নাই আমি। ঢের হয়্যেছে। এমন কথায় রহস্য আবও বেড়ে গেছে। হাওযায় হাওয়ায বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছে অগ্নিকে নিয়ে নানান সম্ভব-অসম্ভব গল্পগাথা।

অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে অগ্নি। শরীরখানা বড়ই দুর্বল। চোখদুটি কোটরে ঢুকে

গিয়েছে। নাওযা-খাওয়ায় মন নেই, কাজে-কামে জোর পায় না, কাবোর সঙ্গে বাক্যালাপ করে না, কেবল পলকহীন তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

ওদিকে, শালকাঁকি গাঁয়ে খুব গরু-বাছুর মরছে। বাচ্চাদের রোগজাড়ি হচ্ছে। গুঁইরাম বাউরির কচি বাচ্চাটা আলটপকা মরে গেল। অমন অস্বাভাবিক ঘটনায় পুরো বাউরিপাড়ার মুরুব্বিরা কপালের বলিবেখায় আশঙ্কা ফুটিয়ে বলে, মনে লিচ্ছে, কোউ খাচ্ছে।

একদিন দীপমালা আসেন অগ্নিদের বাড়ি।

দীপমালাকে দেখে বহুদিন বাদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অগ্নির মুখ।

দীপমালা ওকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেন। ওর পিঠে হাত বুলোতে থাকেন নিঃশব্দে। অগ্নি পাথরের মতো বসে থাকে।

সখা বাউরি বলে, পাতা পইড়ে বলে দিতে পাবি, কে বাস্তবিক খাচ্ছে। কিন্তু না, আমি যার নাম বইল্‌ব, সে-ই বইল্‌ব্যেক, সখা বাউরি শত্রুতা কইর‍্যে বইলেছে। এ হইল্যাক আমার লিজ্যাব গাঁ। তুমরা ভিনগাঁ'র জানগুরুর পাশ যাও। উ কারুকে চিনে নাই। উয়ার পাশ রামিও যা, ভীমাও তা।

বাউরিপাড়ার ষোলআনা ফের মিটিনে বসে। সাব্যস্ত হয়, হিংজুড়ির মাতঙ্গ বাগের পাশ যাওয়া হবেক।

মাতঙ্গ শালপাতায তেল মাখিয়ে বিড়বিড়িয়ে মন্তব পড়ে। শালকাঁকির বাউরিপাড়া চাপটি খেয়ে বসে থাকে উঠোনে। নিয়ম অনুসাবে প্রতিটি ঘর থেকে এসেছে একজন করে। নিশান বাউবিব পক্ষে গোবাচাঁদ।

মাতঙ্গ বাউবি শালপাতায লিখন পড়ে, ভেবে-বুঝে রায় দেয়, ডাইনই খাচ্ছে। শালকাঁকিরই মেযা সে। যুবতী। ভাতাবছাড়ি। ষোলআনা মহা উল্লাসে ঘবে ফেবে। আর, ফিরতি পথেই গোরাচাঁদ কানাঘুসোয় বুঝে ফেলে, তার মাযের দিকেই আঙুল তুলেছে হিংজুড়িব জানগুরু। সন্ধে নাগাদ সে খবর অগ্নির কানেও চলে আসে। শোনা মাত্তর অগ্নি পাথব হয়ে যায।

সেই সন্ধ্যায় ষোলআনার মিটিং-এ আবার গাছেব ডগ্‌ ভেঙে দেযা ভরত বাউরি। বলে, ভাতাবছাড়ী ত একা অগ্নিই লয়। গুঁইবাম বাউরিব লিজের একটা মেয়া তো ভাতারছাড়ী।

ষোলআনা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, গুইরামের মেয়া উয়ার লিজেব ভাইকে খাব্যেক? কী কথা কও হে?

ক্যানে খাব্যেক খাই? ভরত বাউরি খটখটে গলায বলে, উয়াদ্যাব পাশ মা-বাপ-ভাই-বন বইলে কিছো আছে নাকি?

সেটা অবশ্যি ঠিক। এ গু'খাবা বিদ্যার দস্তুরই এমন। নিজের কুদৃষ্টির ওপর নিজেবই নিয়ন্ত্রণ নেই। বাপ-মা, এমন কি সোয়ামীকে খেয়ে বিধবা হয়েছে কত মেয়া। ভরতের কথা মাটিতে ফেলা দায়।

—তো, ফের চল জানগুরুর পাশ। দুই ভাতারছাড়ীর মধ্যে কে খাচ্ছে, জেনে আসা

যাউ।

—দুশরা জানগুরুর পাশ যা তুয়ারা। সখা বাউরি শলা দেয়, এক জানগুরুর পাশ দু'বার যাবা ঠিক লয়।

বাঁকাদহর পতিত তুঙ্ও একই কথা বলে। ডাইনই খাচ্ছে। গেরামের ডাইন। যোবতী। ভাতারছাড়ী। ঐ সঙ্গে পতিত তুঙ্ আরও দুটি লক্ষণ বাতলায়। উই যোবতীর ভিটার ভিতর জল, আর জাং-এ জড়ুল।

এমন মন্তব্যে সুতোর আরও একপাক খুলে যায়। গুইরাম বাউরির ভিটের মধ্যে কুয়া-পুকুর কিছুই নেই। অগ্নিদের ভিটের মধ্যে ডোবা। আর রইল কেবল একটি ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া। কার জানুতে জড়ুল রয়েছে।

সে সন্ধ্যায় তিলক বাউরি অনেকক্ষণ ছিল অগ্নিদেব বাড়িতে। সারাক্ষণ থমথম কবছিল ওর মুখ। একসময় নিচু গলায় বলে, যা বল, মনে লিচ্ছে, গজেনের হাত বইয়েছে ইয়াতে।

—হাত রইয়েছে মানে? অগ্নি ভুরু কুঁচকে তাকায়।

—এ শালা জানগুরু টাকা খেইযে বইল্ছে ইসব।

—পর্‌মাণ কি ইয়ার?

তিলক গুম মেরে বসে থাকে। বসেই থাকে। তিলকেব মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে উতলা হয়ে ওঠে অগ্নি।

বলে, কথা বলছু নাই ক্যানে?

তিলক স্থির দৃষ্টিতে তাকায় অগ্নির দিকে। চোখে চোখ রাখে। খুব অস্বস্তি মাখানো গলায বলে, একটা কথা জিগাব?

—কী কথা? অগ্নি আরও উতলা হয়।

—তুমার জাং-এ কি কুনো জড়ুল আছে?

অগ্নির সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। দু'হাতের তালু ঘামতে থাকে নিঃশব্দে। ধীরে ধীরে মাথা দোলায় সে।

তিলক বলে, আর কুনো সন্দ নাই আমার।

অগ্নি ব্যাকুল চোখে তাকায়, ভেঙে বলছু নাই ক্যানে?

তিলক একটুখানি সময় নেয়। তারপর বলে, কেবল গজেনের পক্ষেই ইট্যা জানা সম্ভব। সে তুমার সোযামী।

মনের মধ্যে ঝড় বইছিল অগ্নির। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। তার মধ্যেও একরাশ লজ্জা তাকে তিলেতিলে ঢেকে ফেলে। শাড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকা জড়ুলটাতে মৃদু সুড়সুড়ি লাগে। কে যেন মোলায়েম হাত বোলাচ্ছে ওটার ওপর। সহসা অগ্নির মনে হয তিলকের কথা। তিলক নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে অগ্নির গুপ্তস্থানে লুকিযে থাকা জড়ুলটার কথাই ভাবছে! লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে থাকে অগ্নির শরীর। মাটিতে চোখ বিঁধিয়ে নির্বাক বসে থাকে সে।

তিলক সহসা বিধাতার গলায় রায় দেয়। আজ রাতেই তুমাকে পালাতে হব্যেক।

—কুথা পালাব।

—যে কুনো থানে। লচেৎ তুমার রেহাই নাই। প্রভঞ্জন সিংহবাবু ছাড়বেক নাই তুমাকে।

তিলকের দিকে ঝাঁ করে তাকায় অগ্নি, এর মধ্যে উয়ার কি?

—উই ত কলকাঠি লাইড়ছে। গজেনটাকে উই লাচাচ্ছে।

অগ্নির সারা শরীর পুনরায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। সহসা তিলকের ডানহাতখানি খপ্ করে ধরে ফেলে সে, কী হবেক, তিলক?

তিলক উঠে দাঁড়ায়।

খুব চাপা গলায় বলে, তিযার হইযে লাও। নিশানদাদুকে সব খুলে বল। আমি ঘর থিকে আঁইছি। যাব, একদৌড়ে আইস্‌ব।

আধঘন্টাটাক বাদে তিলক যখন ফিরে এল, অগ্নি তৈরি। শাড়িখানা ঠিক করে পরে নিয়েছে। টুকিটাকি বেঁধে নিয়েছে একটা পুঁটলিতে। গোরাচাঁদকে পাশে নিয়ে সে তিলকেব জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। বোর্ডিং-এ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল গোবাচাঁদের। কিন্তু এমন টাল-মাটালের দিনে গোরাচাঁদকে কাছছাড়া করতে মন চায় নি অগ্নির।

তিলক গোরাচাঁদেব দিকে একঝলক তাকায়।

—উ ক্যানে?

—উ আমাদ্যার সাথ যাব্যেক।

—দাদুকে কে দেইখ্‌ব্যেক?

—বাতাসী। তুই বাতাসীকে বইলে আয়।

—আমার মতে গোবাচাঁদ থাকু ইখ্যেনে।

—লয। খুব রূঢ় গলায় বলে ওঠে অগ্নি, ইয়াকে মেইবে ফেলাব্যেক উয়াবা। কিংবা উ পুড়ামুয়া ইয়াকে লিয়ে ফুলকুসমা পালাবেক।

তিলক আব বাধা দেয় না।

নিশান বাউরির কাছে শেষ বিদায় নিয়ে ছলছল চোখে সেই রাতেই তিলকের সঙ্গে গাঁ ছাড়ে অগ্নি।

৩৬. চিল গোনেন হরবল্লভ

রাঢ়ের তামাটে আকাশের বুকে ডোমচিল।

একটা চিল, দুটো চিল, তিনটে, চারটে পাঁচটা...।

চিল গুনতে ভালই লাগে হরবল্লভের। বিশেষ করে, যখন নিজের জন্য একান্ত একচিলতে সময় অবশিষ্ট থাকে, কোনও কারণে যখন মনটা খারাপ হয়ে যায়, বিধ্বস্ত লাগে নিজেকে, তখন চিল গুনতে গুনতে তাঁর দুঃসহ সময়েব জমাট পাথরখানি একটু একটু করে ক্ষইতে থাকে। সময়টাকে সহনীয় লাগে।

একাএকা বসে বসে অলস দৃষ্টিতে চিল গোনার মধ্যে এক ধরনের মজা রয়েছে। একজাতের উত্তেজনা। আকাশের বিভিন্ন স্তরে অনেক চিল, উড়ছে। একেবারে নিচের স্তরে, তালগাছের সমান উঁচুতে, সাত-আটটা। তারও ওপরের স্তরে চার-পাঁচটা। আরও ওপরে

দু'তিনটা। তারও অনেক অনেক ওপরে, একেবারে মেঘের কাছাকাছি, ছোট্ট কালো ফুটকির মতো একটামাত্র চিল। চিলই তো? মাঝে মাঝে সংশয় জাগে। চোখের বিভ্রম বলে মনে হয়। একা একা উড়ছে কেন চিলটা? অতখানি ওপরে, একেবারে সূর্যের কাছাকাছি, কেন এই ওড়াওড়ি? এর সঙ্গে কোনও বাসনা জড়িত রয়েছে কি? কিসের বাসনায় এই নিঃসঙ্গ উত্তরণ! একথা সত্যি যে, উঁচুতে উঠলেই সবাই নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। যত উঁচুতে ওঠা, ততই নিঃসঙ্গ হওয়া। সকলের ওপরে নিজের অবস্থানটি পাকাপোক্ত করতে চাইলেই সান্নিধ্য হারাতে হয়। এটা হরবল্লভের চেয়ে বেশি কে বোঝে! চারপাশে অত অত ধনাঢ্য মানুষ, প্রমথ গাঙ্গুলি, কামদেব দত্ত, ঝাড়েশ্বর নায়ক, মহাদেব কযাল সবাই উঁচু আকাশের চিল। কিন্তু সবার মধ্যে উড়েও হরবল্লভ কতখানি নিঃসঙ্গ. কারণ তিনি উড়ছেন সবচেয়ে উঁচুতে। তিনি একা উড়ছেন। একা, একা। নিচের স্তরে যারা উড়ছে তারা হরবল্লভকে ভয় করে, সম্ভ্রম করে, ঈর্ষা কবে। ওদের থেকে ভয়, আনুগত্য সবই পান হরবল্লভ, কেবল সান্নিধ্য আর বন্ধুতা পান না একতিল। অথচ, তবুওতো, আকাশেব একেবারে উচ্চতম স্তরে গিয়ে ওড়াওড়ি করবার বাসনা ছাড়তে পাবেন না কিছুতেই। চাবপাশে হরবল্লভকে টেনে নামিয়ে আনার যে প্রক্রিয়া চলছে, সকলের সঙ্গে একাসনে বসতে, উড়তে, যেভাবে বাধ্য কবছে পবিবর্তিত সময়, তাকেই বা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছেন কই?

অবশেযে বিন্দুব মতো চিলটাকে খুঁজে পান হরবল্লভ। যেখানে উড়ছিল, সেখানে নেই চিলটা। নেমে এসেছে অনেকখানি। নিচের স্তরের চিলগুলোর সঙ্গে প্রায় মেশামেশি অবস্থা।

দেখতে দেখতে হরবল্লভের বুকখানা ভারি হয়ে আসে। মনেমনে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, নামিস নাই রে. চিল, আর নিচে নামিস নাই।

দু'ঘড়িটাক বেলায়, অধর ঝাবমুনিয়া এসে সদর উঠোনে হাজির হয়। হববল্লভ দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলেন আর একমনে চিল গুনছিলেন। অধর ভক্তিভরে দণ্ডবত করে।

এলাকায় খরার প্রকোপটা যত বাড়ছে, অধর ঝারমুনিয়ার দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যাচ্ছে ততই। খরা এলেই আগুন ঝরে আকাশ থেকে। আগুন যত ঝরে, টাকা তত ঝরে ওপর থেকে। রাশিরাশি টাকা। ত্রাণসামগ্রী। শুকনো শিরীষের ফল গাছে গাছে যতই ঝনঝনিয়ে বাজে, খরার টাকাও দ্বিগুণ আওয়াজ তুলে বাজতে থাকে ঝনাঝন। অধর ঝারমুনিয়া অবিরাম সেই বাদ্যিটিকে অনুসরণ করে চলেছে। ঝনঝনিয়ে ঝরে পড়া টাকা কুড়োনোর ধুম পড়ে গেছে সর্বত্র। বাতাসার মতো হরির লুট চলছে। অধর ঐ হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে দিনরাত তৎপর। এখন তিনদিকে তিনটি কারখানা খুলেছে সে। বড়ছেলে দাশু, বলকের সামনের গুমটিতে বসে তার দিনরাত একাকাব। খরাপীড়িতদের দরখাস্ত লিখতে লিখতে তার হাতে কড়া পড়ে গেছে। মেজো ছেলে পচু, এখন সে পঞ্চানন, গেল-সন অবধি রাধাপদ দত্তর কুঁয়া-কাটিয়ে দলের হেডমিস্ত্রি ছিল, এ সনে সে হয়েছে ঠিকাদার। রহিম শেখকে হেডমিস্ত্রি বানিয়ে সে এখন সারা এলাকা জুড়ে নতুন কুঁয়া খুঁড়ে চলেছে, পুরোনো কুঁয়া ঝালাই করছে। করালী সোম আর হরবল্লভের অনুগ্রহে আর পিতৃপুরুষের অগাধ আশীর্ব্বাদে তারও এখন দম ফেলবার সময় নেই। এখন কথায় কথায় মেজাজ

খারাপ হয়ে যায় তার। পান থেকে চুন খসলেই রহিম শেখের ওপর বাঘের ঝাপট নেয়। অশ্রাব্য ভাষায় বাখান পাড়ে। ছোটছেলে গজু, আর একটু লায়েক হলেই তার নামের কুঁড়িখানি ফুটে গিয়ে হবে গজানন, প্রভঞ্জনদের লঙ্গরখানায় সে রাঁধুনির জোগাড়দার। দিনান্তে চাল-ডাল থলিতে ভরে নিয়ে আসছে বাড়িতে। তিনটি কারখানায় তিনটি ছেলেকে ম্যানেজার হিসেবে থাপনা করে, 'প্রোপাইটর' অধর ঝারমুনিযা সবকিছুর তদারকিতে ব্যস্ত। তা বাদে, একটা নতুন কারখানা খোলার তালে রয়েছে সে। সেই কারণেই দৌড়াদৌড়ি জুড়েছে সব ঠাকুরের থানে। জেলাব্যাপী নিদারুণ খরায় গাদা গাদা ত্রাণসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বিলি করবার জন্য সরকার গাঁয়ে গাঁয়ে জি-আর'এর ডিলারশীপ দিচ্ছে। এতাবৎকাল রাসবিহারী তুঙ্-ই ছিল এলাকার একমাত্র ডিলার। একাধারে এম-আর এবং জি-আর ডিলার ছিল সে-ই. এখন, রাসবিহারী বাদেও আরও একজনকে শুধু জি-আর বিলির জন্য ডিলারশীপ দেবে সরকার। অধর ঝারমুনিয়া শকুনের দৃষ্টি তাক করে রেখেছে ওটার ওপর।

দণ্ডবত সেরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে অধর। বাবু-মনিষ্যিদের কাছে সে কদাপি বুক চিতিয়ে, শিরদাঁড়া সিধে করে দাঁড়ায় না। সেটা তার স্বভাবেই নেই কস্মিন কালেও। বিনয়ের অবতারটিকে দেখতে দেখতে হরবল্লভের ঠোঁটের ডগায ঝিলিক মেরে যায় হাসি। বাইরে অমন বোষ্টম-বিনয়, কিন্তু রতিকান্ত যা বলে, নিজের সংসারে সে একটি আস্ত বাঘ। সে হল, রতিকান্তর ভাষায়, শক্তের ভক্ত, নরমের যম। বাবু-ভায়াদের কাছে গুটিয়ে যাওযা কেন্নো একটি, আবার মজুর-কামিনদের কাছে সাক্ষাৎ কাঁকড়া-বিছা। তার হুলের জ্বালায় সবাই অস্থির। শুধু মজুর কামিন কেন, বাড়িতে বউ, ব্যাটা, ছেলের বউ, সবাইযের কাছে সে যমের তুল্য ভয়াল। এমন কি মক্কেল ও পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের কাছেও বেশ কড়া ধাতের মানুষ।

বেশ গুছিয়ে সংসার করতে জানে লোকটা। রতিকান্তই বলে। গাঁয়ে কারোর ঘরেই যা নেই, হ্যাচাক, শতরঞ্চি, সামিয়ানা, পিতলের বড়বড় হাঁড়া, ডেকচি, বালতি, গামলা, মাছ ধরবার বড় জাল, কেবল সম্পন্ন মানুষজনের ঘরে থাকে যেসব সামগ্রী, সবকিছু তিলতিল জড়ো করেছে নিজের সংসারে। কিন্তু তার হুকুম ছাড়া সেসব সামগ্রী ব্যবহার করবার সাহস নেই বউ-ব্যাটাদের। এমনি তার কঠোর শাসন। একবার রতিকান্ত কি এক প্রয়োজনে গিয়েছিল অধরের বাড়িতে। সেই গল্প করতে গিয়ে রতিকান্ত আজও হেসে লুটিয়ে পড়ে। অধর বাড়ি ছিল না। বড় ব্যাটা দাশু ওকে কি করবে, কোথায় বসাবে, ভেবে পায় না। বাড়িতে একজন মাননীয় অতিথি, অবিলম্বে শরবত দেওয়া উচিত। বাবুভায়াদের কথা ভেবে বাড়িতে এক বোতল সিরাপ এনেও রেখেছে অধর। চিনি-জলে সিরাপ ঢাললে চমৎকার শরবত। কিন্তু বাপের বিনা অনুমতিতে সিরাপ কিংবা চিনি খরচ করতে অপারগ সবাই। কাজেই রতিকান্তকে বসিয়ে রেখে জয়কৃষ্ণপুর মোড়ে হরিবোল দাসের চায়ের দোকানের দিকে দৌড় মারে দাশু, বাপের অনুমতি নেবার উদ্দেশ্যে। ওখানেই বসে রয়েছে অধর ঝারমুনিয়া। রাজা-উজির মারছে। দাশু ছুটে যায়, রতিকান্ত ঠায় বসে থাকে। প্রায় আধঘন্টাটাক বাদে বাপের অনুমতি নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফেরে দাশু। চটপট

বানিয়ে এনে ধরে দেয় শরবত। বলতে বলতে রতিকান্ত হেসে কুটিপাটি হয়।

অধর ঝারমুনিয়ার দিকে তেরচা চোখে তাকান হরবল্লভ। একটুখানি মস্করা করবার লোভ সামলাতে পারেন না। সম্প্রতি খবর পেয়েছেন, পচু তার বিয়েতে যে সাইকেলখানা যৌতুক পেয়েছিল, আগুনে পুড়ে খুব জখম হয়েছে বেচারা সাইকেল। সারাদিন ব্যবহার করবার পর প্রাণের তুল্য সাইকেলটিকে ধুয়ে মুছে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত পচু। একখানা ছেঁড়া মশারি দিয়ে ঢেকে দিত সাইকেলের শরীর। পচুর বউ সারা ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখিয়ে, সবশেষে আসত সাইকেলটার কাছে। সাইকেলের চারপাশে ভালভাবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে প্রদীপখানা বসিয়ে দিত সাইকেলটার পাশেই। এক সন্ধ্যায়, তেমনই জ্বলছিল প্রদীপখানা, আচমকা, হাওয়ার তোড়ে মশারির একপ্রান্তকে ছুঁয়ে ফেলে প্রদীপের আলো। সঙ্গে সঙ্গে ধরে যায় আগুন। সবাই মিলে তৎপর না হলে সেদিন অধর ঝারমুনিয়ার ঘরে লঙ্কাদহন হত। জল-টল ঢেলে আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছিল সবাই, কিন্তু সাইকেলটা জখম হয়েছিল খুব। তার টায়ার পুড়ে, গায়ের রঙ ঝলসে, একেবারে আগুনে পোড়া রোগী। সে দুঃখ অধর ঝারমুনিয়ার এজন্মেও যাবে না বুঝি।

ঐ নিয়ে সামান্য মস্করা জোড়ে হরবল্লভ, কিবে অধর, তুয়ার ব্যাটার বিয়ার সাইকেল শেষমেষ আগুনের পেটে গেল্যাক?

পুরোনো শোকটা তৎক্ষণাৎ উথলে ওঠে অধরের। পাশাপাশি রোষটাও চাগাড় দিয়ে ওঠে ছেলের বউয়ের ওপর। শালা, ভিখারি বংশের মেয়া, উয়ার বাপ ভিখ-টিখ মেগে, ধার-ধোর করে কোনও গতিকে দিয়েছিল সাইকেলখানা, অমন চিজের মূল্য উ বেটি বুঝবেক? মনে মনে পচুর বউকে খেউড় করে অধর। বেটির গায়ের রঙ টুকচান ধবলা বলে যেন ধরাকে সরাজ্ঞান করে। এসব মনে মনেই সারে অধর। মুখে খুব বিনীত ভঙ্গি করে হরবল্লভের উদ্দেশ্যে বলে, কী করা যাবেক আইজ্ঞা, কপালে নাই ঘি, তার ঠকঠকালে হবেক কি! কুত্তার পেটে কি ঘি সয়?

অধর সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরবল্লভ এতক্ষণে কাজের কথায় আসেন। বলেন, বল, কত কথায়?

অধর এই মুহূর্তটার জন্য কায়মনোবাক্যে অপেক্ষা করছিল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ওঠে, আমাকে বাঁচান কত্তা, অতবড় সন্‌সারটি টাইন্‌তে টাইন্‌তে আমার হাড়মাষ কালি হইয়ে গেল্যাক। টুকচান পা রাখুন অধমের মাথায়।

অধর ঝারমুনিয়ার কথার বাঁধুনিটিকে হরবল্লভ বিলক্ষণ চেনেন। কিসের কারণে যে অধর এমন হামলে পড়েছে, বুঝতে বাকি নেই তাঁর। দোলনায় দুলতে দুলতে বলেন, তুয়ার সেই জি-আর'এর ডিলারশীপ তো?

শুনানি শেষ। অধর এবার আসামীর কাঠগড়ায়। রায় শোনার অপেক্ষায়।

বারকয় একমনে দোল খেয়ে একসময় হরবল্লভ আকাশের দিকে চোখ বিঁধিয়ে আপন মনে বলেন, দেইখ্‌ব যা।

হরবল্লভ আকাশ থেকে আর নামিয়ে আনেন না চোখ। আকাশের সবচেয়ে উঁচুতে,

কালো বিন্দুর মতো একটিমাত্র নিঃসঙ্গ চিলকে ক্ষণিকেব অন্যমনস্কতায় হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। চিলটাকে পুনরায় সনাক্ত করবার কাজে মন দেন এবার।

মনটা ভারি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে ক'দিন। হাস্‌কিং মেসিনটা এনেও বসানো গেল না। আচমকা একটা শুকনো বাধা এসে বন্ধ করে দিয়েছে কাজটা। মেসিনটা বসাবার জন্য একখানা মেসিনঘর বানানোর দরকার ছিল। হরবল্লভের পরিকল্পনা ছিল জিয়োন-গাছটা কেটে ফেলে ঐ জায়গায় মেসিনঘরটা বানাবেন। কিন্তু খবরটা নিমেষের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে চৈত্রের দাবানলের মতো। সিংহবাবুরা জিয়োন-গাছটাকে কেটে ফেলবেন। ঐ জায়গায় বানাবেন মিসিন-ঘর। বসাবেন হাস্‌কিন-মিসিন। হিংজুড়ির করাতিরা একদিন এসে দেখে গেছে গাছটার বেড়। শুনে হায় হায় করে ওঠে চারপাশের মানুষজন। হাহাকার তোলে সবাই। কতদিনের বৃক্ষ, মাইন্‌ষের কতখানি আশা-ভরসাব থান, মহাত্মার তুল্য, এমন বৃক্ষ কি কাটা যায়! ভাবতে ভাবতে তাদের বুকে উষ্মা জমে। কেউ কেউ আড়ালে-আবডালে হুঙ্কার ছাড়ে, এ গাছ আমবা কাটত্যে নাই দিব। হরবল্লভের কানেও পাঁচমুখ ঘুরে সে হুঙ্কার পৌঁছয।

হাসকিং মেসিন বসাবার জন্য ঐ জায়গাটাকে নির্বাচন কববার কিছু কারণ রয়েছে। এমনিতে জায়গাটা মূল গ্রাম থেকে বেশ খানিক তফাতে, কিন্তু তেতলার ছাদে উঠলে পষ্ট দেখা যায়। নজরদারি করবার সুযোগ থাকবে ষোলআনা। তেমন জায়গা যে আর একটাও নেই, তা অবশ্যি নয়। তবে, হরবল্লভ এই জায়গাটিকে নির্বাচন করেছেন অনেক ভেবেচিন্তে। ডাঙার ওপর ঐ যে কুসুম গাছটা, জিয়োন গাছ বানিয়ে ফেলে গাছটাকে একটা অলৌকিক মহিমা দিয়ে ফেলেছে চারপাশের মানুষ। হরবল্লভের আশঙ্কা, গাছটাব ওপর দেবত্ব আরোপের একটা প্রয়াস চলছে। কোনদিন হয়ত বা পুজোআচ্চা শুরু হয়ে যাবে। গাছের তলাটিতে মাটিব হাতি-ঘোড়া জমিয়ে ভৈরবেব থান বানিয়ে ফেলবে ছোটলোকের দল। গাছের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের কিছুটা জমিনও বেদখল হয়ে যাবে। হাতির দাঁত এখনো বেরোয় নি, বেবোলে তখন মুগুর মেরে ভেতরে ঢোকানো দায় হবে। হরবল্লভ হিংজুড়ির করাতিদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন। জলদি এসে গাছটাকে কেটে ফেল তুমরা। চারপাশের হল্লাটা জোরদার হওয়ার আগেই যেন ইস্তক-বিস্তি-কাবার হয়ে যায়।

কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় হিংজুড়ির করাতিরা এসে পৌঁছল সিংহগড়ে, তার পরদিন সকাল থেকে জিয়োন গাছের তলায় শ' মানুষের জমায়েত। হিংজুড়ির করাতীরা লম্বা কুমীরের মতো করাতখানাকে ফেলে রেখেছিল গাছের তলায়। একটু বাদেই করাত চলবার কথা ছিল। খবর শুনে পিলপিল করে দৌড়ে আসে চারপাশের মানুষজন। বুড়া-জোয়ান-বাচ্চা এসে ভিড় করে চারপাশে। বাউরি-বাগদি-শিকারিদের মেয়েরাও ছুটে আসে আলু-থালু। শুরু করে হল্লা। এ গাছ আমরা কাইট্‌তে দিব নাই। বাপের তুল্য গাছ, কেমন করে কাট, দেখি একবার। হিংজুড়ির করাতীরা ভয় পেয়ে যায়। করাত পড়ে থাকে রোদ্দুর পোহাতে থাকা কুমীরের মতো। করাতীরা তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়।

যথাসময়ে খবরটা কানে এসেছিল হরবল্লভের। চোখদুটি অজান্তে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

চোখের সাদা জমিনের শিরায় শিরায় লালসুতোর জাল জেগে ওঠে। কারা বেশি চিল্লাচ্ছে, কারাই বা নাটের গুরু, সব কিছুর সুলুক-সন্ধান নিতে থাকেন অনেকক্ষণ ধরে। সুকুমারের দল সামনে আসে নাই। রতিকান্ত জানায়। তবে, বোকাসোকা মানুষগুলাকে সামনে ঠেলে দিয়ে পিছন থিক্যে লির্ঘাৎ অর্কেস্টা বাজাচ্ছে উয়ারাই। হরবল্লভ থম মেরে থাকেন ক্ষণকাল। একসময় বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বলেন, করাতীদের ফিরে আইস্‌তে বল। আর, প্রভঞ্জনকে ডাক। জলদি থানায় যাউ একবার। কথাবার্তা পাকা কইর‍্যে আসুক। যত জলদি সম্ভব, এটার নিষ্পত্তি করা দরকার। গোলমেলে কাজকর্ম করতে গিয়ে ফেলে রাখতে নাই। উই তরেই তো রাবণরাজার স্বর্গের সিঁড়িখান আর ইহজন্মে তিয়ার হইল্যাক নাই।

গাছের তলায় পুলিশ খাড়া রেখে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জিয়োন-গাছটাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন হরবল্লভ। থানার বড়বাবুও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হরবল্লভকে মদত করতে রাজি ছিলেন। ব্যবস্থাদি যখন সবই পাকা, সন্ধ্যার আঁধারে পুলিশ ফোর্স এসে ঢুকে গেছে সিংহগড়ে, ভুরিভোজে মত্ত হয়েছে তারা, রাত পোহালেই করাত চলবে, ঠিক তেমনি মুহূর্তে সিদ্ধেশ্বর হাজরার চিঠি নিয়ে রাজদূত হুঁকুরে চলে এল পল্টু হাজরা। চিঠি পড়ে থমথম করতে থাকে হরবল্লভের সারা মুখ। গাছটাকে এক্ষুণি কাটতে বারণ করেছেন তিনি। হরবল্লভ বুঝতে পাবেন, গাছকাটা নিয়ে চারপাশের অসন্তোষ আর হল্লার খবর বিষ্টুপুট অবধি পৌঁছে গেছে। সিদ্ধেশ্বর চিঠিতে খুব্‌ই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সামনে ভোট। কংগ্রেসের অবস্থা বড় একটা ভাল নয়। গত একবছর ধরে জেলাব্যপী খবা, মানুষের দুর্গতি, জিনিষপত্রের আকাশ ছোঁওয়া দাম, খাদ্যের তীব্র সঙ্কট, রাজ্যবাপী কম্যুনিস্টদের খাদ্য আন্দোলন, পুলিশের গুলিতে বাচ্চাছেলে নুরুলেব মরে যাওয়া নিয়ে হৈ-চৈ এবং সর্বোপরি অজয় মুখার্জি, সুশীল ধাড়াদের দলত্যাগ,—সবকিছু মিলেমিশে কংগ্রেস এবার খুব বেকায়দায় রয়েছে। বিশেষ করে তোমার এলাকায় অনাথ রায় বাংলা-কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় ঐ এলাকায় কংগ্রেসকে বের করে আনা তোমাব পক্ষে কঠিনই হবে। জেলার সব অঞ্চলেই এমনিতরো কিছু লোক-ক্ষেপানোয়-ওস্তাদ মানুষ অজয় মুখার্জির পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি প্রতিকূল। এই মুহূর্তে এমন কিছু করে বোস না, যাতে মানুষের মনে আঘাত লাগে। গাছটাকে নিয়ে, শুনেছি, চারপাশের মানুষের একটা সেন্টিমেন্ট রয়েছে। ভোটের ঠিক আগে আগে ওটাকে কেটে ফেললে ঐ নিয়ে হৈ-চৈ বাধাবে কম্যুনিস্টরা। মানুষকে নাচাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতএব, গাছটাকে এখন কাটবার কথা ভুলে যাও তুমি। দরকাল হলে ভোটের পরে কেটো। এখন মন দিয়ে ভোটের কাজ শুরু কব। এলাকায় ঘনঘন মিটিং কর। পাড়ায় পাড়ায় প্রচার শুরু কর। ঐ এলাকায় ভোটের ব্যাপারে কংগ্রেস পুরোপুরি তোমার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, জানিও। দাপানজুড়ির আদিবাসীপাড়া হইতে খবর আসিয়াছে উহারা এখনো অবধি পর্যাপ্ত পচাই পায় নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখ। প্রয়োজনে পচাই বাবদ আরও টাকা তোমার এলাকার জন্য মঞ্জুব করা হইবে।

হরবল্লভকে গিলতে হয়েছিল সিদ্ধেশ্বর হাজরার নির্দেশ। ফলে, কেবল ভোটের দৌলতে, সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল, এলাকার তাবৎ মানুষের পিতৃতুল্য জিয়োন গাছটি।

ক'দিন প্রমথ গাঙ্গুলির দল সিংহগড় মাড়ায় নি। সুখেব পায়বার দল, হরবল্লভেব ঝঞ্ঝাটের খবর পেয়ে সাময়িকভাবে লুকিয়ে পড়েছে। হয়ত বা আড়াল থেকে মজা দেখছে। কিনা, নিজের জমিনের একখানা গাছ কাটতে গিয়ে কী পরিমাণ বেইজ্জত হল সিংহগড়। মনে মনে যে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে ওরা, এটা তো অজানা নেই হরবল্লভের। ইদানীং তো মনে মনে নিজেদেরই সমগোত্রীয় ভাবে ওঁকে। সমগোত্রীয় একজন আচমকা একটা হাস্কিং মেসিন বসিয়ে ফেলতে চলেছে, প্রাণে ধরে এমন দৃশ্য কি দেখা যায়! হরবল্লভেব সেই পাকা ঘুঁটিটি দেখতে দেখতে কেঁচিয়ে গেল, ওদের মনে এখন কত সুখ।

ভাবতে ভাবতে আকাশের একেবারে উঁচুতে উড়তে থাকা একটিমাত্র নিঃসঙ্গ চিলকে দু'চোখের চিরুনি চালিয়ে খুঁজতে থাকেন হরবল্লভ। ভাবেন, নির্বাচনটা শেষ না হওয়া অবধি যে কোনও গতিকে অপেক্ষাই কবতে হবে তাঁকে।

আর হপ্তাদুইও দেরি নেই নির্বাচনের। প্রবল উত্তেজনা শুরু হয়েছে চতুর্দিকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে যা যা করণীয় সবই করছে সরকাব। এখানে ওখানে মাটি কাটার কাজ চালাচ্ছে। ড্রাইডোল, খয়রাতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুণ। প্রতিদিন মিটিং চলছে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, ওন্দা, বেলেতোড়, বড়জোড়ায়। কুম্যনিস্টপার্টির লোকজনদেব ধরপাকড় চলছে। সুকুমার, তিলক, হঠাৎ, বাঁশি, সবাই চলে গিয়েছে ফাটকেব আড়ালে। পাড়ায় পাড়ায় পচাই বিলি বাবদ টাকা যাচ্ছে রোজ। প্রভঞ্জনের নেতৃত্বে মিতালি সংঘের ছেলেরা দিনরাত চষে বেড়াচ্ছে এলাকাময়। পুরো এলাকা একটু একটু করে তাতছে।

দোলনায় দোল খেতে খেতে, আর আপনমনে চিল গুণতে গুণতে হরবল্লভ নির্বাচনোত্তর ক্রিয়াকর্মের একখানা ছক বানাতে থাকেন মনে মনে। ভোটেব পবপরই পথেব কয়েকটি কাঁটা তিনি সরিয়ে ফেলতে চান অবিলম্বে। সুকুমারের দল তো বইলই। অনাথবন্ধুকেও রাখলেন সেই তালিকায়। দলের মধ্যে লোকটার আর আগের মতো দাপট নেই বললেই চলে। এখন তাকে ইচ্ছেমতো আঘাত করা চলে। সিদ্ধেশ্বর হাজরার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গিয়েছে হরবল্লভেব। ভোটে জিতে মন্ত্রীসভাটি গঠন হয়ে গেলেই অনাথবন্ধুকে এলাকা থেকে তাড়াবেন তিনি। আর, হরবল্লভের মনে কোনই সন্দেহ নেই, সিদ্ধেশ্বব হাজরা ইচ্ছে করলে বুদ্ধিবলে সূর্যদেবকে পশ্চিম গগনে উদয় করাতে পারেন।

৩৬. পাগলের মাদুলির উত্তরাধিকার

মাক্‌-মাক্‌-মাক্‌ মাকুন্দ / তুয়ার গায়ে কী গন্ধ!

সম্ভবত সিংহগড়েই ছড়াটার উৎপত্তি। উমা অথবা দেবিদাসের রচনা। বতিকান্তরও হতে পারে। মাকুন্দ যখন ইস্কুলে আনাগোনা শুরু করে, তখনও উমা শ্যাম পণ্ডিতের ইস্কুলে পড়ত। সে-ই ইস্কুলে চাউর করে ছড়াটা। আর, এমনই জুতসই ছড়া, ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে স্কুলময়, বাবুভায়াদের ছেলেপিলেদের মুখে মুখে। সময় নেই, অসময় নেই, মাকুন্দকে দেখা মাত্তরই তাদের মুখে মুখে খইয়ের মতো ফুটতে থাকে চড়বড়িয়ে ঃ মাক্‌-মাক্‌-মাক্‌ মাকুন্দ / তুয়ার গায়ে কী গন্ধ! আর সঙ্গে সঙ্গে মাকুন্দর চারপাশের বাতাস

এক অচেনা দুর্গন্ধে ভরে যায়। ছড়াটা না শোনার আপ্রাণ প্রয়াস চালায় সে। কিন্তু সর্বদা তার কানের কাছে মাছি ভনভনায় ঃ মাক্-মাক্-মাক্ মাকুন্দ....।

শুধু মাকুন্দই নয়, বাবুভায়াদের ছেলেপিলেরা হরেক উপায়ে নিচুজাতের বাচ্চাগুলোর ওপব নিপীড় করে প্রমোদের উপকরণ সংগ্রহ করে। মদন শীট জাতে ধোপা। সুবল মান্না নাপিত। ছড়ায় ছড়ায় বর্ণ-পরিচয়খানি সুর করে পড়তে গিয়ে 'ধ' অক্ষরটিতে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গেই বাবু-ছাত্তরদের গলা খুলে যায়। দ্বিগুণ চিৎকার করে তারা পড়তে থাকে, ধোপা কেমন কাপড় কাচে, নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁছে। এই সময়টা ওদের চোখ অতি অবশ্যই বিঁধে থাকে মদন আর সুবলের মুখের ওপর। আর, ঠিক ঐ দুটি অক্ষর পড়বাব সময় মদন আর সুবলের গলা নিচুপর্দায় নেমে যায়। মাথা দুটি হেঁট হয়। দৃষ্টি বিঁধে যায় মেঝের ওপর। আব, সঙ্গে-সঙ্গেই বাবু-ছাত্ররা চিৎকার করে বলতে থাকে, মাস্টামশয়, মাস্টামশয়, মদনা আর সুব্লা 'ধ' আর 'ন' টা বাদ দিয়ে পইড়ল্যাক। শুধু যে ক্লাসঘবে পড়বার বেলায়, তাই নয়, ক্লাসের বাইরেও মদন-সুবলকে হাতেব কাছে পেলেই তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, ধোপা কেমন কাপড় কাচে, নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁছে। মদন শীটের বাপ গাঁয়ের সম্পন্ন ঘরের কাপড় চোপড় কাচে। সুবলের বাপও চুল-দাড়ি কাটে। কাজেই, সুবল আর মদনকে সামনে পেলেই বাবুঘরের বাচ্চাবা ওদের কানের কাছে বাজিয়ে দেয়, ধোপা কেমন কাপড় কাচে, নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁছে। বলে, এই মদন শীট, কাল আমার বাড়ির খিকে কাপড় লিয়ে যাবি কাচতে। এই সুবল, আমাব চুলগুলান কেইটে দিয়ে আস্বিত বাড়ি গিয়ে। মদন-সুবল জবাব দেয় না। না শোনার ভান করে চলে যায় নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু মগজের মধ্যে আগুন জ্বলে যায় ওদের। ভাবে, যে শালা এই কথাগুলান লিখে ছাপিয়ে দিয়েছে বইতে, কোনদিন তার দেখা পেলে পেছন থেকে এক গুলতির ঘায়ে মাথাটি ফাটিয়ে দেবে। শালা, ঢ্যামনা, লিচুজাতকে লিয়ে পড়ার বইতেও মস্করা! মাকুন্দ এসব দৃশ্য নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করে। মদন আর সুবলের জন্য দুঃখ হয় তার। কিন্তু দুঃখটা বেড়ে যায় দ্বিগুণ, যখন সহানুভূতি বশত ও এগিয়ে গিয়ে মদন কিংবা সুবলের গায়ে হাত রাখলেই ওরা তীরের মতো ছিটকে যায় তফাতে। বলে, বাউরির ছেইলা, শুয়ার খাউ, ছুঁয়ে দিলি যে বড়?

সাফাইয়ের কাজকামের ফাঁকে ফাঁকে এইসব কথাই ভাবছিল মাকুন্দ। আজ স্কুলের ঝোপঝাড় পরিষ্কারের দিন। স্কুলের সব ছাত্র সাফাইয়ের কাজে লেগেছে। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে আগাছার শেকড় অবধি তুলছে। দূরে নিয়ে গিয়ে স্তূপাকারে জমিয়ে রাখছে। হপ্তাখানেক পরে, আগাছাগুলো শুকিয়ে এলে ওতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই উপলক্ষ্যে আজ স্কুলে খিঁচুড়ি-ভোজের ব্যবস্থা। কাজকামের পর স্কুলের সব ছাত্রকেই পাত পেড়ে খিঁচুড়ি খাওয়ানো হবে। হরবল্লভ সিংহবাবুই খিঁচুড়ির খরচটা দিচ্ছেন।

কাগজে-কলমে সব ছাত্রই খাটছে বটে, বাস্তবে পরিশ্রম করছে গরীব-গুরবোদের বাচ্চারা। বাবুঘরের ছেলেপিলের দল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। লোক দেখানো যেটুকু করছে, এটা নাড়ছে, ওটা ছিড়ঁছে, তাতে করে কাজের বিন্দুমাত্র সুরাহা হচ্ছে না।

অন্যদিকে কোদাল চালিয়ে চালিয়ে আর আগাছা বয়ে বয়ে মাকুন্দদের শরীর থেকে কালো ঘাম ঝরছে অবিরাম।

মাকুন্দর বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। একটুখানি জল খাওয়ার কথা ভাবছিল অনেকক্ষণ। শ্যাম পণ্ডিত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকায় কাজ ফেলে চলে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। শ্যাম পণ্ডিত ইস্কুলঘরের দিকে রওনা হতেই কোদাল থামায় মাকুন্দ। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। পায়ে পায়ে পাতকুয়োর দিকে হাঁটা দেয়।

পাতকুয়োটা নতুন হয়েছে। মাসদুয়েক। পচু ঝারমুনিয়া কেটেছে। পচু এখন কুযো কাটবার ঠিকাদার। রহিম শেখকে হেড্-কারিগর রেখেছে। কুয়োটা ব্লক থেকে করে দিয়েছে। জলটা মোটেই ভাল নয়। ঘোলাটে। গন্ধ। আসলে, যে লেয়ারে চিকন বালি, মিঠে জল, অফুরান ঝোর, সেই লেবেল অবধি পৌঁছোয় নি পচুর দল। কোনও মতে কিছুটা জল বের করে ব্লক বাবুদের দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়েছে। কুয়োর চারপাশে সিমেন্টের যে গোল চাতালখানা বানিয়েছে, সেটা মাস দুয়েকের মধ্যেই ফেটে চৌচির। ভাল করে ধুরমুশ করেনি ইট বিছানোর আগে। ইটগুলোও ছিল আধপোড়া। সিমেন্টের ভাগ ছিল নিতান্তই কম। প্রচুর টাকা মুনাফা করে বেরিয়ে গেছে লোকটা। এখন এই পচা, গন্ধ জলই খেয়ে যেতে হবে বাচ্চাদের।

মদন শীট আর সুবল মান্না আগেই পৌঁছেছে কুয়াব পাড়ে। বালতি দিয়ে জল তুলে তুলে খাচ্ছে ওরা। মুখ, হাত, পা ধুচ্ছে। মাকুন্দ গিয়েই হাত পেতে দেয় বালতির তলায়। বালতি ছিল মদনেব হাতে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একশা করে সে। বাউরিব ছেলে হয়ে সে কোন্ আক্কেলে ছুঁযে দিল বালতিটা, যখন কিনা ওদেব দুজনের জল খাওযাই শেষ হয় নি। মাকুন্দ থতমত খায়। সরিয়ে নেয় হাত। সুবল মান্না বলে ওঠে, তুয়ারা যে 'জলচল্' লয়, ইট্যাই তুয়ার খিয়াল থাকে না।

ওরা চলে যেতেই দড়ি বালতির দখল পায় মাকুন্দ। কুয়ো থেকে জল তুলে খায়। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়। তারপর নামিয়ে রাখে বালতি। কুয়োর মধ্যে উঁকি মেরে দেখে তলায় ঘোলাটে জল। জলের মধ্যে মাকুন্দর ঝাপসা ছাযাখানি ভাসছে। নিজেব ছায়াটিকে অনেকক্ষণ তারিযে তারিয়ে দেখে মাকুন্দ। সহসা তাব 'কু' দিতে খুব সাধ হয়। বাবুবাড়ির ছেলেগুলো মাঝে মধ্যেই কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে পড়ে জোরসে 'কু—' আওয়াজ তোলে। সামান্য আওযাজ শতগুণ হয়ে ফিরে আসে। মাকুন্দর ইচ্ছে করে, অমন জোরসে 'কু—' দিয়ে শতগুণ আওয়াজ তোলে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। ওরা জানতে পাবলে তক্ষুনি স্বপন মাস্টার কিম্বা শ্যাম পণ্ডিতের কাছে লাগিয়ে দেবে। মাস্টামশয়, মাস্টামশয, মাকুন্দ কুয়ায় কু— দিয়েছে। ছেপ ফেলেছে। উই কুয়ার জল আব আমরা খাব নাই। মাকুন্দর পিঠে একখানা বাঁশের কঞ্চি ভাঙবে তবে শ্যাম পণ্ডিত।

খিঁচুড়ি চড়েছে ইস্কুল ঘরের বারান্দায়। সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায়। ক্ষিদে বেড়ে যায় মাকুন্দদের। বহুদিন বাদে পেটভরে খিঁচুড়ি খাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ হযে যায় ওরা। কোদাল চলতে থাকে দ্বিগুণ গতিতে। ঝোপঝাড় পুরোপুরি সাফ হলে পর খিঁচুড়ির পাত পড়বে। আর বড় বাড়ির ছেলেরা তো হাত লাগাবে না মোটেই। কাজটা মাকুন্দদেরই শেষ করতে হবে।

কাজ করতে করতে এক সময় মাকুন্দ দেখে, ইস্কুল ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে শালপাতার বাটিতে খিঁচুড়ি নিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে গাঙ্গুলি আব দত্ত বাড়ির কাজল আর দিবাকর। একটু আগেই মাকুন্দদের কাছাকাছিই ছিল ওরা। কাজের বদলে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছিল সারাক্ষণ। মাঝে মাঝে আগাছার হাল্কা বোঝাগুলি তুলে নিয়ে মস্করার ছলে চাপিয়ে দিচ্ছিল মাকুন্দ, মদন কিংবা সুবলের গায়ে। এইসবই তো করছিল ওরা। কখন নিঃশব্দে চলে গেল? ঠাকুরকে ম্যানেজ করে কখন খিঁচুড়ি হাসিল করল। মাকুন্দর একবার মনে হয়, শ্যাম পণ্ডিতকে গিয়ে বলে দেয় সবকিছু। মাস্টামশয়, মাস্টামশয়, আমরা উদিগে ঝোপঝাড় কাইট্‌ছি, আর, কাজল-দিবাকব উখ্যেনে লুকাঁই লুকাঁই খেঁচড়ি খাচ্ছে। মাকুন্দ সামলে নেয় নিজেকে। বলে কোনও লাভ নেই। শ্যাম পণ্ডিত ওদের কিছুই সাজা দেবে না। সে সাহস ওর নেই। বরং 'যে যা কচ্ছে তাতে তুয়ার কি? তুয়াকে পাহারাদারির জন্য মোতায়েন করা হয়েছে?' বলে দু'ঘা লাগিয়ে দিতে পারে। মাকুন্দ মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুনবায কাজে ডুবে যায।

কাজল আর দিবাকর একটুবাদে ফিবে আসে। কানে কানে কী সব বলে কাঞ্চন কয়াল আব হারাধন নায়ককে। ওরা শোনামাত্র উশখুশ কবতে থাকে। একসময় নিঃশব্দে হাঁটা দেয স্কুলের বারান্দার দিকে। এবং একটু বাদে মাকুন্দ দেখে, স্কুলের পেছনে দাঁড়িয়ে ওরা শালপাতার বাটিতে করে মহানন্দে খিঁচুড়ি খেয়ে চলেছে।

কাঞ্চনরা ফিরে আসতেই পাযে পাযে হাঁটা দেয সিংহগড়েব উমা আর গাঙ্গুলিদের বাড়ির কাকলি। এইভাবে সারা দুপুব স্কুল প্রাঙ্গণে একদল দুরমুশিয়ে আগাছা সাফ করে চলে, সেই ফাঁকে অন্যদলটি খিঁচুড়িতে মজে থাকে।

সন্ধে বেলায় ব্যাটাব মুখে ইস্কুলের খিঁচুড়ি খাওয়ার গল্প শুনে লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়ে পাগল শিকাবি। একদল সাবাক্ষণ খেটে মরেছে, অন্যদলটি সেই ফাঁকে সটকে গিয়ে খিঁচুড়ি চেখেছে কিস্তিতে কিস্তিতে। ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রবোধ দেয পাগল শিকাবি। বলে, এমন দিন থাইক্‌বেক নাই বাপ। সবুর ধর্‌। আমার পাশ এক চিজ রইয়েছে, যদি একটি বার বেঁইধে দিতে পারি বংশের একজনার গায়ে তো উয়ার হাতেই এই কংস-শাসনের ইতি হবেক। সবুব ধর্‌, কারো না কারো গায়ে বাঁধবই উট্যা। ছাইড়ব নাই। বলতে বলতে কেমন উদাস হয়ে যায় পাগল শিকারি।

একটা নামকে বয়ে বেড়াচ্ছে ওরা তিনপুরুষ। একটা গুপ্তধন আজ তিনপুরুষ ধরে যখের ধনেব মতো আগলে বেড়াচ্ছে। সুধন্য নামটাকে বয়ে বেড়াচ্ছে বটে, তবে ধারণ করতে পাবে নি শরীরে। বয়ে বেড়িয়েছে পাগলের বাপ তুখোড় শিখারি, বয়ে বেড়াচ্ছে পাগল নিজে, মাকুন্দের শরীরেও নামটাকে থিতু করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পাগল। মাকুন্দও হয়ত নামটাকে বইবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। কারণ, পাগল শিকারি মনে মনে স্থির করেছে, মৃত্যুকালে মাকুন্দকে সঙ্গোপনে বলে যাবে, সে যেন তার ব্যাটার নাম সুধন্য রাখে। রাখতে পাববেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, তবে অন্তত যেন চেষ্টাটা চালিয়ে যায়। যদি নেহাতই না পারে, তাব ছেলেকে যেন বলে যায় কথাটা। পাগলের দৃঢ় বিশ্বাস, এই একখানা নামকে

তার পরবর্তী কোনও প্রজন্মের শরীরে মাদুলির মতো পরিয়ে দিতে পারলেই, শিকারি বংশের বন্দীদশা কেটে যাবে। আলোচালের ডাঙায় ফিনফিনে জ্যোৎস্নায়, কয়েৎ বেলের গাছের মাঝডালে দুলতে দুলতে সাধু জোর গলায় বলেছে সেটা। পাগলের বিশ্বাস, সাধুর বাক্য মিছা হবার লয়।

৩৮. অগ্নিকে চিনে ফেলে পরীক্ষিত

পরের দিন সকাল বেলায় পুরো বাউরিপাড়া বিস্ময়ে থ হয়ে যায়। অগ্নি যে এমন রাতের আঁধারে পালাবে, এ ছিল তাদের স্বপ্নেরও অতীত। অগ্নিকে দীপমালার কাছে রেখে পরের দিন একটুখানি বেশি বেলায় যখন ফিরে এল তিলক, তখন সারা বাউরিপাড়া উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপছে। অগ্নি কোথায় যেতে পারে, এ নিয়ে নিদারুণ গবেষণা শুরু হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছে না। আন্দাজের তীর বিভিন্ন দিকে অবশ্যি ছোটাচ্ছে, কিন্তু তীরগুলো নিশানায় গিয়ে লাগল কিনা বোঝার উপায় নেই।

গজেন সকাল থেকে তড়পাতে লেগেছে। অগ্নি যে তার নতুন নাগরটির সঙ্গেই ঘর ছেড়েছে, এ ব্যাপারে তার মনে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ, নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি আর কেই বা জানে! তার ওপর সকালে তিলকের বাড়িতে এবং আশেপাশের বাড়িগুলোতে তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে জেনেছে, তিলক কাল রাত থেকে বাড়িতে নেই।

বেশি বেলায় তিলক গাঁয়ে ফিরে আসায় যেন গজেনের সন্দেহটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। মনের মেয়ামানুষটিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়ে ফিরে এসেছে শালা। গজেন সখা বাউরিকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, তুমরা, তিল্‌কাকে ধইর‍্যে এইনে, টাঙাও। জল বিছাতি দাও। আগুন-মালসা কর। উ শালা ওলাউঠার ভেদ বমির পারা হড়হড়াই বইলে দিব্যেক সব কিছো।

বিকেলের দিকে প্রভঞ্জন 'কিলাব'-এর বাউরি-ছোকরাদের টিটকিরি দেয়, কী রে, গাঁ থিক্যে ডাইন পালাল্যাক, তুযারা ইবার দু'হাতে দু'গাছি চুড়ি পর্।

বাউরিপাড়ার রোষ তখন তুঙ্গে। এক পক্ষ বলে, তিল্‌কাকে টাঙান হউক। অন্যদল বলে, নিশান বাউরিকে। উ বুড়া সব জানে। কিন্তু দু'পক্ষই এক-পা এগোয় তো দু'পা পেছোয়। নিশান বাউরির শরীরের যা অবস্থা, ডুলিতে চড়িয়ে বড়ামতলায় আনতে হব্যেক। টাঙানোর আগেই মরে যাবেক বুড়া। বুড়া মেইর‍্যে খুনের দায়। বাকি থাকে তিলক বাউরি। তাকে অবশ্যি বেঁধে টাঙানো যায়। কিন্তু কাজটা অত সহজ হব্যেক নাই। সে একটা মাউর্‌কা পার্টির লেতা। যদিও পার্টির নিদারুণ দুর্দিন, সুকুমার আর হঠাৎ মুর্মু হাজতে পচছে, বাকিদের ধরতে পুলিশ ঘুরছে পাড়ায় পাড়ায়, তবুও কাজটা সহজ নয়। পাড়ায়-বেপাড়ায় তিলকের সমর্থক রয়েছে। মুখে কবুল করে না অনেকেই। কিন্তু আন্দাজ করা কঠিন নয়। যারা ষোল-আনার মিটিং-এ ডাইনের শাস্তি দাবি করে জোর গলায়, তাদেরই অনেকে রাতের আঁধারে

সুকুমারদের মিটিং-এ হাজির থাকে। তা বাদে, তিলকের বিরুদ্ধে সরাসরি তো কোনও প্রমাণ নেই। দু'একজন ইতিমধ্যেই আলটপকা শুধিয়েছে ওকে, রাত্তির বেলায় কোথায় গিয়েছিল সে? জবাবে তিলক নাকি বলেছে, অবন্তিকায় কবিগান হচ্ছিল। রাতভোর কবিগানের আসরেই ছিল সে। শেষরাতে গিয়ে অযোধ্যার সনাতন বাউরির বাড়িতে ঘুমিয়েছিল, বেশি বেলায় ঘুম ভেঙেছে। জলখাবার খেয়ে দেয়ে বেরোতে দু'ঘড়ি বেলা। শুনতে শুনতে ফুঁসে ওঠে শালকাঁকির বাউরিরা। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, শালা, ঢ্যামনা, মিছা কথার ঢেঁকি। তিলক যে ডাহা মিছা কথা বলছে, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, শালকাঁকির বাউরিরা। কিন্তু তিলকের বক্তব্যের জবাবে এমন তো কিছু প্রমাণ নেই ওদের হাতে, যার ভিত্তিতে তিলককে বড়ামতলায় নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেয় কুসুম গাছের ডালে।

গুঁইরাম বাউরি পুত্রশোকে পাগল পারা। সে গলার শিরা ফুলিয়ে দাবি জানায়, শুধু ঝোপড়িটা বাদ দিয়ে নিশান বাউরির ভিটা-পুকুর সব কোড়োক্ করা হউ ষোলআনায়। প্রস্তাবটা অনেকেরই মনঃপুত হয়। কোনও দিক থেকে একটা শাস্তি হওয়া দরকার। হাতে মারা না গেলে ভাতেই মার তেবে।

হয়ত পরিকল্পনাটা কাজে পরিণত হত, কিন্তু সেই বিকেলেই আচমকা পরীক্ষিত বাউরি এসে হাজির।

পরীক্ষিত বাউরি মনোযোগ সহকারে পুরো ঘটনাখানি শোনে। পাক্কা দু'দিন গুম মেরে বসে থাকে নিজের ঘরে। একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে যায় বিষ্টুপুর। পরের দিন অগ্নি আর গোরাচাঁদকে নিয়ে ঘরে ফেরে।

অগ্নির ফিরে আসার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাউরিপাড়ায়। তৎক্ষণাৎ সাজোসাজো রব। বাইরে থেকে প্রভঞ্জন দাবি জানিয়েছে, বাপ-বেটি দু'জনকেই ঝোলানো হোক কুসুমগাছের ডালে।

ঠার দুপুরে লাঠিসোটা বাগিয়ে পরীক্ষিতের দোর গোড়ায় হাজির বাউরিপাড়ার অর্ধেক মানুষ। চোখগুলো হুঁড়ারের পারা জ্বলছে। পরীক্ষিত বসে ছিল দাওয়ায়। সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে তাকায় লোকগুলোর দিকে।

লোকগুলো আগড়ের মুখে এসে অচমকা থমকে দাঁড়ায়। পরীক্ষিতের সঙ্গে এক লহমার তরে চোখাচোখি হয় ওদের। এবং পা'গুলো আটকে যায় মাটিতে। মুখের যাবতীয় ভাষাও হারিয়ে যায় বেমালুম। লোকগুলো সহসা পুতুল হয়ে যায়। চুয়ামসিনার গাজনতলার পুতুল-মেলার পুতুল সবাই!

পরীক্ষিত নির্নিমেষ দেখছিল ওদের। একটুকরো খড়কে অকারণে দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করছিল। এক সময় খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, বাইরে খাড়া হইয়েঁ গেলু ক্যানে? ভিতরে আইবি নাই? ডাইন ধইর্‌বি নাই?

এত উত্তেজনা, এত রোষ, এত সংকল্প, সব চৈত্রের হাওয়ায় খড়কুটোর মতো উবে গিয়েছে। বিভিন্ন অভিব্যক্তি সহকারে পুতুলের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে মানুষগুলো। তাদের স্মৃতিতে পলকের মধ্যে ঘাই মারে কত কিছু। পরীক্ষিত বাউরির অতীতটাকে অনেকেই

প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। চোখে দেখে, এখনও কিংবা মুরুব্বিদের মুখ থেকে শুনে, পরীক্ষিত বাউরি চারপাশের মানুষজনের কাছে এখনও এক জীবন্ত প্রহেলিকা। পরীক্ষিত বাউরি যে ইচ্ছে করলে পলকের মধ্যে কী কাণ্ড ঘটাতে পারে, আজকের ছেইলা-ছগরাদের হয়ত বা সে ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই, কিন্তু মুরুব্বিরা তো জানে ওকে, চেনে। বাউরিপাড়ার দু'দশজন তো ঐ—মহাষ্টমীর দিনটিকে চোখের সুমুখে দেখতে পায় আজও, যেদিন পরীক্ষিত বাউরি এলাকার পুরো বাউরি সমাজকে আটকে দিল আধা ঘন্টার ভাষণে। কী? না, বাবু-ভায়াদের মতো নিমন্তন্ন না পেলে একজন বাউরিও অযাচিত পাত পাড়বে না সিংহগড়ে মহাষ্টমীর রাতে। বাপরে, সেই পাহাড়-প্রমাণ ভাত, ডাল, ঘন্ট, ব্যঞ্জন, রাতভর চূড় হয়ে থাকে সিংহগড়ের সদর উঠোনে। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। শেষ অবধি পাত পাড়তেই হয়েছিল। সিংহবাবুরা লাঠির ডগায় বাউরিদের পাত পাড়তে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি পরীক্ষিত বাউরির ক্ষমতাটাকেও পরিমাপ করতে পেরেছিল শালকাঁকির বাউরিরা। শুধু এই ঘটনাই নয়, সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিন থেকে, তেভাগা, বিড়ি আন্দোলন, জলডুবি, সব ক্ষেত্রে এরা এমন এক পরীক্ষিতকে দেখেছে, যাকে সমীহ না করে উপায় নেই। বাউরিপাড়ার অনেকেই মনো প্রাণে বিশ্বাস করে, এখনও, এই বয়েসে, এমন ভিজা খইয়ের মতোন মিইয়ে যাওয়ার দিনেও, পরীক্ষিত বাউরি চাইলে চারপাশের দশহাজার মানুষকে জড়ো করে ফেলতে পাবে শালকাঁকির ডাঙায়। এখনও লাঠি ধরলে বিশটা জোয়ানকে শুইয়ে দেবে। এখনও....। আসলে পরীক্ষিত বাউরিকে পরিমাপ কবতে গিয়ে বারংবার ব্যর্থ হয় শালকাঁকির বাউরিরা। মানুষটি যেন অচেনা দীঘির মতো। সে দীঘিব জলে পা' রাখতেই ভয়। যেন জলের তলায় রয়েছে শিকল-ঝিঁজরি, পা' রাখা মাত্তর জড়িয়ে যাবে দু'পায়ে, টেনে নিয়ে যাবে পাতালের কনকনে শীতল জলেব রাজ্যে। পরীক্ষিত বাউরির চোখদুটোর ভেতরের মণিজোড়াকে যারা দেখেছে, তারাই কেবল জানে, কী গভীর আর রহস্যময় সে চোখ। হিংসা নেই, রোষ নেই, ক্রুরতা নেই, হাসি নেই, কান্না নেই, —তবুও চোখদুটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সারা শরীব শিরশির করে। কাজেই পরীক্ষিত বাউরির পলকহীন দৃষ্টিকে, শীতল গলায় তাব আপাত নিরীহ প্রশ্নটিকে, সমীহ করতেই হয় শালকাঁকির বাউরিদের।

পরীক্ষিত পলকহীন তাকিয়ে ছিল মানুষগুলোর দিকে। মাথার ওপর সূর্যটা তখন বিষবাতি হয়ে জ্বলছিল। পরীক্ষিত বাউরির মুখ থেকে মানুষগুলোর দৃষ্টি বারংবার চলে যাচ্ছিল মধ্য গগনের দিকে।

সহসা অগ্নিকে ডাক পাড়ে পরীক্ষিত, অগ্নি, বাহার আয় তো। তুয়াকে ধইর্‌তে আঁইছে। জমায়েতের দিকে পুনরায় দৃষ্টি তাক করে বলে, কে মা'র কত্তটুক দুধ খেঁইয়েছু, আগাঁই আয়, দেখি। আইজ তুয়াদ্যার রক্তে সিনান কইরে আম্মো মইর্‌ব।

জমায়েত হতচকিত, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। না পারছে পেছোতে, আর, এগিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। গজেনও রয়েছে দলের সঙ্গে। রওনা দিয়েছিল এক্কেবারে সামনের সারিতে। একটু একটু করে পেছোতে পেছোতে এখন এক্কেবারে পেছনে। বিশেষ করে

নিজের শ্বশুরকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে সেই যে ইঁদুরের মতো মুখ লুকিয়েছে কোন্ গর্তে, তাকে শনাক্ত করা মুশকিল। অগ্নির ওপর হাজার চোটপাট করলেও পরীক্ষিতকে যমের মতো ভয় করে গজেন। আড়ালে আবডালে বলে, শ্বশুর লয়, অসুর। উপস্থিত, পুরো জমায়েতটা ঠাণ্ডা মেরে জমে যাচ্ছে দেখে মনে মনে প্রমাদ গোনে গজেন। এই জন্যেই কি দু'দিন, দু'রাত পাড়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে সবাইকে চাঙ্গা করে তুলল সে! সকলের মধ্যে জেদ, কষ, পয়দা করল অত কাঠখড় পুড়িয়ে! এই জন্যেই কি সখা বাউরিকে কিস্তিতে কিস্তিতে অতগুলো টাকা দিল! প্রভঞ্জনদা শুনলে কী বইল্‌বেক! কাজেই পেছন থেকে জমায়েতটাকে যথাসম্ভব চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে গজেন। সখা বাউরির পেছনে শরীরখানা লুকিয়ে পরীক্ষিতের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, তুমি কিন্তু পুরা ষোলআনার বিরোধী হচ্ছ।

—ষোলআনা? সহসা তলতা বাঁশের মতো উঠে দাঁড়ায় পরীক্ষিত, তুয়াদ্যার ষোলআনার মুহে মুতি আমি। বলতে বলতে জমায়েতের ফাঁকে-ফোকরে দৃষ্টি বিঁধে বিঁধে আতিপাঁতি খুঁজতে লাগে কাউকে, যেমন করে পদ্মদীঘির হাঁটু-জলে কেঁচা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মাছ গাঁথে বাউরিরা। জলের তলার মাছটিকে তো দেখা যাচ্ছে না, আন্দাজে ভর করে বারংবার কেঁচা বিঁধিয়েই তুলে নিচ্ছে। কোনওবারে মাছ গাঁথছে, কোনওবারে গাঁথছে না। পরীক্ষিত বাউরি কেঁচা বেঁধাচ্ছে জনতার মধ্যে। মনে মনে কারুকে খুঁজছে।

—ষোলআনার কথাটো কে বইল্‌লি বটে? কেঁচা বেঁধানো অব্যাহত রেখে হুঙ্কার তোলে পরীক্ষিত বাউরি, কে বটে রে তুই? মু দেখা-আ। ওর বলবার ধরন দেখে মালুম হয়, কে কথাটা বলেছে সেটা বিলক্ষণ বুঝে ফেলেছে সে।

হুঙ্কার দিতে দিতে ধীর পায়ে উঠোনে নামে পরীক্ষিত বাউরি। এতক্ষণে জমায়েত একটু একটু করে পেছোতে শুরু করেছে। বাস্তবিক, পরীক্ষিতের এ এক নতুন রূপ। এমন রূপ কস্মিনকালেও দেখে নি শালকাঁকির বাউরিরা। তারা পরীক্ষিতকে ধীরস্থির, ঠাণ্ডা প্রকৃতির জানে। উত্তেজনার মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে ওর জুড়ি নেই। বস্তুত, মাথা-গরম মানুষ, এমন কোনও ছবিই ওর সম্পর্কে আঁকা নেই এলাকার মানুষজনের বুকে। বরং সংকটকালে ঠাণ্ডামাথায় মোক্ষম সমাধান করে দেয় বলেই ওর মাথাটাকে অতখানি ভয় সমীহ করে শালকাঁকির মানুষ। যে ছটফট করে না, মেপে কথা কয়, মেপে হাঁটে, চিবিয়ে খায়, আর মাটিতে পা রাখে, মানুষ তাকে সমীহ করতে বাধ্য। কিন্তু আজকের পরীক্ষিত বাউরি সকলেরই অচেনা। এমন রোষে অচেতন, গলায় এমন মুহুর্মুহু হুঙ্কার, চোখের মণিতে আগুন, মাটিতে পা ফেলবার বিপরীত ছন্দ, —এ পরীক্ষিত বাউরিকে কোনদিন দেখে নি এরা। মনে মনে প্রমাদ গোনে শালকাঁকি বাউরিরা। আগড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসে। আর, গজেন জমায়েতের মধ্যে টুপ্ করে বসে পড়ে, যেমন করে দড়ি ছিঁড়ে কুঁয়ার মধ্যে আচমকা টুপ করে ডুবে যায় ঘটিখানি।

—শালারা, ষোল আনা মারাচ্ছু? মাঝ-উঠোনে দাঁড়িয়ে, জীবনে এই প্রথম, প্রলয় হুঙ্কার ছাড়ে পরীক্ষিত বাউরি, ষোলআনা বলে কিছো আছে? যেদিন বিনাদোষে আমার বাপকে

পদমদীঘিতে চুবাইছিল্যাক সিংহবাবুরা, সিদিন কুথা ছিল্যাক তুয়াদ্যার ষোলআনা? যেদিন আমার বাপকে ধইরে লিয়ে গিয়ে ঘোড়ার গু'খাবাল্যাক সিংহবাবুরা, সিদিন কুথা ছিলে হে বীরের দল! হঁা, ছিলু বটে। আমাদ্যারকে জাতিচ্যুত কইর্‌বার তরে ষোলআনার মিটিন্ ডেইকেছিলু রাতারাতি। সিংহবাবুদ্যার ছিঁড়তেও পারু নাই। রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিল পরীক্ষিত বাউরি। বলে, আজ থিক্যে লিজ্যার ঘরে রইল্যম আমি। আর উড়া পাইখের পারা ইখ্যেনে-সিয়েনে নাই উইড়্‌ব। দেখি, দোন তুয়াদ্যার ষোলআনা কী কইর‍্যে ডাইন করে আমার অগ্নিকে।

—আমরা ডাইন কচ্ছি? এতক্ষণে সখারাম বাউরি মুখ খোলে। মিনমিনে গলায় বলে, জ্ঞানগুরু বইল্‌ল্যাক, তবেই না—।

—তুযাব ষোলআনার মুহে মুত্তি। তুযার জ্ঞানগুরুর মুহে হাগি। পবীক্ষিত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো অস্বাভাবিক আচরণ কবতে থাকে মাঝ উঠোনে, শালা, পাতা পইড়ে যোবতী মেয়ার জাং-এর তলার জড়ুলের কথাটাও বইলে দিবা যায়, লয়? বলতে বলতে পিছু ফিরে পুনবায ডাক পাড়ে, অগ্নি, তুযাকে আইস্‌তে বইল্‌ছি না?

অগ্নি, এতক্ষণে, নীর পায়ে বেরিয়ে আসে কুঠরি থেকে। মাঝ উঠোনে বাপের পাশটিতে দাঁড়ায়। চোখদুটি ফোলা ফোলা। বাপের মতোই ধীরস্থির মেয়েটা এক ঝলক তাকায় জমায়েতের দিকে। খুব ধীর গলায় বলে, খুব ত বিচার কইর্‌বার সখ তুমাদ্যার! তুমাদ্যার কথায় ত উই খালমুযাব সাথ ঘর বাঁধল্যম ফের। কিন্তু যে রাতে সিংহবাবুর বড়ব্যাটা মদে চুর হইয়েঁ বেইজ্জত কইবল্যাক আমাকে, খেজুর গাছেব তলায খাড়াই খাড়াই মিটিমিটি হাসছিল্যাক ক্যানে তুমাদ্যাব খালমুয়া জামাই, পয়লা উই বিচারটাই কর দেখি। তুমাদ্যার লগার তেজটা দেখি একবার।

—শুধু শুধ্ মানী লোকের নামে বদলামটা দিলে ত হব্যেক নাই। সখারাম বাউবি যুক্তিজাল বিছোতে থাকে, পর্‌মাণ আছে তুয়ার পাশ?

—পর্‌মাণ? পরমাণ চাও তুমরা? পর্‌মাণ পেইলেই বিচার কইর্‌বে? অগ্নির সারামুখ মাকড়া পাথরের পারা কঠিন হয়ে ওঠে। পলকের মধ্যে দ্রুত পায়ে ঢুকে যায় কুঠরির মধ্যে। পর মুহূর্তে ফিরে আসে। আগড়ের এধার থেকে দলা পাকানো পৈতেরগাছাখানি ছুঁড়ে দেয় সখা বাউরির মুখের ওপর। বলে, এই লে, পর্‌মাণ। লে, ইবার বিচার কর্।

সুতোগাছাটি হাতে নিয়ে নির্বোধের মতো দাড়িয়ে থাকে সখা বাউরি। বলে, কী ইট্যা?

—কী ইট্যা? পৈতা। সিংহবাবুর বড় ব্যাটার পৈতা। উইরাতে ছিঁড়ে গিয়েছিল উয়াব গা থিক্যে। আব, উই গজা বাউরির থিকে সুড়ুক-সন্ধান পেয়ে আমার জাং-এর তলার জড়ুলের হাল-হদিশ খুঁজছিলি তুয়ারা, যা, দ্যাখ গিয়ে, সিংহবাবুর বড় ব্যাটার বগলে উই রাতে আমার দাঁত ফুটানোর দাগ। বলতে বলতে দুমদাম পা ফেলে ঘরে চলে যায় অগ্নি। কুঠরির মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকা নিশান বাউরির পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

রাত গভীর হলে তিলক এসেছিল সন্তর্পণে। এসেছিল বাউরিপাড়ার আরও কিছু মানুষ,

যারা আজ দুপুরেও ছিল জমায়েতের মধ্যে।

ভরত বাউরি বলেছিল, দোষ লিও নাই পরীক্ষিতদা। আমরা এক্কেরে চামচিকার পারা হয়ে গিয়েছি। তুমি যদি সত্যি সত্যি থাইক্‌বে বল পাড়ায়, আমরা তেবে গা, ঝাড়া দিয়ে উইঠ্‌ব। দেখো তুমি। বিশাস কর আমাদ্যারকে।

সেদিন অনেক রাত অবধি বাপ-বেটিতে বসেছিল দাওয়ায়। ডোবার ওপারে, রাংচিতার বেড়ার খাঁজে খাঁজে অসংখ্য জোনাকি। জ্বলছিল, নিভছিল। আকাশে আধখাওয়া চাঁদখানা সরসরিয়ে হাঁটছিল। নিকষ আঁধার ভেদ করে ভেসে আসছিল কুরচি ফুলের সুবাস।

অনেক স্মৃতি রোমন্থন করছিল দু'জনে। একেবারে শৈশবকে খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনছিল দু'জনেই, দ্বারকেশ্বরের বালিতে উনুই খুঁড়ে জল বের করবার কৌশলে। একেবারে টাটকা কাঁচা দুধের গন্ধ পাচ্ছিল অগ্নি। শৈশবে ফিরে গেলে কাঁচা দুধের গন্ধ লাগে ঘ্রাণে, মায়ের বুকের কাঁচা দুধ!

একসময় অগ্নির মুখের ওপর পরিপূর্ণ চোখে তাকায় পরীক্ষিত। অচেনা মেয়েটাকে চিনতে চায়। বলে, একটা কথা জিগাব, অগ্নি?

অগ্নি ডাগর চোখে তাকায়। প্রশ্নটার জন্য তৈরি হয়েছে।

খুব নিচু গলায় পরীক্ষিত বলে, তিলকটাকে কি ভাল লেগ্যেছে তুয়াব?

অগ্নির নাভিমূল অকস্মাৎ সুড়সুড় করে ওঠে। বগচরা মাজ্‌নাদীঘিতে লাল-শালুকের কুঁড়ি মুখ দেখায়। পাথরচেট্যার ডাঙার টাঁড় জমিনের বুকে সর্ষে গাছগুলি সহসা ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে ওঠে। অগ্নির চোখদুটি আঁকোড় ফলের শাঁসের মতো সোহাগী হয়ে আসে।

পরীক্ষিত নিষ্পলক দেখছিল। দেখতে দেখতে এক সময় সে চিনে ফেলে অগ্নিকে। খুব একান্ত গলায় বলে, কথা বলি তেবে উয়ার সাথ?

হাওয়ার দমকায় পুনরায় ভেসে আসে কুরচি ফুলের সুবাস। গাঢ় কামনারা আঠাঙ্গীলতার মতো পেঁচিয়ে ওঠে বুকে। নৈশ বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আপন শরীরের কামজ গন্ধ। নিকষ অন্ধকারে একটা ঠুরকো ব্যাঙ নিঃশব্দে গিলে ফেলে অবোধ পোকাটিকে।

অগ্নি বাপের কাঁধে মাথা রেখে পরম আয়েশে চোখ বোঁজে।

৩৯. তগীতে পুরোপুরি আটকে গেল বুদ্ধদেব

তগীটা যে বেশ শক্তপোক্তভাবে গেঁথেছে, এটা কাল সারারাত ধরে তিলে তিলে উপলব্ধি করেছে বুদ্ধদেব। সারারাত বিনিদ্র কেটে গেছে তার। অনাথবন্ধু সব শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, গোবিন তো সুকুমারদেরই দলের লোক? সে ধন্ধটা এখনো অবধি রয়েছে বুদ্ধদেবের। গোবিন মিস্তিরি এমন কাজ করবে এ যেন বিশ্বাস করাই কঠিন। গোবিন সৎ, স্পষ্টবক্তা মানুষ। হরবল্লভের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলবার দরুণ তার হাজতবাস হয়েছিল। এখনো সেই সাজানো মামলা চলছে। ও যখন জামিন পাচ্ছিল না, সুকুমাররা কত চেষ্টা করেছে। কত কাঠখড় পুড়িয়ে জামিনে করিয়েছে ওকে। যদ্দিন সে হাজতে ছিল, সুকুমাররা ওর পুরো সংসারটাকে

মা-পাখির মতো আগলে রেখেছে। মামলাটা চালাতে গিয়ে গোবিন মিস্তিরির ভাঙা সংসারের কাঠামোটা একেবারেই ভেঙে থুবড়ে পড়েছে। স্পষ্ট কথা বলবার জন্য যে মানুষটা অতখানি বিপদের মুখে ঠেলে দেয় নিজেকে, সে কখনো এমন হীন কাজ করতে পারে? অথচ মাকুন্দ শিকারি ঠাকুর-দ্যাবতার নামে দিব্যি কবে বলেছে, সে নাকি গোবিন মিস্তিরিকে একতাড়া কাগজের বাণ্ডিল চটের থলিতে ভরে, তুলে দিতে দেখেছে হরবল্লভের হাতে। থলিটা হাতে নিয়ে হরবল্লভ নাকি খুব ক্রুর হেসে বলেছে, মন্দোদরীর থিক্যে মৃত্যুবাণটি হস্তগত কইর্‌বার পর, স্বয়ং বাল্মিকীও রাবণকে বাঁচাতে পারে নাই। ইবার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরকে দেইখ্‌ব আমি!

ডালে-পালায় তখনও রোদ্দুর ছড়ায় নি, অকস্মাৎ দীপমালা আর মল্লিকা এসে হাজির। বিষ্টুপুরের প্রথম বাসে চড়েই এসেছে ওরা। কোনও রকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই মল্লিকা শুধোয়, মাস্টার-রোলগুলো তোমার কাছে রয়েছে ত? বুদ্ধদেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মল্লিকার দিকে। বিড়বিড় করে শুধোয়, তুমি জানলে কেমন করে? মল্লিকা সর্বস্বান্ত ভাব করে তাকায় দীপমালার দিকে, দীপাদি, কী হবে? মল্লিকা আর দীপমালাকে দেখতে দেখতে বুদ্ধদেব ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে? তলিয়ে যেতে থাকে অতলে। একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁসে আটকে গেছে, এমন বিশ্বাসটা ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে।

ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিল মল্লিকা, ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছিল। দু'চোখ দিয়ে অসহায় বোষ আব বিরক্তি ঝরিয়ে বলে, তোমার জন্য ভাবতে ভাবতে আমি একদিন পাগল হয়ে যাব।

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে ঘবের মধ্যে ঢোকে মল্লিকা। সারাঘরের কাগজপত্র উল্টেপাল্টে সন্ধান চালায় আঁতিপাতি। সারা ঘর তছনছ করে ফেলে।

বিডিও সাহেব পলকহীন তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের দিকে, মাস্টাররোল চুবি গ্যাসে? কেডা চুরি কল্ল?

গোবিন মিস্তিরির কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নেয় বুদ্ধদেব। সুকুমার, গোবিন মিস্তিরি এরা একই দলের লোক। কে জানে, কোন্ ফ্যাসাদে পড়ে যায় সুকুমাররা। বুদ্ধদেব বলে, বুঝতে পারছি না।

— আব কি কি চুরি গ্যাসে?

— আর কিছুই না।

— শুধু মাস্টাররোলগুলোই চুরি গেল? বিডিও সাহেবের চোখে মুখে বিদ্রূপ, খুব সমঝদাব চোর লাগ্‌সে। বলতে বলতে হঠাতই অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে আসে বিডিও সাহেবের মুখ। পাথরের মতো কঠিন। বলেন, শুন, বুদ্ধ, আমি হাজার ঘাটের জল খাইয়া এহানে আইসি! ফুডে সিলাম, সিটেলমেন্টে সিলাম, আমারে বাচ্চা ছেলে ভাইবো না। মাস্টাররোল চুরির গুল্পটা আর কারুর কাসে কইরো না। শুইন্যা ঘোরায়ও হাসব। সোজা কথা কও না ক্যান, কাজটাতে পুকুর চুরি হইসে, ভাবছিলে ডুইব্যা ডুইব্যা বেবাক

জল খায়া ফেললেও একাদশীর ফাদার কিস্যুটি জান্‌ব না। পাবলিক পিটিশনটা হয়ে যাওয়াতে সামলাইতে না পাইর্‌যা অহন খোদ মাস্টাররোলই হাপিস! এ্যাঁ?

অক্ষম রোষে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে আগুন জ্বলছিল। কানের ডগা নিঃশব্দে পুড়ছিল। জিভখানা অসাড় হয়ে আসছিল বুদ্ধদেবের। মল্লিকার কথাগুলো মনে পড়ছিল বারবার। গতকাল শেষ বেলায় বিডিও সাহেবের ঘরে গোপন শলা করছিল করালী সোম। তখন অফিসে ভাঙাহাট, তেমন কেউই ছিল না। বামাচরণ আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করেছিল। পুরোপুরি শুনতে পায়নি কিছুই, তবে বারবার মাস্টাররোলের প্রসঙ্গ উঠেছিল। মাস্টাররোল জমা না দিতে পারলে কি কি 'কনসিকুয়েন্স' হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করছিল দুজনে। অর্থাৎ, বুদ্ধদেব ভাবে, ও যে মাস্টাররোল জমা দিতে পারবে না তা আগেই জানতেন বিডিও সাহেব। চক্রান্তটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সকালেই। এখন বিডিও সাহেবের চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে বাকিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আহত ইঁদুরকে বাগে পেয়েছে বেড়াল। ঠোঁট চাটতে লেগেছে। বিডিওকে দেখতে দেখতে ঠিক এমনটাই মনে হয় বুদ্ধদেবের।

বিডিও সাহেব বলেন, মাস্টাররোল যদি সত্যি সত্যিই জমা না পরে তো সোল্‌ রেস্‌পন্‌সিবিলিটি তোমার ঘাবেই আইসিয়া পরবে গা। কারণ, এ্যাডভান্স লইবার পেত্যেক পিটিশনে তুমি ঝারিয়া লিখিয়া দিছ, মাস্টার রোল ডিউলি রিসিভ্‌ড্‌ বাই মি, ফারদার্‌ অ্যাডভান্স মে বি মেইড্‌। লেখ নাই?

বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে মাথা দোলায়।

— তবে? সুকুমাররা জালের বাইরে বারাইয়া গ্যাসে গা। তুমি একলাই পর্‌স জালে। একখিলি মিঠে পান মুখে পোরেন বিডিও সাহেব। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলকে চিমটে বানিয়ে কৌটো থেকে জর্দা তুলে নেন। বার দুই কচমচ করে চিবিয়ে বলেন, এ্যাদ্দিন ক্যামন মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করছস্‌, বুঝতে পারস? সেই বলে না, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মধু খাইল সব্বাই, বিপদ কালে তোমার ঘাবে সব দোষ চাপাইয়া দিয়া...। যাগ্‌গ্যা, বিডিও সাহেব দু'চোখ মুদে ডিক্টেশ্নন দেবার ভঙ্গিতে বলতে থাকেন, মাস্টাররোলটা যে তোমার হেফাজতে হেটা রিটিন্‌ জানাও আমায়। মুখের কথায় তো আর অফিস-আদালতের কাম চলে না।

বুদ্ধদেব সেই মুহূর্তে বিডিও সাহেবের প্রতিটি কথা, বাক্য, শব্দ, সবকিছুর মধ্যে গভীর তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছিল। অফিসের সঙ্গে 'আদালত' শব্দটি যোগ করার পেছনে তেমন এক ধরনের গূঢ় তাৎপর্য খুঁজে পায় সে। চারপাশে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। আগামী দিনগুলোর ছবি, ভাঙাচোরা, কংকাল, যেন আগাম প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধদেব। ঠিক এমনই মুহূর্তে খুরশিদ সাহেবের কথা বড্ড বেশি মনে পড়ে। আজ এই জেলায় তিনি থাকলে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় হয়ত পাওয়া যেত।

বুদ্ধদেব খুব ধীরগলায় বলে, লিখিত আমি অবশ্যই দেব স্যার। আর একটুখানি খুঁজে দেখি। তবে মাস্টাররোল যদি শেষ অবধি নাও পাওয়া যায়, কাজটা তো হয়েছে। রাস্তার

দুধারের মাটি-কাটা পীটগুলোই তো তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। আপনি মেজারমেন্ট করান।

বিডিও সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের দিকে। সামান্য চিন্তিত দেখায় তাঁকে। পর মুহূর্তে বলেন, ইনভেস্টিগেশন, ম্যাজারম্যান্ট সবই হইব গা। চিন্তা নাই তুমার। করালী নয়, পি-ডব্লু-ডিব এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার্‌রে লিখসি। তিনি স্বয়ং গিয়া ম্যাজারমেন্ট নেবেন। ইনভেস্টিগেশনে আমি কোনও ফাঁক রাখুম না।

তখন বিকেল গাঢ় হচ্ছে। গাছ-গাছালির ছায়াগুলো লম্বায় বাড়ছে। ত্রিভঙ্গ বসেছিল দুঃখহরণের চায়ের দোকানে। দূর থেকে বুদ্ধদেবকে দেখে ইঙ্গিতে ডাকে। থমথমে মুখে বলে, এসব কী শুনছি?

বুদ্ধদেব বসে পড়ে পাশটিতে। সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা জানায়। বলে, এটা একটা কন্‌স্‌পিরাসি।

ত্রিভঙ্গকে খুবই বিমর্ষ লাগছিল। চোখে মুখে খেলা করছিল দুশ্চিন্তা। সেটা যে আন্তরিক, বুদ্ধদেবের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

খুব ভারি গলায় ত্রিভঙ্গ বলে, কতবার বলেছি, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া কোর না। অত সতীপনা ভাল নয়। সতীপনার যুগ আব নেই। একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে ত্রিভঙ্গ। তাবপব বলে, এখন কি কববে?

বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে মাথা দোলায়, কিছু ভাবিনি।

— প্রণয়দাকে বলেছ?

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে বুদ্ধদেব, যাব একবার। খুলে বলব সবকিছু।

প্রণয়দা বেজায় ব্যস্ত। ভোটের কাজেকর্মে একেবারে জেরবার অবস্থা। রোজ রোজ কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম থাকছে তাঁর। মিটিং, মিছিল, স্ট্রীট কর্ণারিং। সমিতির লোকজন সারাক্ষণ ভিড় করে রয়েছে। তাবই মধ্যে বুদ্ধদেবের সমস্যাটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন তিনি। খুবই চিন্তিত মনে হয় তাঁকে। সামান্য বিরক্তও। বলেন, ঘরের ভেতর থেকে মাস্টারবোল চুরি গেল, জানতেই পারলে না? চুপ করে বসে থাকে বুদ্ধদেব। তার কীই বা বলবাব আছে? ভারি এক জটিল ফাঁসে আটকে গিয়েছে সে। প্রণয়দা বলেন, ঠিক আছে, মেজারমেন্টটা শেষ হোক। ইতিমধ্যে আমি সনৎদাকে বলে রাখব সবকিছু। তবে মাস্টাররোল না পাওয়া গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। মেজারমেন্টে মাটি ঠিক ঠিক পাবে তো?

বুদ্ধদেব পুনরায় অধোবদন হয়। মেজারমেন্ট নিয়ে বিডিও সাহেবের তাৎক্ষণিক উৎসাহ দেখবার পর থেকেই চিন্তাটা জাঁকিয়ে বসেছে ওর মগজে। বলে, মাটিতো অবশ্যই পাবে। সুকুমার বাবু, তিলক, —এরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছেন। তবে টেস্ট-রিলিফের কাজে, কোনও সময়ই তো পুরো মাটি দেয় না লেবাররা।

বেশ খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে থাকেন প্রণয় দাশগুপ্ত। একসময় বলেন, ঠিক আছে। মেজারমেন্টটা হোক আগে। কি রেজাল্ট হয় দেখা যাক। চিন্তা কোর না। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তুমি যে পুরোপুরি সৎ, আমরা তো জানি। সব্বাই জানে।

ত্রিভঙ্গ আর বুদ্ধদেব বেরিয়ে আসে সমিতির অফিস থেকে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে ত্রিভঙ্গ। ঘোর কালো মেঘ জমেছে মুখে। যেন বুদ্ধদেবের নয়, সঙ্কটটা একান্তভাবে ওরই। বলে, একটা কথা বলব?

বুদ্ধদেব মুখ তুলে তাকায়।

— আমার মন বলছে, এক্কেবারে ফেঁসে গেছ তুমি। চারপাশ থেকে খুব শক্তপোক্ত করে কেসটাকে বানিয়েছে ওরা। প্রণয়দা যাই বলুন, এর থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত হবে তোমার পক্ষে।

বুদ্ধদেব নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। তারও কেন জানি মনে হচ্ছে, খুব শক্ত ফাঁসে আটকে গেছে সে।

ত্রিভঙ্গ বলে, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

— কী

— এখনও সময় আছে। হরবল্লভবাবুর কাছে গিয়ে সরাসরি সারেন্ডার কর। এ যাত্রায় তিনিই তোমায় বাঁচিয়ে দিতে পারেন! আমার ধারণা, মাস্টাররোলগুলো এখনো অবধি ওঁর কাছেই রয়েছে।

বুদ্ধদেব গুম মেরে থাকে। সূর্য ডুবেছে খানিক আগে। খুব দ্রুত বিষণ্ণ হয়ে আসছে পৃথিবী। তবে এখনও চারপাশের মানুষজনের মুখ দেখা যায়। চেনা যায়। দ্বারকেশ্বরের বালির বুকখানা নিঃশব্দে পার হয়ে যায় দু'জনে। বুদ্ধদেব এক সময় খুব অস্ফুটগলায় বলে, ভেবে দেখি।

সেদিন অকারণে জয়রামপুর অবধি এল ত্রিভঙ্গ। বুদ্ধদেবকে চুয়ামসিনার পথে নামিয়ে দিয়েই ফিরে গেল।

চুয়ামসিনা ফেরার পথে পদমদীঘির পাড়ে আচমকা গোবিন মিস্তিরির সঙ্গে মুখোমুখি। তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। খুব কাছে এলে মানুষকে চেনা যায়। সিংহগড়ের দিক থেকে ফিরছিল গোবিন। আচমকা বুদ্ধদেবের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে হকচকিয়ে যায়।

বুদ্ধদেব সরাসরি চোখ ফেলে গোবিনের মুখের ওপর। ওর সারামুখে আতিপাঁতি খোঁজে এক চিলতে অপরাধের চিহ্ন। অভাবে, অনটনে চিমসে হয়ে আসা এক বয়স্ক মুখ। সারা শরীরে, ত্বকে, গ্রন্থিতে, অজস্র টানাপোড়েনের চিহ্ন। চোখের মণিতে দীর্ঘ ক্লান্তি। অবসাদ।

গোবিনকে কিছুতেই কথাটা শুধোতে পারে না বুদ্ধদেব। তার সঙ্কোচ জাগে মনে। জবাবে সে যে 'না' বলবে, কিছুতেই যে নিজের কৃতকর্ম স্বীকার করবে না, এতো জানা কথাই। শুধু শুধু তাকে একথা জানিয়ে লাভ কি যে তার কুকর্মের কথা বুদ্ধদেব জেনে ফেলেছে। তাছাড়া, চরম সঙ্কটের মধ্যেও, গোবিনকে দেখে কিছুতেই রোষখানা উথলে ওঠে না বুদ্ধদেবের। বরং একধরনের প্রচ্ছন্ন মমতায় ওর সারা বুক ভিজতে থাকে অজান্তে। হায়রে, এক কালে মানুষ ছিল লোকটা। স্পষ্ট কথা বলত। এখন আর পুরোপুরি মানুষ নেই। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক অন্যের ইচ্ছেপূরণের যন্ত্র। অর্ধেক মানুষ এখনো অবধি রয়েছে

গোবিন মিস্তিরি, এমনটা না ভেবে উপায় থাকে না বুদ্ধদেবের। কারণ, সে তো গোবিনের চোখের তারা দুটিকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়েছে তার বুকের প্রত্যন্ত প্রদেশে। এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেখানে চলছে এক মর্মান্তিক দহন। হয়ত বা নিরুপায় হয়ে অমন কাজ করে ফেলেছে লোকটা। হয়ত এমনটা করতে বাধ্য হয়েছে সে। হয়ত বা সেই কারণেই এক সীমাহীন অনুতাপের আগুনে নিঃশব্দে জ্বলছে।

স্মিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে গোবিন মিস্তিরিকে পেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয় বুদ্ধদেব।

৪০. দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণপালা

দ্বারকেশ্বরের সেই অভিশপ্ত দ'।

কবে, কতকাল আগে, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে গিলে ফেলেছিল, নাকি নেহাতই রটনা, আজও সেই দ'য়ের শরীরে লেগে রয়েছে সেই কলঙ্কের ছোপ। নিসর্গ-নিরপেক্ষ বুদ্ধদেবের চোখদুটি মাঝে মধ্যে এলোমেলো খুঁজে বেড়ায় দ'য়ের কেন্দ্রস্থল। যেখানে এককালে ঘূর্ণি খেতে খেতে দ্বারকেশ্বরের জল সৃষ্টি করেছে একটি মরণ-কূয়া। যার উপরিভাগ মোটা দানার বালিতে ঢেকে গিয়েছে, কেবল আত্মঘাতকামী মানুষ ছাড়া কারও কাছে সে তার মুখখানিকে অনাবৃত করে না। কিংবা এও এক রটনা। যেমন কুন্তীকে নিয়ে রটেছে বুদ্ধদেবের নামে, যার জন্য মল্লিকা পাথর হয়ে ছিল কতদিন। হয়ত তেমনই কোনও হীন রটনা বোবা দ'টির সম্পর্কে। হয়ত কোনও দিনও কাউকে গিলে খায় নি বেচারা। আঙুল-কাটা পোকা, কবে কার আঙুল কেটেছিল, কেউ জানে না, তবু তার নামে স্থায়ী হল কলঙ্ক-রটনা, কিনা 'আঙুল-কাটা পোকা'।

দ' আসলে স্রোতবান নদীরই একটা-অংশ। এককালে সমগ্র স্রোত-ব্যবস্থার অংশ ছিল। ক্রমশ মূল স্রোতের থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হতে থাকে সে। বহমানতা, হটকারিতা এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তার শরীর থেকে একটু একটু করে খসে পড়তে থাকে শুকনো বাকলের মতো। শরীরের জীবন্ত কোষগুলি, রক্ত চলাচল ব্যবস্থা, স্রোতস্বিনীর এই অংশে একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে আসে। নদীর এই অংশটি একটু একটু করে মরে যেতে থাকে। সজীব গাছের শুকনো ডালের মতো। জীব শরীরের শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থানের মামড়ির মতো। মূল শরীরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মৃত ও পরিত্যক্ত অংশ।

বুদ্ধদেবের হাতের খামটি আচমকা ওকে একখানি দ'বানিয়ে দিয়েছে। প্রশাসনের বহমান স্রোতখানি থেকে কিংবা নিজের কর্মচারী সংগঠনের শরীর থেকে যেন আচমকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে। বিধান সভা নির্বাচনের আর মাত্র দিন চারেক বাকি। চতুর্দিকে ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু প্রশাসন, এমনই যান্ত্রিক, এমনই অমোঘ, নির্বাচনী মহা ব্যস্ততার মধ্যেও সেই যন্ত্রের সবগুলি চাকা কেমন অনিবার্য শৃঙ্খলায় আবর্তিত হয়, এবং যথাসময়ে বুদ্ধদেবের হাতে চলে আসে একখানি ধূসর রঙের খাম, খামের মধ্যে যথাযথ বাঁধুনি সহকারে লিপিবদ্ধ তার সাস্‌পেনশন অর্ডার, —বুদ্ধদেব অবাক হয়ে যায়। আর খবরটা কেমন করে যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় চৈত্রের দাবানলের মতো। হরবল্লভের দল, তাদের

যাবতীয় নির্বাচনী ক্রিয়াকলাপের ফাঁকে হা-হা করে হেসে ওঠে, উল্লাসে মেতে ওঠে, এবার কী কইর‍্যে বাঁচব্যেক ছগ্‌রা? এখন আর পিয়ারের ডি-এম'টি নাই যে বাঁচাবেক। এবার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা শুরু হবেক। বিশ্বভুবন ভুলভুল চোখে দেইখ্‌বেক সে দৃশ্য। পাঠাই দাও দাপানজুড়ি বাউরিপাড়ায় আরও দশ হাঁড়ি পচাই, আর জনা পিছু পাঁচটা কইরে টাকা। কামদেব দত্তকে খবর পাঠাও যেন দাপানজুড়ির একটাও ভোট অন্য বাস্‌কে নাই পড়ে। শালা, যমন ঠাগ্‌রের তমন পূজা। এই মতে হরবল্লভদের বুকের খোদলে বুদ্ধদেবের সঙ্কট ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের জয়ের সম্ভাবনা, দুইয়ে মিলে এক অপরূপ উল্লাসের জন্ম দিয়েছিল। মিতালি সংঘের সামনের মাঠে বুক চিতিয়ে খাড়া হয়ে তার অনুগত সাগরেদদের সামনে বারংবার ঝলসে উঠেছিল প্রভঞ্জন সিংহবাবুর বিজোড় দাঁতগুলি, শালা, স্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। এক ঘায়েই বাছাধন ভূমিতলে চিৎপটাং।

শুধু হরবল্লভরা নয়, কথাটা অনাথবন্ধু, সুকুমার, মকবুল, তিলক সকলেরই কানে গিয়েছে। সবাই তখন জীবন-মরণ সংগ্রামে রত। এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর তাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। চোদ্দপার্টির শরিক হিসেবে সুকুমারের দল আর অনাথবন্ধুর নবগঠিত বাংলা কংগ্রেস পরস্পর অনেক কাছাকাছি। যৌথ মিটিং-মিছিল করছে ওরা। হরবল্লভের দল আঙুল তুলে অনাথবন্ধুকে দেখায়, দ্যাখ হে, চিনে লাও। বলি নাই, এ শালা চিরকাল বর্ণচোরা? এক্কেরে অন্য ডালের পাইখ? অনাথবন্ধু এবং সুকুমাব পৃথক পৃথক ভাবে আশ্বাস দিয়েছে বুদ্ধদেবকে। নির্বাচনটা হয়ে যাক। কোনগতিকে যদি জিতি তো আপনার ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে তিন টুশকির মামলা। বলতে বলতে পুনরায় নির্বাচনী কাজে কর্মে ডুবে গিয়েছে ওরা। পুনরায় নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছে বুদ্ধদেব।

ঠিক এমনই মুহূর্তে খুরশিদ সাহেবের মুখখানি মনে পড়ে যায়।

সাসপেনসনের অর্ডারখানি হাতে পাওয়ার পর দীপমালার সঙ্গে দেখা হয় নি বুদ্ধদেবের। বুদ্ধদেব ইচ্ছে করেই দেখা করে নি। কারোর সঙ্গেই দেখা করতে ইচ্ছে করছে না তার। এমন কি শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গেও নয়। বুদ্ধদেব জানে, এখন তাদের সামনে হাজির হলেই তারা ভাববে, বুদ্ধদেব তার এই নিদারুণ সঙ্কটকালে সাহায্য চাইতে এসেছে। করুণা ও সহানুভূতির সওদা করতে এসেছে। তাছাড়া এই মুহূর্তে দেখা করেই বা লাভ কি? কারও কি কিছু করবার রয়েছে! নির্বাচনকে নিয়ে এক নিদারুণ অনিশ্চয়তায় কালক্ষেপ করছে সবাই। প্রতি মুহূর্তে একটা 'কী হয় কী হয়' ভাব। বহুদিন বাদে কংগ্রেসে এসেছে প্রত্যাশিত ভাঙন। বামপন্থীদের সামনে, বহুদিন বাদে, এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এমন সুযোগকে ষোলআনা কাজে লাগাতে জীবন পণ করে লড়ছে সবাই। বুদ্ধদেব আচমকা সামনে দাঁড়িয়ে ওদের চলার গতিকে শ্লথ করতে চায় না একতিল। ইচ্ছে থাকলেও এই মুহূর্তে কারুর কিছুই করবাব নেই। আইন মোতাবেক সাসপেনশন অর্ডার, ডি-এম সাহেবের কাছে একখানা ডেপুটেশন দিলে তা প্রত্যাহৃত হবে না এমন উথালপাথাল সময়ে। বুদ্ধদেব কাজেই এমন মুহূর্তে কাউকেই বিব্রত কবতে চায় না। নিজের বোঝাখানি নিজেই বইতে হবে তাকে।

৪১. জনারণ্যে একা

দুপুর নাগাদ অনাথবন্ধুর বাড়ির কুঠরিখানাকে একটু একটু করে অসহ্য লাগছিল বুদ্ধদেবের। ইচ্ছে করছিল একবার বিষ্ণুপুরে যায়। নির্বাচনী ফলাফল আসছে চতুর্দিক থেকে। বামপন্থীদের বিজয়ের সংবাদ। সারা বিষ্ণুপুর শহর নাকি উথালপাথাল হয়ে উঠেছে। ঠায় দুপুরে রওনা দিয়েছিল বুদ্ধদেব। দ্বারকেশ্বরের পাড়ে এসে সহসা থমকে থেমেছিল সে। সামনে এগোতে রাজি হচ্ছিল না মন। কী কারণে যাবে সে ঐ আনন্দের হাটে! ওখানে কী রয়েছে তার জন্য? এই আনন্দের বন্যায় তার অংশ কোথায়? ভাবতে ভাবতে তার পা' দুটো আটকে গিয়েছিল মাটিতে। দ্বাবকেশ্বরের দ'খানার পাড়েই বসে পড়েছিল সে। বসে বসে নিষ্পলক দেখছিল চারপাশের নিসর্গকে।

সেই দুপুব থেকে দ্বারকেশ্বরের পাড় ঘেঁসে সাবি পুতুল। অযোধ্যাব দিক থেকে সারি সার পুতুল। দ্বারকেশ্বরের ওপারে, বাঁধের ওপর দিয়ে সারি সারি পুতুল। চার পাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত-ভুঁই, ডাঙা ডিহি মাড়িয়ে সারবন্দী পুতুলের দল হেঁটে চলেছে অবিরাম। বুদ্ধদেব বসে বসে সেই কতক্ষণ ধরে পুতুলের আনাগোনা দেখছে। সেই দুপুর থেকে শুরু হয়েছে পুতুলেব কুচকাওয়াজ। এখনও অবধি জাবি বয়েছে সেই খণ্ড খণ্ড মিছিলেব ধারা। দিগন্তের বিভিন্ন অংশে একগুচ্ছ কালো ফুটকিব মতো জেগে উঠছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে ফুটকিগুলি। কলেবব নিচ্ছে। প্রমাণ সাইজেব হচ্ছে একেবারে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সংক্ষিপ্ততম দূরত্বে এসে। আবাব একই প্রক্রিযায় ছোট হতে হতে বিন্দুর আকার নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অবন্তিকা কিংবা জয়কৃষ্ণপুরের আড়ালে। এত মানুষ কোথায় যায়? এত পুতুল কোথায় যায়! কেন যায়! বুদ্ধদেবের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা দল। তাদের দু'চোখে কুরচি ফুল ফুটে ছিল থোকা থোকা। বুদ্ধদেবের শরীব ছুঁয়ে চলে গেল ফুটন্ত কুরচি গাছেব দল।

গতকাল ব্লক অফিসে গিয়েছিল বুদ্ধদেব। সেখানে নির্বাচনের পরবর্তী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিযেছে। কর্মচারীদেব ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্য নির্দিষ্ট কোনও কাজের কথা কেউ বলে নি। নিজেকে খুব অপ্রাসঙ্গিক লাগছিল সারাক্ষণ। পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল সমিতির অফিসে। আবীরে আবীবে ভরে গিয়েছিল প্রত্যেকের শরীর। ভরে গিয়েছিল মেঝে। পুরু আবীর জমেছিল সমিতির অফিসেব সামনের মাঠে। গত পরশু থেকে নির্বাচনের ফলাফল আসছিল চতুর্দিক থেকে। কাল সকালেব মধ্যেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দিক থেকে খবব আসছিল। সিদ্ধেশ্বর হাজরাদের সর্বনাশের খবর। সরকার গড়তে চলেছে চোদ্দ দলেব যুক্তফ্রন্ট। আবীরে আবীবে লাল হয়ে যাচ্ছে বাতাস। চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে মানুষ। কলিজাব দম ফুরিয়ে গেলে পুনরায় ভবে নিচ্ছে তৎক্ষণাৎ। বুদ্ধদেব সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে দু'চোখ দিয়ে গিলছিল সেই দৃশ্য। গতকাল।

প্রতিটি দৃশ্য অথবা দৃশ্যখণ্ডেব মধ্যে একখানা ছবি থাকে। সেই ছবির মধ্যে একটা নিসর্গ থাকে। সেটা হল ছবির প্রেক্ষাপট। সেই প্রেক্ষাপটের সামনে কিছু বিচরণশীল মানুষও।

তারাই কুশীলব। তারাই সেই ছবির চরিত্র। তারাই নিয়ন্তা। তারা নিজেরাই আঁকে সেই ছবিখানি। নিজেরাই থাকে সেই ছবির মধ্যস্থিত ভূমিতে। তারা ছবির মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়ে দেয়। যেমন পাগল শিকারি। একখানা ছবি আঁকতে আঁকতে সে অবলীলায় ঢুকে পড়তে পারে সেই ছবিতে। ছবির অংশবিশেষ হয়ে যেতে পারে অজান্তে। বিপজ্জনক সব স্বপ্ন দেখতে পারে। আধো-অন্ধকার পাকশালে নিঃশব্দে ঢুকে পড়া বেড়ালের মতো সেঁধিয়ে যেতে পারে সেই স্বপ্নের শরীরে। পাগল শিকারি সেটা পারে। কিন্তু বুদ্ধদেব তা স্থায়ীভাবে কোনদিনও পারে না। সেই কারণে কর্মচারী সমিতির অফিসের থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে টুকরো টুকরো ঘটনা, মানুষ, তাদের হাসি, উল্লাস, আবীর, চিৎকার, স্লোগান ইত্যাদিকে নিয়ে যে ছবিখানি বানিয়ে চলেছিল নিঃশব্দে, হাজার চেষ্টা চালিয়েও নিজেকে সেই ছবির অন্তর্ভুক্ত করতে পারে নি। গতকাল। এমন নয় যে, ছবিখানার মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়লে ছবির মধ্যস্থিত কোনও কুশীলব, কিংবা ঘটনা, অথবা নিসর্গ অথবা উড়ন্ত আবীরের ঝাঁক —কেউ তাতে প্রবল আপত্তি জানাত, কিংবা, রিং-এর বাইরে, ঠিক তেমনই কায়দায় কেউ তাকে বহিষ্কার করত মূল চিত্রপট থেকে। কিন্তু সে তাও পারে না। তার লজ্জা করে। অপমান হয়। তাছাড়া, তার ভয় হয়, পাছে কেউ ছবিব মধ্যে নিরস্ত্র পেয়ে গিয়ে নিজস্ব মুদ্রা-অভিব্যক্তিগুলি তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেলে ওকে নানাবিধ আলটপকা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ, ধরাশায়ী করে ফেলে। কী ব্যাপার? কী সব শুনছি? কত টাকার মাস্টার রোল পাওয়া যাচ্ছে না? নিজেব বাড়িতে মাস্টাররোল রেখেছিলে কেন? এই বয়েসে সাসপেন্ড হওয়া ঠিক নয়। হয়ত কিছু হবে না, তবে এই বয়েসে সার্ভিসে একটা স্পট লেগে গেল তো। বলতে বলতে কারো মুখে সহানুভূতি, কাবও মুখে বা থিকথিক করবে সন্দেহ। দ্যাখ, তোমাব হয়ত কোনই দোষ নেই, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে এ্যালিগেশনটাও তো খুব বিচ্ছিরি ধবনেব। সবকাবি কর্মচাবীদের বিরুদ্ধে চুবির অভিযোগটা খুব মারাত্মক অভিযোগ। কেউ বা এই ঘাযেব জন্য তৈরি নয়, এমন কোনও মলম লাগাতে শুরু কববে। তুমি সমিতিব জন্য এত করেছ, তোমার ব্যাপারটা দেখা আমাদের কর্তব্য। ভেবো না, ব্যস্ততাটা কেটে থাক, সমিতি অবশ্যই তোমার কথা ভাববে। এখন তো সবাই একটা ঘোরের মধ্যে বয়েছে, এমন একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, ফেনাটা মরে যাক, আমরা সবাই মিলে প্রণয়দাকে বলব। ওবা এমন ধারণা থেকেই কথাগুলো বলবে, যেন সদ্য পাওয়া সাস্‌পেনশনের চিঠিখানা পেয়ে বুদ্ধদেব একেবারেই হেদিয়ে পড়েছে। যেন চাকরিটা না থাকলে তার কী দুরবস্থা হবে, সেটাই ভেবে ভেবে তার রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। যেন কর্মচারী সমিতির কর্মকর্তাদেব একটুখানি সমবেদনা, সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য সে বর্তমানে এক তীর্থের কাক। যেন, কর্মচারী সমিতির জন্য অনেক ঘাম ঝরাবার বিনিময়ে প্রতিদান হিসেবে সে কোনও দাবি পেশ করতে এসেছে। এত এত মানুষকে সে কী করে বোঝাবে, এই চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে দুনিয়ার সব চেয়ে সোজা কাজ। যত টাকার মাস্টাবরোল চুরি গেছে, বাবাকে বলে তার দ্বিগুণ টাকা সে রাতারাতি জমা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার সঙ্কটটা অন্যত্র। মনের মধ্যে তিলতিল একটা প্রতিমা গড়েছিল, সেটাকেই

সবাই মিলে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিয়েছে। যেমন করে বেশ কয়েক বছর আগে, তুরকির মেলাতে পল্টু হাজরার দল ভেঙে চুরমার করে দিল মন্মথ কারিগরের বানানো মূর্তিগুলো। কো‌ং ও মূর্তি তো আর সত্যি সত্যি মূর্তি নয়। প্রতিটি মূর্তিই এক একটি জমাট স্বপ্ন।

আসলে, শুধু পাগল শিকারিই নয়, ছবি আঁকে আর স্বপ্ন দেখে বুদ্ধদেবও কম নয়। আবেগপ্রবণ আর কল্পনাপ্রবণ মানুষেরা অবিরাম ছবি আঁকবেই, স্বপ্ন দেখবেই। বিশেষ করে ছবিটার বাইরে অবস্থান করলে, স্বপ্নটার বাইরে অবস্থান করলে, ছবি আঁকা আর স্বপ্ন দেখবার পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়। ছবির মধ্যেকার অথবা স্বপ্নের মধ্যেকার কুশীলবরা তো কাজে মেতে রয়েছে সর্বক্ষণ, তারা ব্যস্ত মানুষ, তাদের স্বপ্ন দেখবার কিংবা ছবি আঁকবার সময়ই নেই। তাদের কেবল কাজ, কাজ, কাজ। কেবল চলা, চলা। সে তুলনায় ছবি অথবা স্বপ্নেব বাইরে থাকে যারা, তাদের তো সেই ব্যস্ততা নেই, তাদের কোনও কাজই নেই ছবি আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাদের হাত নিসপিস কবে, মগজে ক্ষরণ শুরু হয়। তারা ঘাম ঝরাতে পারে না ছবির মধ্যেকার কুশীলবদের মতো, তাই তারা দৃষ্টির তুলিতে রঙ ভরে নেয়, ছবি আঁকে। মগজের মধ্যে মধু ঝবিয়ে নেয়, স্বপ্ন দেখে। তাদের ছবি আঁকা আর স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় নেই, কেন কি, তারা ছবিটাব অথবা স্বপ্নটাব মধ্যে নেই।

এদেশে যখন স্বাধীনতা আসে, তখন বুদ্ধদেবের বযেস ছ-সাত বছরের বেশি নয়। আর, এমন একটা অঞ্চলে ও জন্মেছে, যেখানে স্বাধীনতার লড়াই ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের মতো লালিত হয়েছে। যেখানে, এমন একটা পরিবার পাওয়া দুষ্কর হবে, যার অন্তত একজন সদস্যও কোনও-না-কোনওভাবে স্বাধীনতাব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ফলে, ঐ এলাকার আকাশে, বাতাসে, জলে-স্থলে ভেসে বেড়াত স্বাধীনতার কথা, গান, সুর। তেমনি পরিমণ্ডলে বুদ্ধদেবের বেড়ে ওঠা। আবেগ আর কল্পনাপ্রবণ কিশোরের ক্ষেত্রে যা হয়, সারাক্ষণ ক্ষুদিবাম, সত্যেন, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, দেশপ্রাণ বীরেণ শাসমল, মাতঙ্গিনী হাজবা, অজয মুখার্জি আব অরিজিতের কথা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে ভোঁ হয়ে যাওয়া। সে জন্মাতে পারে নি সেই অগ্নিঝরা দিনে, সেই আক্ষেপে বুক ফেটে যেতে থাকে বুদ্ধদেবের। ইস্, কেন যে আর বিশটা বছর আগে জন্মালাম না, তাহলে আমারও হাতে বোমা-পিস্তল, আমাবও পিস্তলের গুলিতে একটি পোডি-ডগলাসের সমাপ্তি, আমার জন্যও একটি ফাঁসিব দড়িতে মোম মাখানো। ইস্! এই আক্ষেপ নিয়ে হয়ত সারাটা কৈশোর, যৌবন কেটে যেত, কিন্তু যেদিন সেই হিরন্ময পুরুষটি, বুকে রক্ত গোলাপের কুঁড়ি লাগিয়ে বললেন, আমরা আমাদেব কাজ করেছি, এবার দেশের তরুণবৃন্দ, তোমরা তোমাদের কাজ কর। আমাদের আবব্ধ কাজ তোমরা শেষ কর। লড়াই করে একটা জমি আমরা অধিকার করলাম, তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, তোমরা তাতে সোনা ফলাও, তোমরা তাকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করে তোল। তোমরা তার শবীরে অনেক কারুকার্যময় ছবি আঁক। তখন থেকেই লোভাতুর হয়ে পড়েছিল বুদ্ধদেব। তা হলে তো ছবিটার মধ্যে, স্বপ্নটার মধ্যে ঢুকে পড়বার সুযোগ রয়েছে। তিলমাত্র বিলম্ব করে

নি বুদ্ধদেব। পাঠ্যপুস্তক পড়াশোনার পেছনে অধিক সময় অপচয় না করে সাত তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছিল ছবিটার মধ্যে। সেই ছবিটার থেকে তাকে জবরদস্তি বহিষ্কার করা হচ্ছে। গদা নিয়ে দ্বৈরথ চলাকালীন তাকে বারবার উরুদেশে আঘাত করে ধরাশায়ী করা হচ্ছে। অথচ ছবিখানার মধ্যে উপস্থিত থাকতে না পারলে তার জীবনধারণ অর্থহীন হয়ে উঠবে।

কালকের আবীর-উৎসবে এমন অনেকে উপস্থিত হয়েছিল, সারাক্ষণ আপ্লুত ছিল, যারা এ যাবৎ কস্মিন কালেই সমিতির সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত হয় নি, বরং ঠোঁট টিপে বিদ্রূপ করেছে। এমন কি ত্রিভঙ্গও যোগ দিয়েছিল সেই উৎসবে। আবীরে আবীরে ভরে গিয়েছিল তার শরীর। বুদ্ধদেব দূর থেকে দেখছিল ওকে। এক সময় ত্রিভঙ্গর নজরে পড়ে গিয়েছিল সে। ত্রিভঙ্গ ওর শরীর নিশানা করে ছুঁড়ে মেরেছিল আবীর। মরমে মরে যেতে যেতে বুদ্ধদেব সরে এসেছিল নিরাপদ দূরত্বে।

প্রণয়দা খুব ব্যস্ত ছিলেন সারাক্ষণ। কর্মচারী বন্ধুরা, সহযোদ্ধারা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছিল। অভিনন্দন বিনিময়ের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। সকলের সঙ্গে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে হচ্ছিল প্রণয়দাকে। পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে অজস্র পরিকল্পনা। সংগঠনের একান্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেরে নিতে হচ্ছিল কিস্তিতে কিস্তিতে গুপ্ত মন্ত্রণা। আগামী দিনের সম্ভাব্য কর্মসূচীর রূপরেখা নিয়ে কতই না ভাবনা-চিন্তা। সারাক্ষণ হিমসিম খাচ্ছিলেন তিনি। এত কিছুর মধ্যে বুদ্ধদেব তার একান্ত ব্যক্তিগত সঙ্কটের কথা নিয়ে প্রণয়দার মুখোমুখি হতে চায় নি।

আবীর খেলা অনেক রাত অবধি চলেছিল। বুদ্ধদেব পায়ে পায়ে ফিরে গিয়েছিল মল্লিকাদের বাসায়। মল্লিকাকেও খুব উৎফুল্ল লাগছিল। সাবা মুখে খেলা করছিল বিজয়িনীব হাসি। বুদ্ধদেবের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশনের কালে একজনের গলা ভেঙে যাওযার কিংবা গানের কলি ভুলে যাওয়ার অস্বস্তি। ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ছিল সে। মল্লিকার নজর এড়ায নি সেটা। বলেছিল, তুমি অত ভাবছ কেন, আমাদের সরকার আসছে। আমাদের নিজস্ব সরকার। এবার সকলের মুখোশ খুলে পড়বে একে একে। প্রণয়দার এক তুড়িতে এই সাসপেনসন অর্ডার বাতিল হয়ে যাবে। বুদ্ধদেব জবাব দেয় না। তিলমাত্র স্বাভাবিক হতে পারে না সে। সে বোঝাতে পারে না, সাসপেনশন অর্ডার বাতিল হওয়া, না হওয়ার প্রশ্নে সে তিলমাত্র বিচলিত নয়। তার ভেঙে পড়াব কারণ অন্যত্র। সে একটা ভুল স্বপ্নের মায়ায়, একটা ভুল পথে হাঁটতে হাঁটতে, একটা ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এ কোনও সেবার পথই নয়। একেবারেই দাসত্বের পথ।

প্রেক্ষিত বদলে গেলে, বিডিও সাহেবের দর্শনও বদলে যায়। এমনটা বুদ্ধদেব বহুবারই দেখেছে। বুদ্ধদেবের চাকরিতে প্রথম যোগদানের দিনে বলেছিলেন, এ হল একটা সারভিস। সার্ভিস টু দি নেশন। স্যাবা। কী বুঝলা? পরবর্তীকালে, বুদ্ধদেব যখন এলাকার চুরি-চামারি, অবিচার, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, তখন বিডিও সাহেবই বলেছেন, আমরা কেউ দেশোদ্ধার কত্তি আসি নাই, বুঝলা, আমরা চাকরি কত্তি এসেছি। সার্ভিস ইজ শ্লেভারি। বন্ডেজ। আমরা সব চাকর, বুঝলা, গভর্নমেন্টের মোস্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।

দুটো তত্ত্বের কোনটাই মিথ্যে নয়। দাসত্বই। দাসত্ব করতেই আসা। মাইনে নাও এবং আমাদের ইচ্ছে পূরণ কর। দাসদের কখনই দেশ গড়বার অধিকার দেওয়া হয় না। তবুও যে, বিডিও সাহেব প্রথম দিন বলেছিলেন, ইট ইজ এ সার্ভিস, স্যাবা, সেটা হল, নবনিযুক্ত চাকরকে 'বাড়িব ছেলের মতো থাকতে হবে, বলে উৎসাহিত করা। এমন একখানা ভুল পথে অনেকখানি হেঁটে ফেলেছে বুদ্ধদেব। এখান থেকে পিছু হটতে চাইলে, যদি এই মুহূর্তেও সেটা শুরু করে তো, আগের অবস্থানে ফিরে যেতেও তার জীবনের মাখন-সময়টুকু খরচ হয়ে যাবে। ফিরে গিয়ে হয়ত বা দেখবে, সেই আগের অবস্থানটিও বদলে অচেনা হয়ে গিয়েছে।

হরবল্লভ-প্রভঞ্জনরা সিংহগড়ে ঢুকে পড়েছে। গতকাল থেকে ওদের একবারের জন্যও দেখতে পায় নি বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব, করালী, সবাইয়ের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যেও বিডিও সাহেব নিজেকে সপ্রতিভ রাখবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ব্লক অফিসের যাবা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, তাদের জনে জনে ডেকে বলছেন, আপনারা ইতিহাস গর্সেন। একটা নতুন চ্যাপ্টার ওপেন করসেন। সবাই ওঁকে আবীর মাখবার অনুরোধ জানিয়েছিল। জবাবে খুব কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার হাসি ফুটিয়ে বলেছিলেন, মাখতে তো সাধ হয়, কিন্তু আমাদ্যার গাযে যে আর একখান ছাপ। বুরোক্র্যাট। কি? আমলা। সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলে আটকাইয়া যাইত্যাসে গা।

সূর্যের লাল চাকি পশ্চিম দিগন্তে একখানা থালার রূপ নিয়ে ডুবছে। দ্বারকেশ্ববের দু'পাড়ের কারুকার্যময় বালুচরী শাড়িদুটির শরীরে এখন ধূপছায়া রঙ। পাখি-পাখালের দল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। বিষন্ন হয়ে আসছে ধরিত্রীর মুখ। শুধু দ্বারকেশ্বরের সরু স্রোতের জলের রঙ এখনও রক্তাভ লাগছে। যেন আবির গোলা জল। আশ্চর্য, দিনবদলের খবর পৌঁছে গেছে স্মৃতিহীন নদীটার কাছেও, উল্লাসে সেও তার সারা শরীর রাঙিয়ে নিয়েছে আবিরে! কেবল বুদ্ধদেবই এই আবির-উৎসবের কেউ নয়।

সকাল বেলায় পাগল শিকারি বলেছিল, আজ সন্ধ্যায় বিষ্টুপুরে, রসিকগঞ্জের মাঠে, চোদ্দদলের বিজয়উৎসব। পাগল শিকারির উক্তির মধ্যেই ছিল সারা দুপুবব্যাপী সারবন্দী পুতুল-মিছিলের প্রাসঙ্গিকতা। বিজয় উৎসবে যোগ দিতেই আজ সারা দুপুর মল্লভূমের প্রতিটি দিগন্ত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল অগুনতি কালো ফুটকির গুচ্ছ। ফুটকিগুলো, ঠিক যেমন করে লক্ষ্মীকাজল ধান উত্তপ্ত কড়াইতে পড়ে খই হয়ে ফুটে যায়, সেই একই প্রক্রিয়ায় পুতুল হচ্ছিল। পুতুল থেকে মানুষ। বুদ্ধদেব দেখল, রসিকগঞ্জের মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। দেখল, সারা মাঠ, রাস্তা, এস-ডি-ও অফিসের আর জেলখানার অঙ্গন জুড়ে থইথই মানুষ। মাঠের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা বটের ডালে ডালে ফলের মতো লেপটে রয়েছে অগণিত মানুষ। দেখল, পুরো এলাকা জুড়ে হাজারে হাজারে লাল-ঝাণ্ডা। বিশাল মঞ্চ জুড়ে বসে রয়েছেন নেতারা। আব আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দশদিক। আলো, আলো!

অনেকখানি তফাতে দাঁড়িতে বুদ্ধদেব নিষ্পলক দেখতে থাকে মানুষের উল্লাস। শুনতে

থাকে ভর-ভরন্ত জোয়ারের মুহূর্তে সমুদ্রের গর্জনের মতো আছড়ে পড়ছে স্লোগান। বারবার। অবিরাম। আদিবাসী মানুষের দল সঙ্গে এনেছে শয়ে শয়ে মাদল, ধামসা। সারা মাঠ জুড়ে অসংখ্য মাদল, ধামসা তালে তালে বেজে চলেছে। অবিরাম হৃৎপিন্ডে আঘাত হানে সেই তাল। কলিজার রক্ত উথাল পাথাল। আর এমনই সমবেত অর্কেস্ট্রার মধ্যে শুরু হল নেতাদের ভাষণ। একে একে জেলার নেতারা বক্তৃতা দিলেন। কয়েক ডজন মাইকের চোঙ সেই আওয়াজ পৌঁছে দিল চতুর্দিকে। সভার মধ্যমণি হয়ে বসে রয়েছেন জ্যোতি বসু, অজয় মুখার্জি। স্পট লাইটের আলো পড়েছে ওঁদের মুখে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। অতদূর থেকেও বুদ্ধদেব দেখতে পায়, ওঁরা হাসছেন। ওঁদের প্রশস্ত ললাটে হীরের কুচির মতো বিন্দুবিন্দু ঘাম। এত মানুষের পায়ের চাপে ধুলো উড়ছে হাওয়ায়। ধুলোয়, আবীরে ভরে যাচ্ছে বাতাস। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকের প্রতিটি চোঙের মুখের থেকে আছড়ে পড়ে কম্বুকণ্ঠের ভাষণ ঃ কমরেড্স, অনেক ঘাম রক্ত ঝরিয়ে দিগন্তের বুক ফালাফালা করে, আমরা অবশেষে ঘোচাতে পেরেছি যা কিছু অন্ধকার, ফোটাতে পেরেছি নতুন প্রভাতের আলো। সামনে আসছে নতুন প্রত্যাশায় ভরা দিন। সেই সুফলা দিনটিকে আমাদের দখল করতে হবে। আমরা সবাই মিলে আগামী দিনগুলিকে সাজাব। মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের এত এত রক্তদান যেন বৃথায় না যায়।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল হাজার হাজার মানুষ। শিশির পতনের শব্দ তোলা নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে। এক সময় শেষ হয় বক্তৃতা। এবং পরমুহূর্তে, হাজার হাজার করতালিতে আকাশ বাতাস অস্থির হয়ে ওঠে। এক নাগাড়ে বেজে যায় করতালি, বেজে যায়...... থামার কোনও লক্ষণই নেই। বুদ্ধদেবের মনে হয়, শুধু মানুষ নয়, করতালি দিচ্ছে চারপাশের গাছগাছাল, বাড়িঘর, ইট, কাঠ, পাথর...., সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে শুরু হয়েছে অস্থির করতালির রুদ্র মাতন। এক সময় নিজের অজান্তে বুদ্ধদেবের হাতদুটি উঠে আসে বুকের কাছাকাছি। এবং পরমুহূর্তে অস্থির বেজে ওঠে। বুদ্ধদেবের নিজের কানে সে আওয়াজ পৌঁছুনো মাত্রই ভীষণ চমকে ওঠে সে। সম্বিত ফিরে আসে দ্রুত। দেখতে পায়, দ্বারকেশ্বরের ওপাড়ে ঝুলতে থাকা সূর্যটা খসে পড়েছে কখন। বালুচরী শাড়িদুটির শরীর থেকে যাবতীয় কারুকার্য উধাও। ওপারে ঝোপঝাড়ের বুক ফুঁড়ে ওঠা ছন্নছাড়া খেজুরের শরীরের খাঁজে খাঁজে আঁধার জমছে দ্রুত। দেখে, বালুচরের যাবতীয় পাখি উধাও হয়ে গেছে। গাছ গাছালির শরীর থেকে মুছে গিয়েছে যাবতীয় আলো। আঁধার নামছে রাঢ়ভূমি জুড়ে।

এবং যে গরবিনী ফিঙেটি বালুচরের মধ্যিখানে বনকলমীর চূড়োয় বসে এতক্ষণ লেজ দোলাচ্ছিল খুশিতে, বুদ্ধদেবের আচমকা করতালির শব্দে সেই শেষ পাখিটিও উড়ে গেল এইমাত্র।

ঠিক সেই মুহূর্তে, বুদ্ধদেব কল্পনা করে, সমগ্র রাঢ়ভূমি আলোক মালায় সাজতে বসেছে। যা কিছু মাতৃজঠরের তুল্য জটিল অন্ধকার, বুদ্ধদেবের চারপাশে, তা শুধু তার নিজস্ব। বুঝি কেবল তার জন্যই বরাদ্দ এমন চাপ চাপ অন্ধকার। বুঝি কেবল তার জন্যই দ্রুত কালো ওড়নায় মুখ ঢেকে নিচ্ছে ধরিত্রী।